সুরমা ঘটক

প্রকাশক :

শীলা ভট্টাচার্য

আশা প্রকাশনী

৭৪, মহাত্মা গান্ধী রোড,

কলকাতা-৭০০ ০০৯

প্রথম প্রকাশ : ১৯৫৬

প্রচ্ছদ :

অজয় গুপ্ত

প্রচ্ছদের আলোকচিত্র শ্রীসত্য সেন

মুদ্রক :

দিলীপ দে

দে প্রিণ্টার্স

১৫৭বি, মসজিদবাড়ি স্ট্রিট

কলকাতা-৭০০ ০০৬

উৎসর্গ

দেশের যুবশক্তিকে

ভূমিকা

'৭৫ সালে আন্তর্জাতিক নারীবর্ষে আমার শিলং জেলের ডায়েরী থেকে চোর, খুনী, পাগলী ও গণিকা মেয়েদের কথা লিপিবদ্ধ করছিলাম। তখন একদিন সিরাজ আমাকে বারবার বলেছিল, 'বৌদি ঋত্বিকদা সম্বন্ধে লিখুন।' আমি বলেছিলাম লিখবো পরে।

ছোটবেলা থেকেই আমার সমস্ত কাগজপত্র গুছিয়ে রাখা অভ্যেস। আমার বাবারও রাখতাম। গত একুশ বছরের প্রায় প্রতিটি চিঠি ও কাগজ-পত্র আমার কাছে আছে। ভেবেছিলাম পরে একদিন এই সব কিছুর ভিত্তিতে গুছিয়ে লিখব।······তখন কি জানতাম এতো তাড়াতাড়ি লিখবার সময় আসবে? আর যাঁর মনে প্রথম থেকেই খুব ইচ্ছে ছিল আমি লিখি, তাঁর সম্বন্ধে লিখেই আমার জীবনে প্রথম লেখা প্রকাশ হবে, কোনদিনও ভাবিনি।

'৭৬ সালের মার্চমাসে 'চিত্রবীক্ষণে'র প্রতিনিধিরা শাঁইথিয়া গিয়েছিলেন। তখন 'চিত্রবীক্ষণ' ঋত্বিকসংখ্যার জন্য আমার যা যা দেওয়া সম্ভব সবই দিয়েছিলাম। 'নাগরিকে'র গল্পাংশ, স্টীল, পোস্টার ইত্যাদি। 'কত অজানারে'র স্টীল, 'দলিল' নাটকের ছবি ও আরো বহু ছবি। তাছাড়া কয়েকটি মূল্যবান চিঠিপত্র—যেমন ফিল্মিস্থানের শশধর মুখার্জীকে লেখা চিঠি, পুণার প্রিন্সিপালকে লেখা চিঠি, পুণায় বসে লেখা ছাত্রদের জন্য পুরো ডিরেকশন-এর কোর্স, পাঁচটি অপ্রকাশিত প্রবন্ধ, 'ঠাকুরমার ঝুলি' থেকে লেখা 'Princess Kalabati'-র সিনোপসিস, সেই 'বিষ্ণুপ্রিয়া'র সিনোপসিস ইত্যাদি। এরপর ওদের বিশেষ অনুরোধে খুব অল্প সময়ের মধ্যে আমার স্মৃতিচারণটি লিখেছিলাম। একটি প্রবন্ধের মধ্যে এর বেশী লেখা সম্ভব নয়। ভেবেছিলাম পরে একদিন বিস্তৃতভাবে লিখবো।

অকস্মাৎ গত বছর গ্রীষ্মের ছুটির শেষে 'আশা প্রকাশনী'র তরফ থেকে বিস্তৃতভাবে লেখার অনুরোধ বিশেষভাবে এলো। এতো তাড়াতাড়ি লেখার

কথা আমি তখনো ভাবিনি। কিন্তু বিশেষ অনুরোধে শেষ পর্যন্ত তাদের কথা দিলাম। সুবীরবাবুর চিঠি পেলাম: 'আপনি কথা দেওয়ার জন্য আমরা সম্মানিত বোধ করছি।'

এরপর প্রায় একটি বছর অতিবাহিত হতে চলেছে। এই একটি বছর আমি শয়নে স্বপনে, দিনে রাত্রে, সময় পেলে, সময় না পেলে নিরবচ্ছিন্নভাবে একটি চিন্তাই করে যাচ্ছি। আমার মন একটি মুহূর্ত এই চিন্তা থেকে বিরত থাকেনি।

লেখবার আগে বারবারই মনে হয়েছে আমার তো কিছু লিখবার প্রশ্ন আসে না। জ্ঞানীগুণীরাই লিখবেন ও বলবেন। আমি শুধু যে সমস্ত কাগজপত্র আমার কাছে আছে ও যে সমস্ত তথ্য ও ঘটনাবলী আমি জানি তারই ভিত্তিতে একটি চিন্তাধারার পরিচয় ও সামগ্রিক জীবনের পরিচয় দিতে পারি। তাই সমস্ত চিঠিপত্র, প্রবন্ধ, সাক্ষাৎকার প্রভৃতি থেকে ধারাবাহিক-ভাবে লিপিবদ্ধ করে আমি একটি গ্রন্থনা লেখার চেষ্টা করেছি। অনেক ভেবেই লেখার এই মাধ্যমটি নিয়েছি। কারণ নিজের বক্তব্য ও দৃষ্টিভঙ্গী যেভাবে নিজের লেখা প্রবন্ধ, চিঠিপত্র, সাক্ষাৎকার ইত্যাদিতে প্রকাশ পেয়েছে, তা আমি নিজের ভাষায় লিখে সব ব্যক্ত করতে পারতাম না। যে মানুষটির ব্রেন ও দার্শনিক গভীরতা দেখে আমি বিস্ময়ে অভিভূত হয়েছিলাম—তিনি জীবনের শেষদিন পর্যন্ত কিভাবে সৃষ্টি করে গেছেন—আমার লেখার বিষয়বস্তু এইটাই। এটা শুধু জীবনী বা শুধুমাত্র একটি স্মৃতিচারণ নয়।

আমার সাঁইথিয়ার ছোট্ট বাসাটির একা ঘরে বসে যখনই সময় পেয়েছি লিখেছি। ছেলেমেয়েরা কেউ কাছে নেই। পড়াশোনার জন্য কলকাতায় ও শান্তিনিকেতনে আছে। এই একটি বছরের প্রতিটি মুহূর্ত আমাকে একটি চিন্তাই আচ্ছন্ন করে আছে। আর লিখতে লিখতে মনে হয়েছে, যাঁর সম্বন্ধে লিখছি তাঁর শুভেচ্ছা ও মঙ্গলাকাঙ্ক্ষা আমাকে সব সময় ঘিরে আছে।

'আশা প্রকাশনী'র অনুরোধ রক্ষা করতে কতোটুকু সফল হয়েছি জানি না, তবে চেষ্টার ত্রুটি করিনি। লিখবার সময় 'চিত্রবীক্ষণ' ঋত্বিক সংখ্যা থেকে অনেক উদ্ধৃতি নিতে সাহায্য হয়েছে। আমার কাছে অনেক প্রবন্ধ ইত্যাদি থাকলেও সব নেই।

'চিত্রবীক্ষণ' ঋত্বিক সংখ্যার লেখা আমার স্মৃতিচারণটি আমার লেখার শেষে দিলাম। এতে একটি সামগ্রিক কাজকর্মের পরিচয় আছে। তাছাড়া এটি

আমার প্রথম অনুভূতি দিয়ে লেখা। পরিশিষ্টে কিছু অপ্রকাশিত রচনা দিলাম।

'স্পন্দন'-এর সম্পাদক সত্যেন বন্দোপাধ্যায়রা এসে মাঝে মাঝে শুনে গেছেন। প্রত্যেকেরই অনুরোধ : 'বৌদি শেষ করুন'। শেষ পর্যন্ত একদিন কলম থামিয়েছি।

লেখা শেষ হবার পর পাণ্ডুলিপিটির কবি শঙ্খ ঘোষ অনেকটাই পড়ে দিয়েছেন এবং বইটির নামকরণ করে দিয়েছেন—সেইজন্য আমি কৃতজ্ঞ।

আমাকে চাকরীর জন্য কলকাতা থেকে অনেক দূরে সাঁইথিয়ায় থাকতে হয়। তাই পাণ্ডুলিপিটি দেবার পর মুদ্রণ চলাকালীন বইটির কিছুই দেখতে পারিনি। ফলে, মুদ্রণে ত্রুটি-বিচ্যুতি বা সাফল্যের পরিপূর্ণ দায়িত্ব প্রকাশক ও সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের। এ ব্যাপারে তাঁরা আমার ধন্যবাদার্হ।

সুরমা ঘটক

পি-২০, গলফ্ ক্লাব রোড
কলকাতা-৩৩

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

এই বই অত্যন্ত দ্রুততার সঙ্গে ছাপতে হয়েছে। ব্যাপক লোড শেডিং-এর মধ্যেও বইটি নির্দিষ্ট সময়ে প্রকাশিত হতে পারলো তার জন্য দে প্রিণ্টার্সের দিলীপ দে এবং তাঁর সহকর্মীদের কাছে আমরা কৃতজ্ঞ। নিজের সমস্ত কাজ ফেলে রেখে দিনরাত প্রেসে বসে থেকে প্রুফ দেখে দিয়েছেন (৫ম ফর্মা থেকে) শ্রীঅরুণ সেন।

শ্রীশঙ্খ ঘোষ, অজয় গুপ্ত, মহেন্দ্র কুমার, উৎপল সেনগুপ্ত (চিত্রভাষ পত্রিকা) দীপঙ্কর ভট্টাচার্য, রবীন্দ্রনাথ পণ্ডিত এবং সত্যেন বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরামর্শ ও সহযোগিতা ব্যতীত এই বই ছেপে বের হতে পারতো না। তাঁদের প্রত্যেকের কাছেই আমরা কৃতজ্ঞ।

বিনীত

শীলা ভট্টাচার্য

চিত্র পরিচয়

১

ঋত্বিক
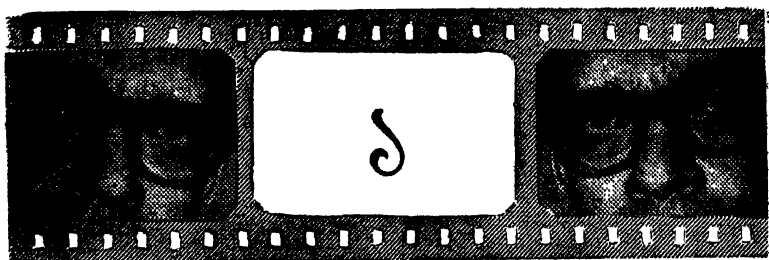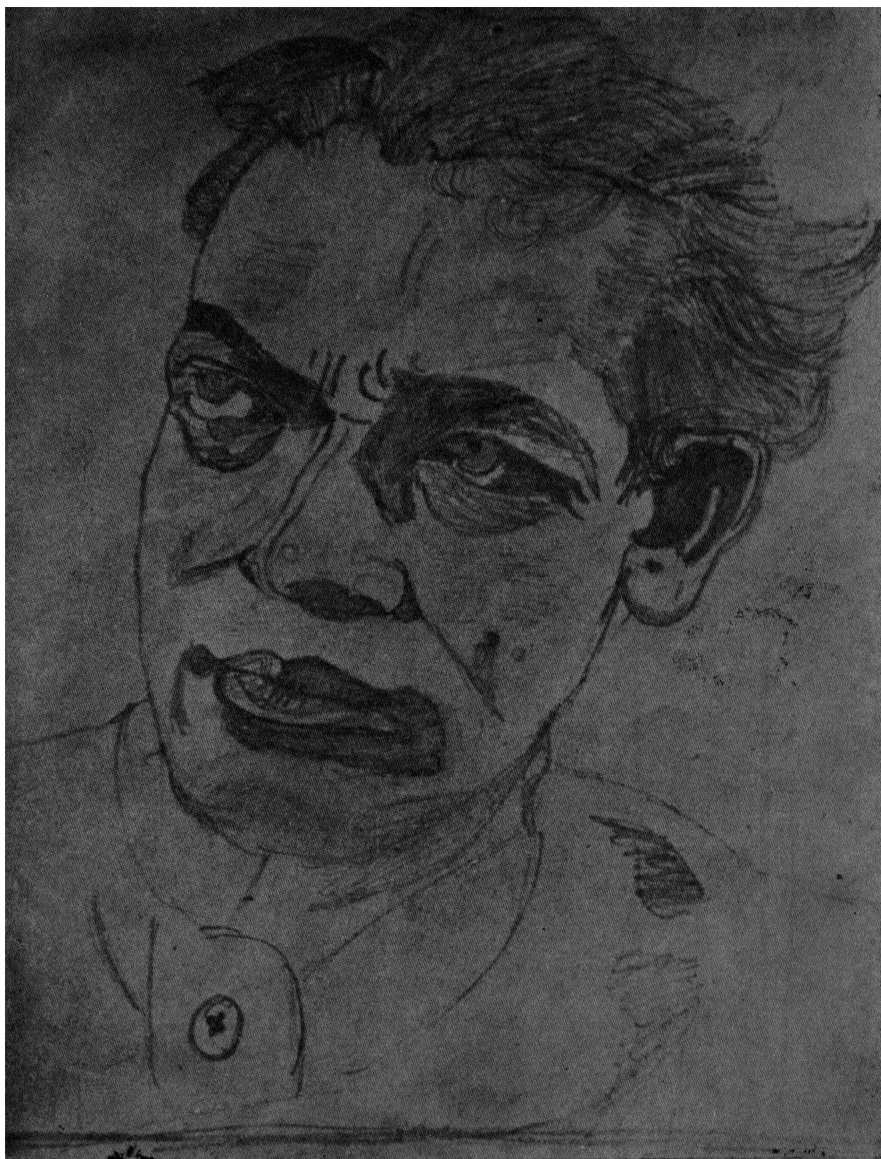
স্কেচ ঃ ঋতবান ঘটক

চিত্রবীক্ষণ এর সৌজন্যে

প্রাচীন

শ্রীঋত্বিককুমার ঘটক

1) খোকার চরিত্র। জামচুরী। কাশীনাথ।
ছোটবোন। খুকী। তার চরিত্র।
বাড়ী এল। খবরের কাগজে aush…এবং…
বাবা-মা। বাড়ীটা। পদ্মা। গ্রাম্য শহর।
বড়দা এল। খোকাকে নিয়ে যাবে। কারণ Crisis.
বাবা-মা অনিচ্ছাসত্ত্বেও রাজী হলেন।
খোকা এবং খুকী। খোকা এবং বাবা-মা।
খোকা যাবে।

2) কলকাতায় গিয়ে খোকার কী অবস্থা।
বৌদি। দাদা Drunkard. কল্লোল। ৩০ 'এর যুগটা।
বাচ্চাগুলো। খোকা একটা বদমাইশ।
Poland. Danzig. Polish.…
বাড়ীর পাশের মোটর কোম্পানীর সায়েবরা গ্রেপ্তার।

3) খোকা বদমাইশীর চূড়ান্তে উঠেছে। ইস্কুল যায় না।
Old Ballygaunje-এর মাঠে খচ্চরদের ভ্রমণ আর
গাছের কোটর। বিড়ী খেতে শেখা। বৌদি। অন্য দুজন
দাদা। তাদের চরিত্র।
ভারতবর্ষ যুদ্ধে যোগ দিয়েছে।
বোন আর বাবা-মাকে বাড়াও।
Emotional Sceneএ শেষ কর।

নিজের জীবন নিয়ে একটি বড়ো উপন্যাস লিখবার এই ছক। শুধু সূত্র-গুলোই লেখা। উপন্যাসটি শেষ হলে আমরা বাল্য ও কৈশোর বয়সের একটি পূর্ণাঙ্গ ছবি পেতাম। একদিন ভবানীপুরের বাসায় সন্ধ্যার সময় এটা লেখা। সঙ্গে সঙ্গে কাগজটি তুলে রেখেছিলাম। আজ আমার লেখা শুরু হলো এই কাগজটি দিয়েই।

এবারে উল্লেখ করছি একটি প্রবন্ধের। প্রবন্ধটির নাম 'কিছু খণ্ড চিন্তা কিংবা কিছু উপলব্ধি'।*

আজ এতো বছর পরে আশ্চর্যভাবে একটি ছেঁড়া, বিবর্ণ কাগজে প্রবন্ধটির আর একটু অংশ পেয়েছি। ঐ সাধুভাষায় লেখা অসমাপ্ত প্রবন্ধ ও পরে পাওয়া শেষ অংশটুকু আজ এক সঙ্গে মিলিয়ে দেখছি। লেখাটির মধ্যে মানুষটির জীবনের মূল সুর, চিন্তা, বাল্য ও কৈশোরের জীবন বড়ো সহজ ও সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে।

কিছু খণ্ড চিন্তা কিংবা কিছু উপলব্ধি

—আচ্ছা নিজের জমির উপর না দাঁড়াইয়া কিছু করা যায় কি? কিছু সত্যিকারের গভীরকে ছোঁয়া সম্ভব?

আমি জানি না, হয়তো শেষ বয়সে বহু পোড় খাইয়া, বহু মারের

---

*প্রবন্ধটি 'ছবি করা' নামে 'চিত্রবীক্ষণে'র ঋত্বিক সংখ্যায় বেরিয়েছিল। এবং প্রবন্ধটির প্রকাশের উল্লেখ আছে অমৃত, ক্রীড়া বিনোদন সংখ্যা।

ঐ সালে উনি মেন্টাল হসপিটালে ছিলেন। জানিনা প্রবন্ধটি 'অমৃত' কোথা থেকে পেয়েছিলেন। প্রবন্ধটির ভাষা সাধু ভাষা ছিল। প্রবন্ধটি আমার কাছে খুবই উল্লেখযোগ্য মনে হয়েছিল। তাই যত্ন করে রেখে দিয়েছিলাম। আর প্রবন্ধটি শেষ করা হয়নি। পরে শেষ করার ইচ্ছা ছিল।

মধ্য দিয়া উত্তরণ হয়তো সম্ভব। কিন্তু আমার তো সে স্তর আসে নাই ; সে স্তরে পৌছানো কোনদিন হইয়া উঠিবে কিনা, সে বিষয়েই আমার ঘোরতর সন্দেহ আছে।·····কিন্তু সৃষ্টিকর্মের গোড়ার ধাপে, কাজ করিতে আরম্ভ করার সঙ্গে সঙ্গে পিছনের খোরাক যাহার দেউলিয়া হইয়া গিয়াছে, সে কি করিবে ? আমি বলিতেছি দেশভাগের কথা। আমি পূর্ববাংলার ছেলে। খুব সামান্য কিছু লোকের আমার কাজ ভাল লাগে। তবু তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ বলেন, ঋত্বিক ঘটকের বর্তমানের বা অল্পকাল অতীতের সঙ্গে বুঝিবা সামান্যভাবে ভবিষ্যতের সঙ্গে, একটা যোগগোছের [আছে] বলিয়া মধ্যে মধ্যে মনে হয়। কিন্তু সত্যকারের অতীত নাই, ঐতিহ্য নাই।

কথাটা বড় লাগে। অতীতবিহীন নিরালম্ব বায়ুভূত কাজ কাজই নহে। কিন্তু আমার অতীত আমাকে কে আনিয়া দিবে ?

আছে, যোগ আছে। ছোঁয়া আছে, গল্প আছে, টুকরা টুকরা ছবি আছে। তাহার অনেকটাই হয়তো ভুল, আমার মনগড়া। কিন্তু মন গড়িয়াইতো আমার শিল্প। ফটোগ্রাফীর সত্য তো আমার ঠিকাদারীর মধ্যে পড়েনা।

···আমার দিন কাটিয়াছে পদ্মার ধারে, একটি দুঁদে ছেলের দিন। গহনার নৌকার মানুষদের দেখিয়াছি, যেন অন্য গ্রহের বাসিন্দা। মহাজনী হাজার-দু'হাজার মনী ভাড়া করিয়া পাটনা-বাঁকীপুর-মুঙ্গের অঞ্চলের মাল্লারা পার হইয়া যাইত, একজাতীয় ভাঙ্গা দেহাতী আর পদ্মাপারী বাংলার টান মাখানো কথা বলিয়া। জেলেদের দেখিয়াছি, ইলসা গুঁড়ির প্রথম বর্ষায় বেজায় খুসী হইয়া বেসুরা টান মারিত, জলমাখানো হাওয়াতে দমকায় দমকায় ভাসিয়া আসিত কেমন অস্পষ্ট মন কেমন করা পাগল সুর। ষ্টীমারে শুইয়া রাত্রে দোল খাইয়াছি মাতাল নদীর দাপটে, আর শুনিয়াছি এঞ্জিনের ধস্ ধস্, সারেঙ্গের ঘন্টি, খালাসীর বাঁও না মেলা আর্তনাদ।

পদ্মায় শরতে নৌকা লইয়া পালাইতে গিয়া একবার ঢুকিয়া আর বাহির হইতে পারিনা—তিনমাথা সমান উঁচু কাশবন হইয়াছে কাতলামারীর চরটার কাছে, ভীষণ সাপ থাকে ওখানে। নৌকা দুলাইয়া দুলাইয়া চেষ্টা করিতে যাইয়া সেই ডাকাতিয়া কাশের

ঝোপের সাদা রেণু উড়িয়া উড়িয়া দেহমন আচ্ছন্ন করিয়া নিঃশ্বাস প্রায় আটকাইয়া দিয়াছিল। কাশগুলি পাকা ছিল। একবার সিন্ধু গৌরবের রাজা জাহিরের পার্টের জন্য হায়ার (hired) হইয়া গিয়া ট্রেন ফেল করিয়া সন্ধ্যেবেলা পৌঁছিয়াছি অপরিচিত রেলস্টেশনের লাইনের লাল আলোয় রহস্যময় পাড়াগাঁয়ে। সামনের হাওরবিল ডাকসাইটে ভূতের জায়গা, কোজাগরীর আগের রাত্রে সেই আবছা বিলে দুই বন্ধু মিলিয়া সারারাত লগি ঠেলিয়াছি, দিগন্তলীন বিলে মাঝে মাঝে জাগিয়া আছে দ্বীপের মত গ্রাম! নীহার পড়িতেছে, কাঁপিতেছি, শেষে বোঝা গেল, আমাদের ধন্দ লাগিয়াছে। দুঘণ্টার পথ সারারাত্রে পার হইতে পারিতেছি না, পাক খাইতেছি। সেই শেষ রাত্রে দাঁতে দাঁত লাগা হিমে সে এক অদ্ভুত হতাশার অনুভূতি।...

...মা-বাবা-দাদা-দিদি, অনেক মানুষ। হৈ হৈ করিয়া বহুজনা মিলিয়া ভাতখাওয়া, দুর্গাপূজা, মুসলমান চাষাদের সেই বাঁপায়ে পিতলের মল পরিয়া শারী গান, ডানপিটা সব বন্ধু। মারপিট। আম-লিচু-ডাবচুরি। পড়িয়া পা ভাঙিয়া যাওয়া, ধরা পড়িয়া মার খাওয়া। বাড়ীর দেওয়ালে নোনা ধরিয়া কত দাগ। কত শব্দ, ছবি, কত মন।

একটা জীবনপ্রণালী, মানুষের এক বিচিত্র প্রবাহ। আর নাই। যদি থাকিত।...দাঁড়াইতে পারিতাম তাহার উপরে, বলিতে পারিতাম কিছু। এমনভাবে সবকিছুকে বিকৃতমন লইয়া দেখিতাম না। ভবিষ্যৎকে এত ভয় করিতাম না, দেশের এবং মানুষের ভবিষ্যৎকে।

এগুলা প্রাণময়, এগুলা উদ্দাম। কিন্তু এইতো আমার আছে। আমি যদি লিখিতে পারিতাম, কবি হইতাম, চিত্রকর হইতাম, হয়তো এগুলো হইতে জারাইয়া লইয়া বাড়িতে পারিতাম। কিন্তু আমি যে ছবি তুলি। আমার মত আর কেউ হারায় নাই। যাহা দেখিয়াছি, তাহা দেখাইতে পারিতেছি না।

কে চায় দুঃখ? জীবন দুঃখ নহে। জীবন বীরত্ব। এপারে কি নাই? আছে, দেখিয়াছি, পূজা করিয়াছি। কিন্তু আমি ছোট-

বেলার সেই রূপকথা—চোখে দেখিতে পাইতেছি না। সেটি হারাইয়াছি। সেটি না থাকিলে তো বাস্তব হইতে নূতন রূপকথা তৈরী করিতে পারা আমার সাধ্য নাই। এখন যুক্তি হইবে, ট্রাজেডি হইবে, কমেডি হইবে, বয়ঃপ্রাপ্তদের খণ্ডাংশ শিল্প হইবে। যদি অবশ্য অত অবধিও পৌছাইতে পারি।

কিন্তু রূপকথা, সরল রূপকথা, যাহা দেখিলে যুক্তি চুপ, বড় বড় থিয়োরী মাথা চুলকাইতে আরম্ভ করে, ছোট ছোট ডামপিটের দল রুদ্ধশ্বাস গল্পের জন্য চাগাড় দিয়া উঠিয়া বসে,—তাহা কোথায়? আমার চৌহদ্দির মধ্যে নাই।

আমার সবচেয়ে বড় সমস্যা এইটাই। কাজ আরম্ভ করার পূর্বেই আমি সীমিত হইয়া গেছি।

কারণ, সেই নিসর্গ এখানে পাইব না। ও মুখের আদল, ও কথা বলার ঢংটি, এখানে নাই। দুনিয়ার লোকের কাছে ঐ বলিয়া চালাইয়া দেওয়া যায়, এমন কিছু হয়তো সাজাইয়া গুছাইয়া দাঁড় করানো যায়। কিন্তু বায়োস্কোপ বড় সত্যবাদী। উহাতে চিড়া ভিজিবে না। যাহার জন্য করা, সেই রূপকথাটিই হারাইব।

আমার এই কথাগুলি হইতে কেহ যদি মনে করেন, বীরভূমের হু-হু উধাও খোয়াই, মেদিনীপুরের ছোট ছোট নদী আর গঞ্জ, কি চব্বিশ পরগনার ক্ষয়িষ্ণু ভাঙাভাঙা ইমারতওয়ালা গ্রাম, ইহাদের বক্তব্য পৌছায় নাই আমার কাছে, তাহা হইলে অবিচার হয়। আমার শুধু নিবেদন এই, ইহারা আমার আদি যুগের অংশ নহে। আমার অতীতে মগ্ন হওয়া হইয়া উঠিতেছে না কতকগুলি নিষ্ঠুর কারণে। এপারে যাহার শৈশব কাটিয়াছে, সে আমার দেশে যাইলে কোথায় পাইবে সেই মায়ার যাদু, যাহাতে কলি ফুটিবে?

তাই বলি, আমার উত্তর পুরুষের চোখ দিয়া যখন দেখিতে পাইব, তখন নতুন সংযোগ ঘটিবে, নতুন উত্তরণ।

আমার ছবি করার পথে সবচেয়ে বড়ো বাধা এইটাই। কারণ, আমার মনের মধ্যে বায়েস্কোপের একটি মান ঠিক হইয়া আছে, যাহাতে এই মসলাটাই লাগে বেশী।

আমি অনুভব করি, এই প্রথম ধাপটি পাইলে ক্রমে ক্রমে ছড়াইয়া

গিয়া দেশবিদেশ মহাদেশকে আলিঙ্গন করার সূত্রটি পাইতাম। এমন অস্বস্থভাবে প্রাথমিক চেতনাটি ভূতের বোঝা হইত না আমার ঘাড়ে।

আমি সত্যই নিরালম্ব।

২.

আর এক মুস্কিল আমার বলার ভঙ্গীটি লইয়া। আমার বিদ্যাসাগরের ভঙ্গী বড় ভাল লাগে। এব্রাহাম লিঙ্কনের লেখা আমার সামনে আদর্শ খাড়া করিয়া ধরে। বাইবেলের ইংরাজী আমাকে ধ্যানস্থ করে। উপনিষদের মন্ত্রদ্রষ্টার তীব্রতা আচ্ছন্ন করিয়া উত্তীর্ণ করে এক আনন্দময় জগতে। যাহার জন্য হেমিংওয়ের Old Man and the Sea বহু আপত্তি সত্ত্বেও নাড়া দেয় গভীরে।

ছবিতে করেন Flaherty। করেন Basil Wright তাঁহার Song of Ceylon-এ। Eisenstein আশ্চর্যভাবে জায়গায় জায়গায় Genral Line-এ তাহাই করেন।

বেশী ছবি আমি দেখি নাই। এ দেশে বসিয়া তেমন বায়োস্কোপ দেখার সৌভাগ্য হয় নাই। বেশী যে পড়িয়াছি, তাহাও নহে। তবু এই একটা আদর্শ কেমন করিয়া জানি না আমার সম্মুখে ধীরে ধীরে সোজা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ঈশোপনিষদ, কঠোপনিষদ যেমন।

একটি ভাষা, যাহা কম বলিবে। যাহা স্বয়ং দ্যোতনাময়। যাহার allusion এর ভার নাই, পরিপূর্ণ ধার আছে। যাহা Reference-এ ভারাক্রান্ত করে না, অথচ মনে পড়াইয়া দেয়,—কারণ ছোঁয়ায় ছোঁয়ায় যে অনুভূতি আর যে চিত্রকল্প, তাহারা Archetypal। যে ভাষা সমস্ত mood কে একটি Patriarchal ভঙ্গীতে ধরাইয়া দিবে। আপাত শুষ্ক, ভিতরে মালদহের কালাচাঁদ ভোগ আমটি একেবারে টইটুম্বুর।

তেমন ভাষাটি কিন্তু আছে। খুঁজিয়া পাইতেছি না, কি সব আজে-বাজে করিতেছি। ....বায়োস্কোপে ঐ ভাষায় কথা বলা প্রয়োজন। য়ুরোপ পারিবে না, এ যুগে। আমরা পারিব, যদি খুঁজি।

......এটুকু বুঝি, এ ভাষা জন্মাইতে পারে শুভ্র উত্তাপময় প্রেরণা

হইতে। সে প্রেরণা, মনে হয়, পেশাদার বায়োস্কোপের লোকের দ্বারা হইবে না। অর্থাৎ আমরা যাহারা একটির পর একটি ছবি করিয়া যাইতেছি। এ ভাষা বোধ হয় জন্মায়, যে রোজ করে না, তাহার চেতনায়। জীবনে খুব প্রয়োজন না হইলে যে মুখ খুলে না। যে মুখ খুলে একমাত্র জীবনমরণ সমস্যার চাপে পড়িয়া। খুব খানিকটা না রাগিলে, খুব ভাল না বাসিলে, খুব খুসী না হইলে, খুব না কাঁদিলে, এ আদিম ভাষা কোথা হইতে উঠিবে? ভাবে থাকা চাই।

আমি সেই একটা দুরাশা করিয়াছি। সেই ভাষাটিকে ধরিবার জন্য প্রাণপাত করিয়া যাইব, এ দেহ দিব। কিন্তু বাধা। ঐ যে, নিজের জমির উপর পা নাই আমার। অন্যত্র জমি হাসিল করিব কি করিয়া এবং কবে?

কারণ আমাকে যে ফিরিয়া যাইতে হইবে আমার মায়ের গর্ভে,
এ ভাষার উৎস-সন্ধানে!*

এরপরে সেই বিবর্ণ পাতাটি থেকে উদ্ধৃতি দিচ্ছি।

৩.

তারপরে যে চিন্তা আমাকে উদ্বিগ্ন করে, তা হচ্ছে ছবির সার্বজনীন হবার ক্ষমতা নিয়ে। সার্বজনীন মানে, সর্বদেশে একই দ্যোতনায় প্রতিভাত হবার ক্ষমতা বলছি এখানে।

আমি ধরে নিয়েছি, সর্ব্বদেশে কিছু করে লোক আছে যারা সত্যি চায়; সত্যি রূপে অবগাহন করতে চায়।†

(1) Universality of National nuances···whether they are intelligible to other examples. Basic problem of making people understand you. By which nuisance. Despair what is to be done?

(2) Political Situation······you are not liked by Lt. [Left] or Rt. [Right] nor by country or international cultural level of film enthusiasts.

(3) My Conviction, My Conclusion.

---

*অসমাপ্ত……। † এই অংশটি চলিত ভাষায় লেখা।

লেখাটি পড়ে বুঝতে পারি রূপকথার ছবি শিশু ও কিশোর মনে কোথা থেকে গড়ে উঠেছে। গেরুয়া পাঞ্জাবী পরা মানুষটির সঙ্গে হাঁটতে হাঁটতে বহুদিন ঐ রূপকথার দেশের বর্ণনা শুনেছি। শ্বশুরবাড়ির দেশে যাওয়ার সৌভাগ্য আমার হয়নি। কিন্তু পদ্মা, হাওরবিল, কাশবন যেন দেখতে পেয়েছি। আর গল্প শুনেছি রাজশাহী ও পাবনার দেশের বাড়ীর।

পাবনার ভারেঙ্গা গ্রামের বাড়ীতে দুর্গাপূজা হতো। দুর্গাপূজার সময় সবাই বাড়ী আসতেন। গোয়ালন্দ থেকে ষ্টীমারে যমুনা নদী দিয়ে নদীপথে যেতে হতো নতুন ভারেঙ্গা ষ্টীমার স্টেশনে। সেখান থেকে নৌকো করে যেতে হতো গ্রামের বাড়ী। ঐ সময় শরৎকালের প্রকৃতি উদ্ভাসিত হয়ে উঠতো আকাশ, মাঠ, নদীর জলে। চারিদিকের অপরূপ দৃশ্য দেখতে দেখতে দূরে দেখা যেতো দেশের বাড়ীর গ্রাম। সমস্ত গ্রাম-বাংলার প্রকৃতি দোলা দিয়ে যেতো কিশোর মনে, স্বপ্ন জাগাতো রূপকথার দেশের। পূজা, বাজনা, আনন্দ, গান ও দাদা-দিদিদের সঙ্গে কেটে যেতো কটা দিন।

পূজার শেষে বিসর্জনের বাজনা বাজার সঙ্গে প্রতিমা নিয়ে যাওয়া হতো সারি সারি নৌকো করে নদীর জলে। বাড়ী থাকাকালীন কয়টা দিন কিন্তু দুরন্তপনার শেষ নেই। নৌকো এসে গ্রামে লাগা মাত্রই লাফ দিয়ে নেমে শুরু হতো দুরন্তপনা। অনেক গল্প, অনেক ঘটনা, অনেক চরিত্রের কথা শুনেছি। বহুদিন গল্প শুনেছি, দুর্গাপূজার দিন পুরুতমশাইকে কিছু খাইয়ে একটা ঘরে বন্ধ করে রাখা হয়েছে। পূজার সময় চলে যাচ্ছে—শেষে আমার শ্বশুরমশাই অস্থির হয়ে নিজে পূজায় বসেছেন। আরোও যে কয়েকটি চরিত্রের বর্ণনা বহুবার শুনেছি তার মধ্যে একটি চরিত্র হলো অযান্ত্রিকের গামলা হাতে পাগল।

দিদির কাছে গল্প শুনেছিলাম—ভবা ও ভবী এই যমজ ভাইবোনের জন্ম হয়েছিল মার শেষ বয়সে। মা তখন বেরিবেরীতেও অসুস্থ ছিলেন। ভবার লম্বা চেহারা, চোখ দুটি ধ্যানস্থ—জন্মের পরে কান্না নেই, আর ভবী এত ছোট যে হাতের পাতায় নেওয়া যায়। ডাক্তার আশা ছেড়ে দিয়েছিলেন। বহু যত্নে দুজনকে বাঁচানো ও বড়ো করা হয়। এরপরেই জন্ম বড়দার বড়ো মেয়ে খুকু বা মহাশ্বেতার। কাকা ও পিসী থেকে ভাইঝি তিন মাসের ছোটো।

দিদির বড়ো মেয়ের জন্ম এক বছর পরেই। সুতরাং চারটি শিশুকে মানুষ করা হয় একই সঙ্গে। এরপরে বড়দার অন্যান্য ছেলেমেয়ে, দিদি ও ডলিদির ছেলেমেয়েদের একে একে জন্ম হয়।

আর আমার একজন জ্যাঠাশ্বশুরমশাই বোধহয় সন্ন্যাসী হয়ে গিয়েছিলেন, সুতরাং বড়মা ও দাদা-দিদিরাও ছিলেন। বড়মার হাতের দলাখাওয়ার গল্পও শুনেছিলাম।

আমার শ্বশুরমশাই-র শেষ কর্মস্থল ছিল ময়মনসিংহে। শৈশবের স্মৃতিজড়িত ময়মনসিংহের গল্প অনেক শুনেছি। বিরাট বাংলো, মা, বাবা, দাদা, দিদিরা মিলে আনন্দময় জীবন। মাঝে মাঝে পার্টি হতো, বাবা ছিলেন একেবারে সাহেব। বেয়ারা, বাবুর্চি রান্না করতো। কিন্তু মার রান্না ছিল অমৃত, তিনি দিনের বেলা সমস্ত রান্না নিজে করতেন। বড়দার (শ্রীমনীশচন্দ্র ঘটক) লেখা 'কনখল' উপন্যাসটিতে—মা, বাবা ও ঐ সময়কার পারিবারিক অবস্থা সম্বন্ধে খানিকটা জানা যায়।

ময়মনসিংহের পর বাবা-মা এসে থাকেন রাজশাহীতে। ছোট ভাইকে বড়দা কলকাতা নিয়ে আসেন।···আবার দুরন্তপনা শুরু। বড়দা বড়দি খুবই চিন্তায় পড়লেন। প্রায়ই স্কুলপালানো হতো। শেষটায় বড়দি একটি খাতায় বাড়ী থেকে বেরুবার সময় লিখে সই করে দিতেন। স্কুলে হেডমাস্টার মশাই পৌঁছানোর সময় লিখে সই করতেন, কারণ যে স্কুল পালানোর অসম্ভব ঝোঁক যদি এতে বন্ধ করা যায়। কিন্তু ঐ দুজনের সই জাল করেও বালীগঞ্জ গভর্ণমেণ্ট স্কুল থেকে পালানো হতো। এই দুর্ধর্ষ কাহিনী বলে কি হাসি! শেষটায় বড়দা কানপুরে নিয়ে গিয়ে টেক্সটাইলে ভর্তি করে দেন।

দুরন্ত ছেলেটি এখানে ছিলেন দুবছর। খুব আর্থিক দুর্গতির মধ্য দিয়ে দিন কাটাতে হয়েছে। সামান্য পয়সার ডাল রুটি খাওয়া ও মজুরদের সঙ্গে মেশার ও ওদের জীবনকে জানার অভিজ্ঞতা তখনই হয়। ছোটগল্প লেখার প্রাথমিক রসদ ঐ সমস্ত অভিজ্ঞতা। বিখ্যাত 'রাজা' গল্পটি ওখানকার অভিজ্ঞতার ভিত্তিতেই লেখা। শনিবারের চিঠিতে ছাপা হয়েছিল। দু'বছর পরে সেজদা গিয়ে রাজশাহী নিয়ে আসেন। মারও খুবই চিন্তায় দিন কেটেছে।

আবার পড়াশুনা শুরু। সেই দুরন্ত মন ডুবে যায় পড়ার সমুদ্রে।

রাজশাহীতে বাড়ীর সামনেই ছিল বিরাট পাবলিক লাইব্রেরী। বাবা নিজে ছেলের বইপড়ার অভ্যাস তৈরী করিয়ে দিয়েছিলেন, বিশেষ করে সংস্কৃত। আর দুঁদে ছেলের দিন পদ্মার পারে কিভাবে কেটেছে, রূপকথার দেশের স্বপ্ন দেখেছে, আগের প্রবন্ধে আমরা জেনেছি।

১৯৪৪ সালে ম্যাট্রিক, ১৯৪৬-এ ইণ্টারমিডিয়েট ও ১৯৪৮-এ ইংরাজী অনার্স নিয়ে বি. এ. পরীক্ষা। এই কবছরে অভিনয়, একটি কাগজ বের করা (অভিধারা) এবং একটি উপন্যাস ও কয়টি গল্পও লেখা হয়।*

এই শৈশব, কৈশোর ও তরুণ বয়সের উদ্দাম দিনগুলোর পরই দেশভাগ।

২.

পাবনা, রাজশাহী, ময়মনসিংহের স্মৃতি তরুণ মনকে আলোড়িত করে। প্রথম নাটক 'দলিলে' আমরা তার প্রকাশ দেখি। 'বাংলারে কাটিবারে পারিছ, কিন্তু দিলটারে কাটিবারে পার নাই।'...

লেখার মাধ্যমে কিছু লোক, অভিনয়ের মাধ্যমে আরো বেশী লোক, কিন্তু সব চাইতে বেশীসংখ্যক লোককে উদ্বুদ্ধ করা যাবে চলচ্চিত্রের মাধ্যমে সুতরাং বিশ্ববিদ্যালয়ের শেষ পরীক্ষাটি না দিয়ে শুরু হয় ছবি তৈরী। কিন্তু লেখা, নাটক, অভিনয়ও বন্ধ হয়নি। ওঁর নিজের ভাষায় :†

> ছবির জগতে আসার অনেকগুলি কার্য-কারণ সম্পর্ক ছিল। আমার এক দাদা, মেজভাই মারা গেছেন, এদেশে প্রথম টেলিভিশন এক্সপার্ট। মেজদা গ্রেটব্রিটেনে ডকুমেণ্টারী ক্যামেরাম্যান হিসাবে ছ'বছর কাজ করে দেশে ফিরে আসেন নাইনটিন থার্টি ফাইভে, সিক্সে তিনি Join করেন নিউ থিয়েটার্সে। সায়গল-কাননবালার স্ট্রীট সিঙ্গার ছবিতে তিনি ক্যামেরাম্যান ছিলেন, এই ধরণের অনেক ছবিতেই তিনি কাজ করেছেন। মেজদার সুবাদে, ছোটবেলা থেকেই দেখেছি

*এরমধ্যে 'রাজা' গল্পটি বিয়ের আগে আমাকে পড়ে শুনিয়েছিলেন। কাশীনাথ (গুণ্ডা) চরিত্রটির উল্লেখ আছে ঐ গল্পে। পরে একটি অর্দ্ধসমাপ্ত উপন্যাসেও ঐ চরিত্রটির বর্ণনা ছিল। অর্দ্ধসমাপ্ত উপন্যাসটি আমার কাছে ছিল। পরে উই নষ্ট করে দেয়। একটি উচ্চমধ্যবিত্ত পরিবারের ছেলে হয়েও সমাজের নীচুতলার মানুষদের জালা, বোঝা লক্ষ্যণীয়।

† চিত্রবীক্ষণ : ঋত্বিকসংখ্যা

বড়ুয়া সাহেব থেকে শুরু করে বিমল রায় অবধি অনেককেই, তাঁরা আমাদের বাড়ীতে প্রায়ই আসতেন। কাজেই আমাদের বাড়ীতে সেই যুগের Filmয়ের একটা আবহাওয়া বা পরিবেশ গড়ে উঠেছিল। আর সকলেই যে রকম ছবি দেখে সেরকম আমিও এঁদের ছবি দেখতাম, আমার একটা বিশেষ উৎসাহ ছিল কেননা আমি এঁদের দেখতাম দাদার সঙ্গে আড্ডা মারতে। কাজেই পরিবেশ মোটামুটি তৈরী হয়ে গিয়েছিল। ছবির জগতে আসবো একথা অবশ্য তখনো ভাবিনি।

নানারকম করেছি, বাড়ী থেকে দু-তিনবার পালিয়েছি। কানপুরে একটা textile mill-য়ে কাজ করেছি bill deparment-য়ে। সিনেমাটা মাথায় ঢোকেনি তখনো। বাড়ী থেকে জোর করে ধরে নিয়ে এল কানপুর থেকে, সেটা বিয়াল্লিশ সাল। মাঝখানে দুবছর পড়াশুনো gone. বাড়ি থেকে যখন পালিয়েছিলাম তখন আমার বয়সে চোদ্দ। বাবা বলেছিলেন ম্যাট্রিক পরীক্ষাটা দিলে ইঞ্জিনিয়ার ফিঞ্জিনিয়ার হওয়া যায়, নইলে নাকি মিস্তিরি হয়ে থাকতে হবে। হঠাৎ পড়াশুনায় মন এসে গেল এবং তারপর পড়াশুনার দিকেই মন থাকলো। এবং বাঙালী ছেলেদের যা বাঁধা এবং ফরাসীদেরও যা হয় শুনেছি যে ভেতরে একটা creative urge দেখা দিলেই প্রথমে কবিতা বেরোয়, তা দু-চারটে অতি হতভাগা লেখা দিয়ে আমার শিল্পচর্চা শুরু হোল। তারপর আমি দেখলাম ওটা আমার হবেনা। কাব্যির একলক্ষ মাইলের মধ্যে আমি কোনদিন যেতে পারবনা। তারপর হল কি, রাজনীতিতে ঢুকে পড়লাম। ৪৩-৪৪-৪৫, সে সময়কার কথা যাঁরা জানেন তাঁরা জানেন যে সে সময়টা ছিল রাজনৈতিক ক্ষেত্রে দ্রুত পটপরিবর্তনের সময়।

ফ্যাসীবিরোধী আন্দোলন—ফ্যাসীবিরোধী ব্যাপারটা হবার সঙ্গে সঙ্গে জাপানী আক্রমণ, বৃটিশদের পালানো, এখানে সেই যুদ্ধ-বোমা টোমা, হ্যানাত্যানা—মানে very quickly in succession কতকগুলো ঘটনা ঘটে গেল, চালের দর চড়ে গেল, দুর্ভিক্ষ-famine, পরপর কতকগুলো changes সমস্ত মানুষের চিন্তাধারাকে একটা বিরাট ধাক্কা দিল।

আমি তখন মার্কসবাদী রাজনীতির দিকে ঝুঁকে পড়েছি, ঝুঁকে পড়েছি শুধু নয়, active কর্মী, card-holder ছিলাম না অবশ্য, কিন্তু close sympathiser, fellow-traveller আর কি। সেই সময় গল্প লিখতে আরম্ভ করলাম। গল্প লেখার urge টা কিন্তু সেই কবিতা লেখার মত ভুয়ো ধোঁয়াটে ব্যাপার ছিলনা। চারপাশে যে সমস্ত বদমাইসি অত্যাচার ইত্যাদি দেখছি তার বিরুদ্ধে রাজনৈতিক জীব হিসাবে সোচ্চার প্রতিবাদ করার ইচ্ছে থেকেই গল্প লেখার urge এসেছিল সেই ছোট বয়সেই। গল্প আমি খুব খারাপ লিখতাম না। আমার এখনো মনে আছে আমার আর সমরেশের প্রথম ছাপা গল্প বেরোয় অগ্রণীতে, তারপর সজনীবাবুর 'শনিবারের চিঠি', গল্পভারতী' —নৃপেন্দ্রকৃষ্ণবাবু তখন editor, দেশ—সব মিলিয়ে আমার গোটা পঞ্চাশ গল্প বেরিয়েছিল। এর মধ্যে একটা magazineও বের করেছিলাম, marxist ঘেঁসা। ঐ মফঃস্বল শহর থেকে আমি তখন রাজশাহী সহরে third year এ পড়ছি। মফঃস্বল শহরে ছাপা magazine তখন খুব দুস্প্রাপ্য ব্যাপার। বেশ কয়েক মাস চলেওছিল কাগজটা। সবই নিজেদের ট্যাঁকের পয়সা থেকে, অবশ্যই উঠে গিয়েছিল যথারীতি। তারপর মনে হল গল্পটা inadequate, ভাবলাম গল্প কজন লোককে নাড়া দেয় আর নাড়া দেয় অনেক গভীরে গিয়ে, কাজেই অনেক সময় লাগে পৌছতে। আমার তখন টগবগে রক্ত, immediate reaction চাই। সেই-সময়ে হল 'নবান্ন'। 'নবান্ন' আমার সমস্ত জীবন-ধারা পালটে দিল।

গণনাট্য সঙ্ঘে তখনো join করিনি। তবে আশেপাশে ঘুরেছি। প্রত্যেকেই আমার চেনা। শম্ভুদা, বিজনবাবু, সুধীবাবু, দিগিনবাবু, গঙ্গাদা, গোপাল হালদার মশায়, মাণিকবাবু, তারাশঙ্করদা। গণনাট্যসঙ্ঘ তখন আলাদা ছিলনা, Progressive Writers' Association-য়ের একটা অংশ ছিল। তারাশঙ্করদা ছিলেন P. W. A.-রPresident, এঁদের সকলের সঙ্গে আমার আলাপ ছিল। আমার বড়দা কল্লোলযুগের একজন নাম করা কবি ছিলেন, যুবনাশ্ব, মণীশ ঘটক, সেই সুবাদে সাহিত্যিক মহলের সঙ্গেও আমাদের পরিবারের একটা যোগাযোগ ছিল। কাজেই সিনেমার লোক-

জনদের যেমন চিনতাম তেমনি চিনতাম এঁদেরও। আর এঁদের মধ্যে থেকে হঠাৎ এই 'নবান্ন' আমার কাছে হঠাৎই লেগেছিল। 'নবান্ন' আমার সমস্ত চিন্তাধারা পালটে দিল, আমি নাটকের দিকে ঝুঁকে পড়লাম।…I. P. T. A.'র member হয়ে গেলাম। তারপর 'নবান্ন'ই যখন আবার revised হল সাতচল্লিশের শেষের দিকে তখন তাতে আমি অভিনয়ও করেছি। তারপর আমি পুরোপুরি গণনাট্যতে, central squad-য়ের leaderও ছিলাম, নাট্যকার হিসাবে তখন নাটকও লিখেছি। নাটক immediate reaction তৈরি করে বলে দারুণ লাগছিল, কিন্তু কিছুদিন পরে সেটাও মনে হল inadequate, মনে হল এটাও সীমিত। ব্যাপারটা হচ্ছে চার পাঁচ হাজার লোক, আমরা যখন মাঠে-ময়দানে নাটক করতাম তখন চার পাঁচ হাজার লোক জমা হত, নাটক করে তাঁদের একসঙ্গে rouse করা যেত। তখন মনে হল সিনেমার কথা, সিনেমা লাখ লাখ লোককে একসঙ্গে একেবারে complete মোচড় দিতে পারে। এই ভাবে আমি সিনেমাতে এসেছি, সিনেমা করব বলে আসিনি। কাল যদি সিনেমার চেয়ে better medium বেরোয় তাহলে সিনেমাকে লাথি মেরে আমি চলে যাব। I don't love film. সিনেমার প্রেমে মশায় আমি পড়িনি।

প্যারাডাইস কাফেতে পানু পাল, কালী ব্যানার্জী, সলিল চৌধুরী, হৃষিদা (হৃষিকেশ মুখার্জী) মৃণাল সেন, তাপস সেন, ঋত্বিক ঘটক প্রভৃতির আড্ডা তখন বিখ্যাত ছিল। আড্ডার সঙ্গে ভবিষ্যতের বহু পরিকল্পনা হতো। পরে এই সব বন্ধুরা নাটক, গান, ফিল্ম ও সাহিত্যের দিকে এগিয়ে গেছেন, জীবনে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন। আমি কলকাতায় আসার পর সর্বাগ্রে যাদের নাম শুনতাম উৎপল দত্ত, সলিল চৌধুরী, তাপস সেন, কালী ব্যানার্জী প্রভৃতি। এঁদের মাধ্যমে একটি নাম সর্বদাই শুনতাম—ঋত্বিক ঘটক।

'দলিল' ও 'বিসর্জন' আমি দেখেছিলাম, 'ভাঙাবন্দর,' 'অফিসার' প্রভৃতি সম্বন্ধে আমি শুনেছিলাম, দেখিনি ও ঐ সময়টা সম্বন্ধে আমি কিছু জানি না। যাঁরা জানেন, তারা ভাল বলতে পারবেন।

'জ্বালা' নাটকটি সম্বন্ধে শুনেছিলাম। ১৯৫০ সালে পর পর কয়টি

আত্মহত্যার খবর বেরিয়েছিল কাগজে। সেগুলো সম্বন্ধে রিপোর্ট লিখে পাঠানো হতো 'People's Age' এ। তখনই নাটকটি লেখার পরিকল্পনা ওঁর মাথায় আসে। আত্মহত্যা করে কোন সমাধান নেই, জ্বালা জুড়াবে না। পৃথিবীতে বেঁচে থেকে সংগ্রাম করে যেতে হবে। নাটকটির বিষয়বস্তু ও দৃষ্টিভঙ্গি চমৎকৃত করেছিল।

ভারতীয় গণনাট্য সংঘ ও পার্টি

'ছিন্নমূলে' অভিনয়, 'তথাপি'তে সহকারী পরিচালক, 'বেদনা' ও 'নাগরিক'! দীর্ঘ ইতিহাস! কিন্তু চরম হতাশা, পার্টি কমিশন, নীচের মহল, গ্রুপ থিয়েটার, সাঁকো। এই সময়ই বিস্তৃত ভাবে শুনেছি ওঁর ছোটবেলার কথা। আর শুনেছি 'নাটোরের মহারাজার বাড়ী আমার মামার বাড়ী।' মহারাজার কন্যা বিভামামীমা মার খুব বন্ধু ছিলেন। মার মৃত্যুর পরে বিভামামীমা এসেছিলেন।

বার বার মনে হতো একজন বাংলাদেশের ছেলে! যিনি মার্কসবাদে বিশ্বাস করে এগিয়ে নিয়ে যাবেন সাংস্কৃতিক আন্দোলনকে, ভারতীয় ঐতিহ্যকে! আমার সঙ্গে এরই পরিপ্রেক্ষিতে আলাপ, পরিচয়, ঘনিষ্ঠতা! গ্রুপ থিয়েটার নিয়ে তখন কল্পনা করতাম একদিন নিজেদের একটা স্টেজ হবে। এরপর একটা স্টুডিয়ো হবে। জীবনে বহু সহ্য করা, বহু অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে এগিয়ে এসেও এতো সরল কি করে ছিলাম, আজ ভাবলে অবাক লাগে। ভাবতাম, আর কি সমস্যা! এবার শুধু এগিয়ে চলা।

মনে পড়ে চরম হতাশা, বেকারী, অর্থাভাব, চার্জ ইত্যাদির বিরুদ্ধে সুস্থ, সুন্দর জীবন গড়ে তুলবার চেষ্টা ও আকাঙ্ক্ষার কথা। একুশ বছর আগের ঐ পবিত্র দিনগুলো সজীব ও জীবন্ত হয়ে আসছে মনে। খুলে বসি চিঠির ঝাঁপি। আমার শ্রদ্ধেয় কাকাবাবু শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে যখন চিঠি লিখতাম তখন একদিন তিনি লিখেছিলেন—'সাহিত্য কি? এওতো একধরণের খোলা চিঠি। যা কিনা নিজের অন্তর্যোগে নিঃসৃত, সেই আন্তরিক প্রকাশকে সকলের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়া।'

১.

রাঁচী

২২. ২. ৫৫

রাঁচীতে এই কয়দিন ঊর্দ্ধশ্বাসে কাজ করে যেতে হয়েছে। কিন্তু কি আনন্দের কাজ, কি করে বোঝাব তোমাকে। ওঁরাও আর মুণ্ডাদের মধ্যে সারাদিন কাটছে, মাটির স্বাদ পাচ্ছি, অপূর্ব গানের স্বর আর মাতাল করা নাচের ছন্দ অহর্নিশি, ওদের নিপীড়িত জীবনের মধ্যে বাঁচার আকুলতা, এসব আমায় ক্ষেপিয়ে দিয়েছে। এ বাস্তবের কণামাত্র নিয়ে যেতে পারছি সঙ্গে করে, কিন্তু তাতেই দৃঢ় প্রত্যয় জন্মেছে মানুষকে বুঁদ করে দিতে পারব। যা আমি নিয়ে গেলাম তাতে কর্তারা খুসী হবেন, দর্শক খুসী হবে, কিন্তু আমার অতৃপ্তি কাটবে না। আমি তো জানি, বিরাট ঐশ্বর্য ভাণ্ডার 'আমার সামনে খোলা রয়েছে, তার বিন্দুমাত্র আমি ধরতে পারলাম। ইচ্ছে হচ্ছে, আবার আসব, আরো বড়, আরো বাস্তবপূর্ণ, আরো ব্যাপক ছবি করব। হয়তো করা হবে না আমার জীবনে, তবু ইচ্ছে হচ্ছে।

আর এদের মেয়েরা। এমন সরল, এমন হাস্যময়ী, এমন ছন্দোময়ী এরা যে প্রতিপদে আমার তোমার কথা মনে পড়ে যায়। অনেক মেয়েকে দেখে তোমার কথা ভেবেছি, কোথাও মিল নেই, তবু কোথায় যেন আছেও। এদেরকে আমি ভালবেসে ফেলেছি। এদের জীবনকে আমি শ্রদ্ধা দেখানোর আপ্রাণ চেষ্টা করছি, দেখি কতদূর করতে পারি। সরকারী বিধিনিষেধ এ ছবির ওপর কম, তাই হয়তো খানিকটা পারবোও।

এদের ইতিহাস আমি জানলাম, এখানে এদেরই মধ্যের শিক্ষিত কয়েকটি লোকের contact পেয়েছি, যাদের মধ্য দিয়েও জানলাম এদের বিপ্লবী ঐতিহ্যের কথা। তাকেও সাহস করে যতখানি পারি ধরে ফেলেছি। তারপর দেখা যাবে।

বীরসামুণ্ডার কাহিনী তুমি শুনলে বড় ভাল লাগবে। বারবার তোমার কথা মনে হচ্ছে। এখানে একটি একেবারে গ্রাম্য ওঁরাও দলের পরিচয় পেয়েছি, যারা গত National Festival-এ দিল্লীতে

2nd Prize পেয়েছিল। ওদের নাচের মধ্যে নবজীবনের বিষয়বস্তু ঢুকিয়ে তৈরী করে কলকাতায় নিয়ে আসবার একটা ব্যবস্থা করেছি, দেখি কতদূর হয়। এদের মধ্যে আমাদের কাজ নেই, অথচ এরা হচ্ছে দেশের গভীরতম স্থল, Landless peasants, Semi-Proletarians of the rural area. তোমাকে পাশে নিয়ে ঘুরতে পারলে কঠিন ব্যাপার হত।

Group Theatre-এর কাজ ভাল করে কোর। সামান্য Slackness-এ মুষড়ে পোড়না। কাজ চালু রাখ। Show date কিছু ঠিক হল? কাজকর্ম চালিয়ে যাও। আমি ঠিক সময়ে এসে যাব। হতাশ হবে না কিছুতেই। নিজের পার্টের ওপরে কাজ চালিয়ে যাও, নিজেই Improvement বুঝতে পারবে। অমলেশকে বোল Leadership নিয়ে সব কাজ বজায় রাখতে। ও-ই পারবে, ওর সে ক্ষমতা আছে।

আমি কাল এখানে থাকছি, ছবির কাজ বাকী আছে। পরশুদিন মোটরে করে আড়াইশ মাইল দূরে দেওঘর যাব। সেখান থেকে আরম্ভ হবে Whirlwind tour. কত তাড়াতাড়ি শেষ করা যায় দেখি। তোমার জন্য মন কেমন করছে।

চাকরির ব্যাপারে একটা সুরাহা হয়ে এসেছে। আমার কাজে এরা অত্যন্ত খুসী। মনে হচ্ছে পুরো ছবি করার সুযোগ কলকাতাতে ফিরেই পাব। দেখা যাক। অন্ততঃ বিয়ে করে সংসার খরচ চালানোর জন্যে খুব দুশ্চিন্তা না করলেও চলবে।

পার্টি লোকাল ইপ্‌টার ব্যাপারে কিছু এগোল কি? সব খবর বিস্তারিতভাবে পাটনার ঠিকানায় লিখো। আমি যাতে ২৭শে পৌছে পাই। তোমার শ্রীহস্তের দুছত্র লিপি এখন তৃষিত চাতকের ফটিক জলের মত।

২.

দেওঘর

২. ৫. ৫৫.

রাঁচীতে তো তুমি চিঠি দিলে না।

গতকাল রাঁচী থেকে প্রায় আড়াইশো মাইল বাসে করে অনবদ্য

দৃশ্য সব দেখতে দেখতে দেওঘরে এসেছি। পথে হাজারিবাগ, পার্শ্বনাথ, তোপচাঁচী Lake, গিরিডি, মধুপুর, যসিডি হয়ে এলাম। এখানে এসে হটাৎ পায়ে একটা ব্যথা হয়ে জ্বর হল। ওষুধ খেয়েছি, ডাক্তার দেখিয়েছি, এবং এখন বেশ ভাল আছি।

কাল সকালবেলা গয়া রওনা হচ্ছি। পাওয়াপুরী, নালন্দা, গৃধ্রকূট, রাজগীর ও বিহারশরীয়া হয়ে পয়লা নাগাদ পাটনা পৌছবার কথা। পাটনায় গিয়ে যেন তোমার চিঠি অবশ্যই পাই। মন নইলে বড় খারাপ হয়ে যাবে।

রাঁচীর কাজ আমার খুব ভাল হয়েছে। যদিও এমন তাড়াহুড়োতে ব্যাপারটির ওপরে প্রয়োজনীয় শ্রদ্ধা দেখানো সম্ভব হয়নি, এবং যে বিপুল ঐশ্বর্যভাণ্ডারের মধ্যে গিয়ে পড়েছিলাম, তার সামান্যটুকুতেই তৃপ্ত থাকতে হল, তবু এদের দরকারের দিক থেকে এবং কলকাতার বুদ্ধিজীবীদের standard-এর দিক থেকে একেবারে প্রথম শ্রেণীর কাজ করা গেছে। এদের প্রাণের এইটুকু গভীরেও এঁরা এর আগে ঢোকেন নি। কাজেই ছবিটি সম্মান পেতে বাধ্য। আনন্দদানের দিক থেকেও এত প্রচুর সম্পদ আছে। তোমাকে ফিরে গিয়ে বলব, এদের সব অপূর্ব নাচের কথা। আর কি সুন্দর এদের ছেলেমেয়েরা।

আর এখানে মানুষের ছোঁয়াচ পেলাম প্রতিপদে। কত টুকরো ঘটনা যে সব ঘটে যায়, কত-পলকপাতের মধ্যে মনে গভীর রেখাপাত করে যায় এক একটা মানুষ। কত বিত্তশালী মনে হয় নিজের দেশকে। মানুষের সম্পদে ধনী।

সব গুছিয়ে এখন লেখা যাবেনা—এদের আস্বাদন আমার অর্ধেক হয়ে আছে, কলকাতায় ফিরে তোমার সঙ্গে মিলে পুরো স্বাদ পাব। এখন অন্য কথা বলি।

আজ তোমাকে লেখার কথা ছিলনা। হঠাৎ ভীষণ মন কেমন করতে আরম্ভ করল একা হোটেলে শুয়ে শুয়ে। আর সবাই একটু ফাঁক পেয়ে বেড়াতে বেরিয়েছে। আমারও জ্বর ছেড়ে যাচ্ছে। দূরে ত্রিকূট পাহাড় দেখা যাচ্ছে, ফাঁকা আন্দোলায়িত মাঠের ওপরে দামাল হাওয়া লাল-মহুয়া আর পলাশ গাছগুলোকে নেড়ে দিয়ে যাচ্ছে। আর বারবার করে পাতা ঝরছে। আজ প্রথম বসন্তের হাওয়া

[১]

[২]

[৫]

[৬]

[৭]

[৮]

[৯]

[১০]

[১৩]

[১৪]

[১৫]

[১৬]

[১৭]

[২১]

[২২]
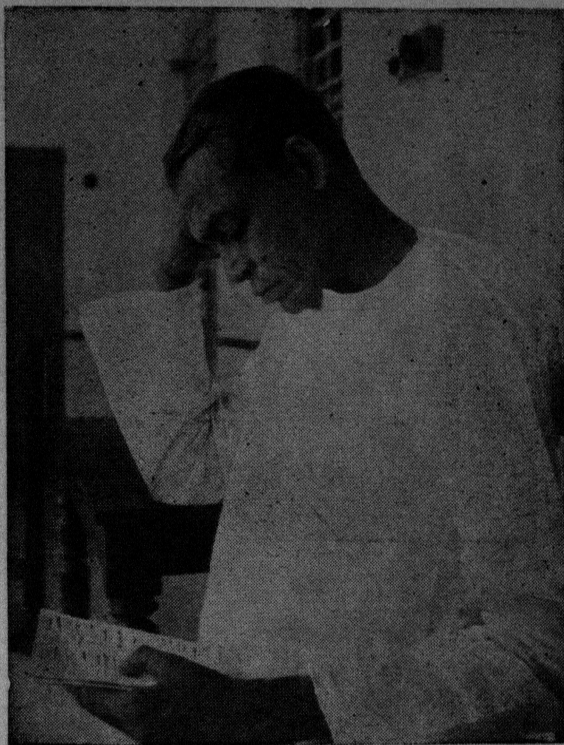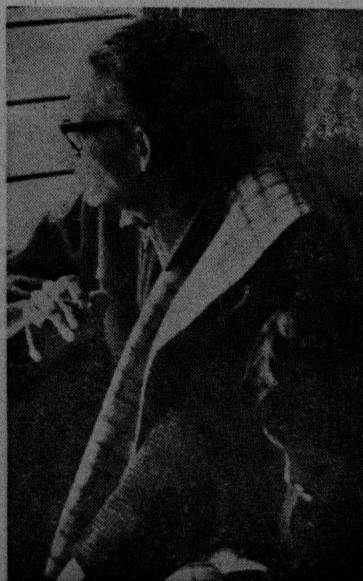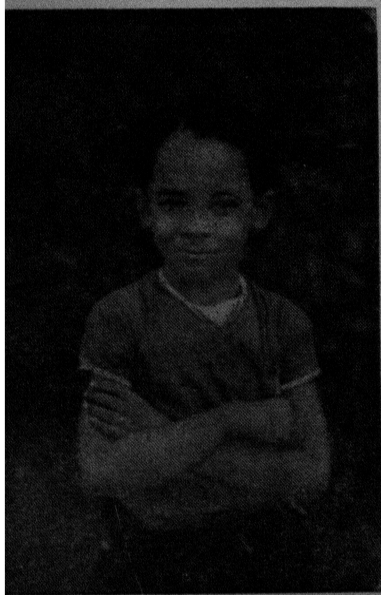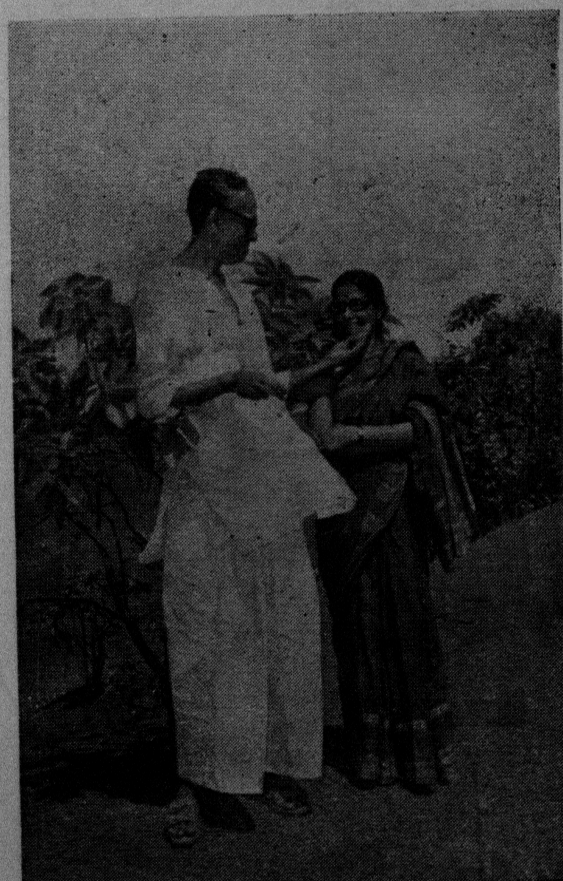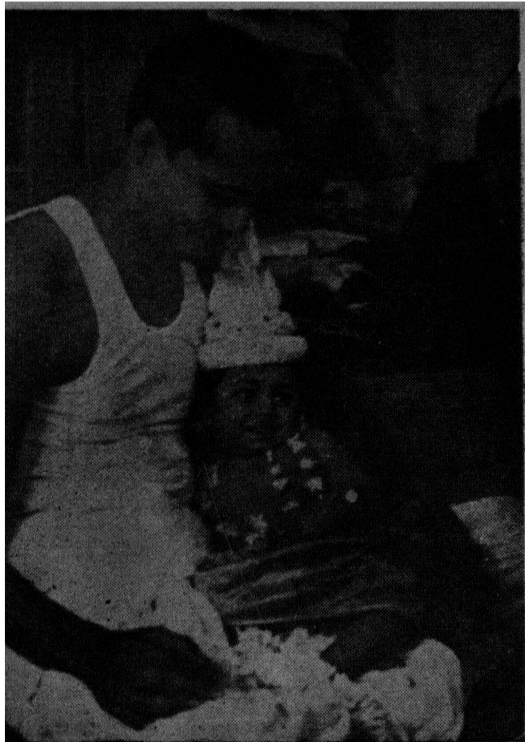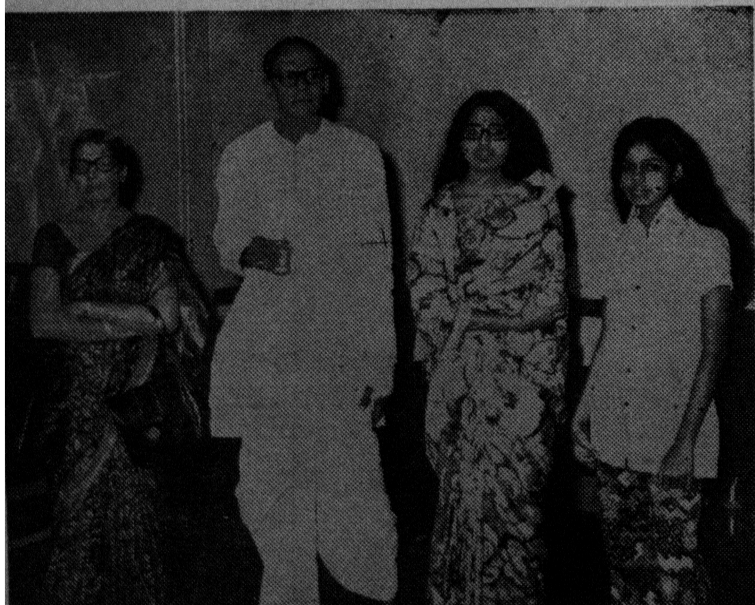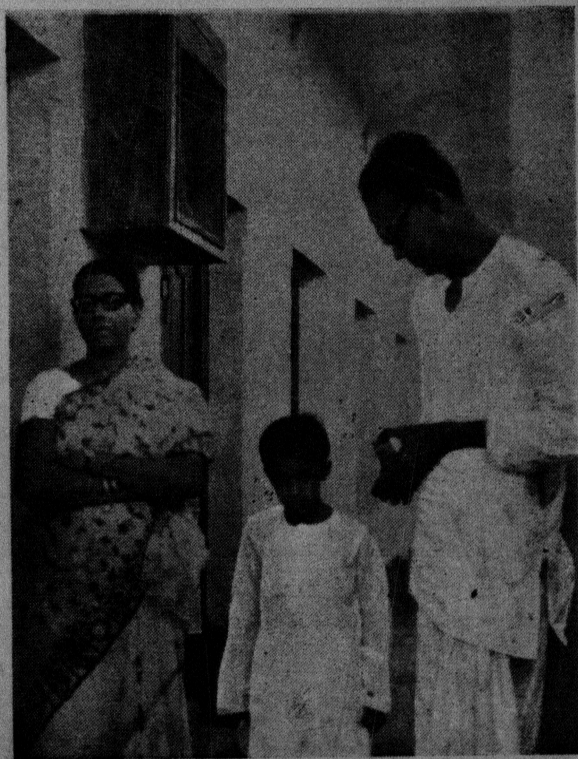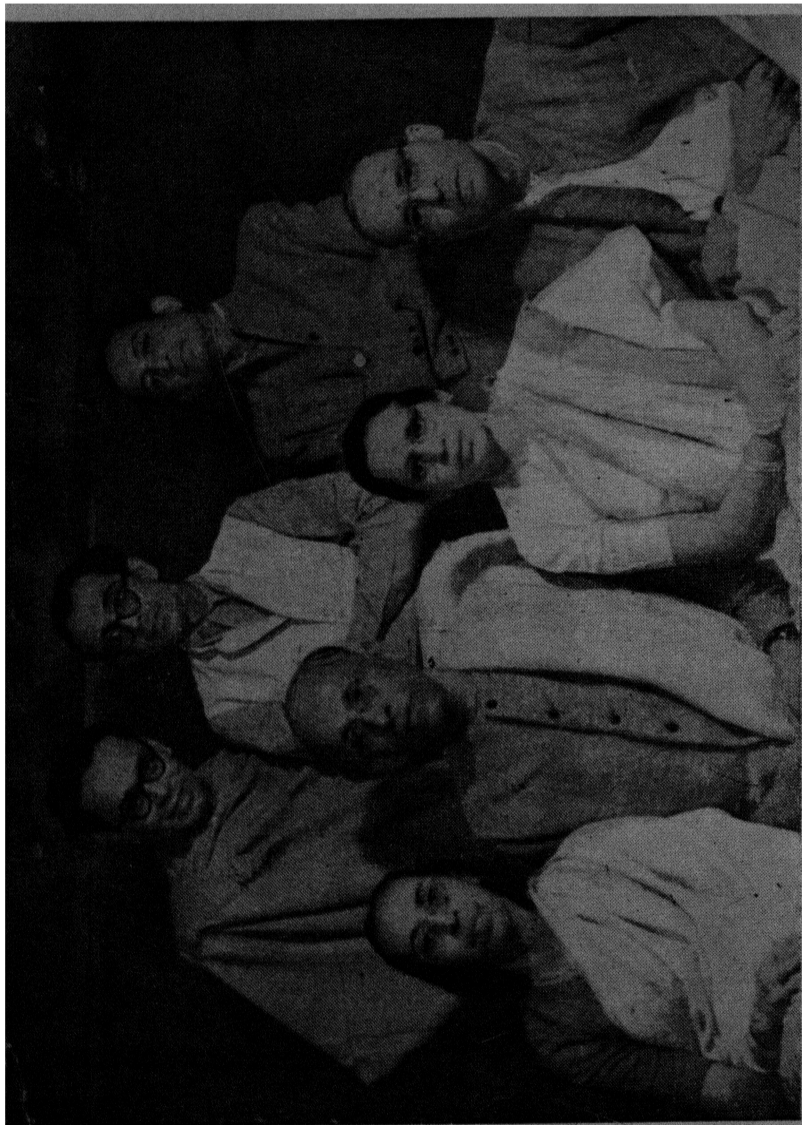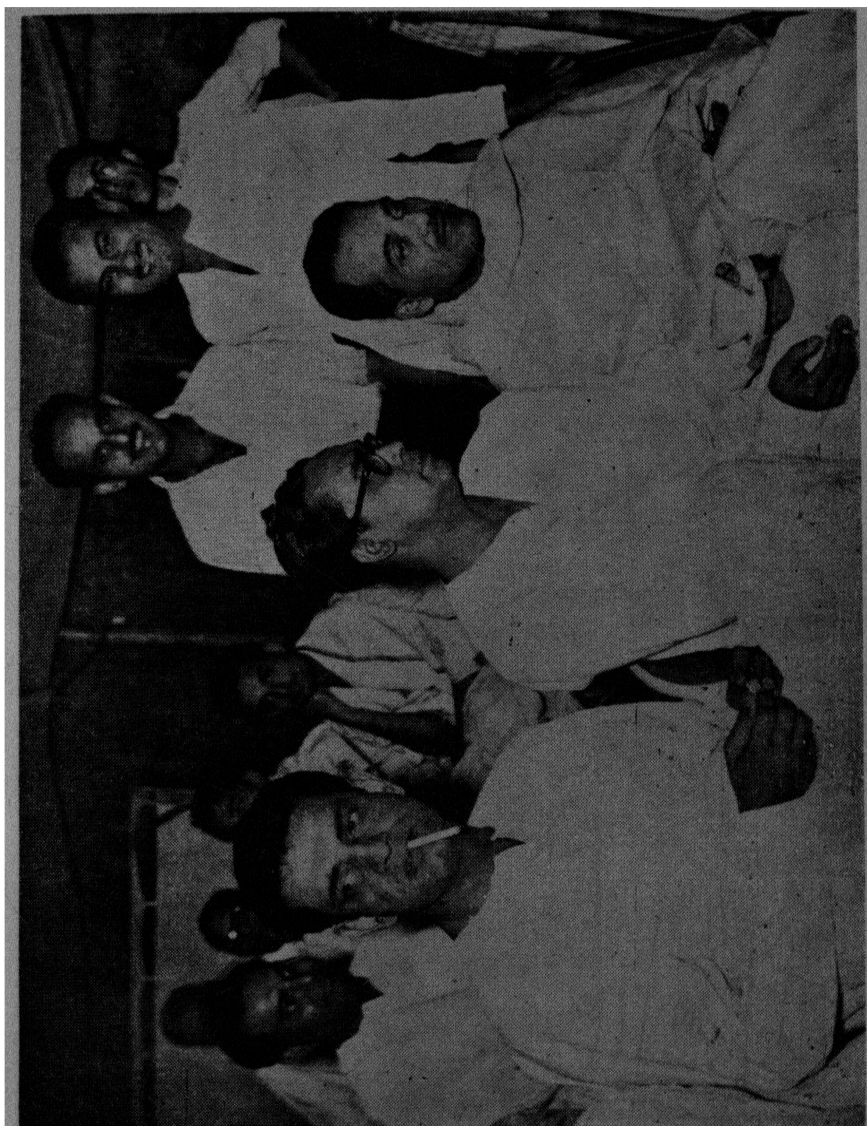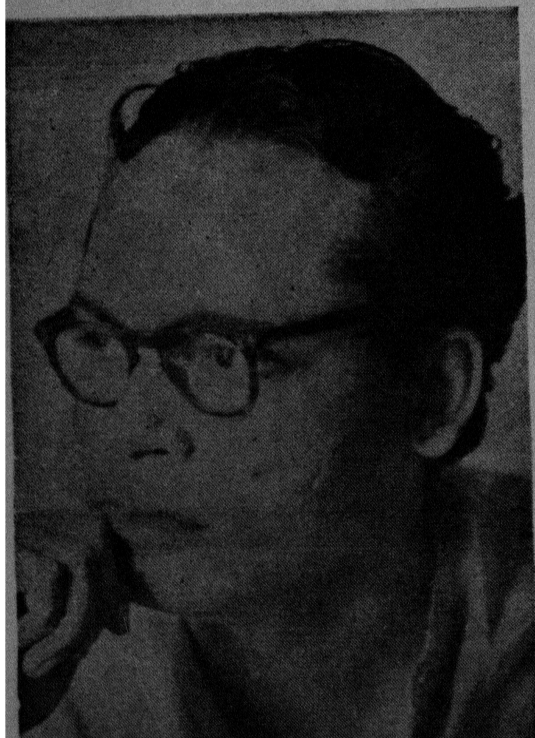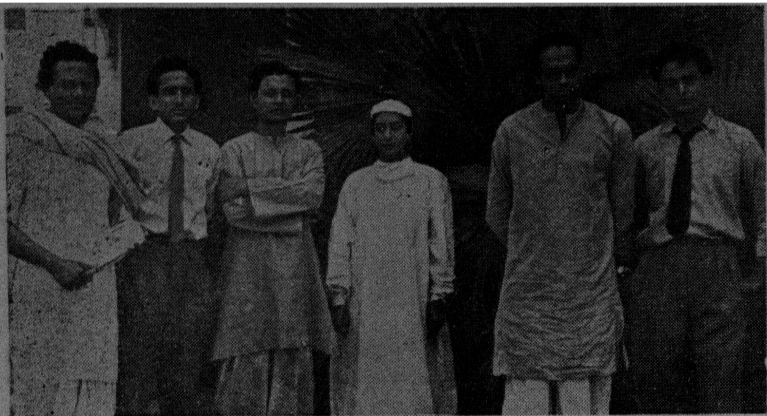
দিচ্ছে হঠাৎ। আমার মনও হঠাৎ কি একটা টানে আকুল হয়ে উঠতে আরম্ভ করল। আগেও আমার এমন হত, অনেকদিন বাদে আজ অনুভব করছি।

এ এক বিচিত্র অনুভূতি আমার! যা কিছু পেছনে ফেলে আসা সেই ছোটবেলা থেকে কত-কতদিনের কথা সব মনে পড়তে থাকে, শিশু-কালের সরল দেখার ভাবকে মনে পড়ে, বড় পবিত্র লাগে। মনে পড়ে সব নাম হারিয়ে যাওয়া, প্রায় ভুলে যাওয়া তুচ্ছাতিতুচ্ছ ঘটনার কথা, কবে দেখা সব মানুষের কথা। সময়ের স্রোতে উজান কেটে আবার সেইসব দিনে অকারণেই ফিরতে ইচ্ছে করে বড়, আর অসম্ভব একলা ভেবে বড় মন কেমন করে।

নিজেকে বড় অসহায় মনে হয় এমন অবস্থায়। কিছু ভাল লাগেনা। বুঁদ হয়ে শুধু ভাবতে ইচ্ছে করে। আগেও এমন আমার বারবার হয়েছে। আজ শুধু একলা [তবু] তফাৎ আছে। নিজেকে বড় পূর্ণ লাগে যখন ভাবি, আমার চিন্তার সাথী একজন আছে, যে আমার সবচেয়ে উদ্ভট সবচেয়ে আজগুবী মনোভাবকেও পরম স্নেহের আলো দিয়ে বুঝতে পারে। আমি নিজেকে উদ্ঘাটিত করতে পারি একটি লোকের কাছে, আজ তাই আমার অনুভূতি আনন্দ এনে দিচ্ছে।

তোমাকে পাওয়াটা বড় ভীষণ ব্যাপার হয়ে গেছে আমার জীবনে। আমি এবার নিশ্চিন্ত। আমি আর কিছু চাইনা।

আর মার কথা মনে পড়ছে। মার সেই স্নেহ-আবেশ উন্মনা দৃষ্টি মনে পড়ছে। তাঁর ফোটোতে যা দেখেছি। আজ মা কেন বেঁচে নেই, তবে যেন সম্পূর্ণ হত ব্যাপারটা।

৩.

পাটনা

২. ৩. ৫৫.

এইমাত্র তোমার চিঠি পেলাম ও দুবার পড়লাম। রাঁচীতে লেখা চিঠি পাইনি। জানিনা, তার কি হয়েছে। ১৫ তারিখে শো। রাজ-নীতির ব্যাপারটাও ৬।৭ তারিখের মধ্যে সারতে হবে। ভূপতিদার বাড়ীর ব্যাপারটা একটা কাঁটার মত মনের মধ্যে খচখচ করে বিঁধছে

সবসময়। কিন্তু যা দেখছি, ৭ তারিখ সকালে পৌঁছাবার প্রচণ্ড সম্ভাবনা।

ইউনিট মিটিং সেরে দিয়ে তোমরা যা হয় লিখে দাও। রাজনীতিক লড়াইএর জন্যে আমার বিন্দুমাত্র চিন্তা নেই। Document এবং আমার P.C.-র কাছে চিঠি সমস্ত দিকগুলোই মোটামুটি Cover করে দিয়েছে। L.C.-র Copyটা অবিলম্বে D.C তে দিয়ে আসবে।

আমার প্রধান দুশ্চিন্তা হচ্ছে নাটক। শৈলেন set এর কাজ অবিলম্বে আরম্ভ করে দিক। সত্যেন music তৈরী করেন করুক। তাপসকে নিয়ে এসে রিহার্সাল দেখাও। Preparatory কাজগুলো শেষ হয়ে যাক। টিকিট বা কার্ডবিক্রীর ওপরে পরিপূর্ণ জোর দাও। মোটকথা Full Swing ভাই!*

আমার কাজের দিকটা খুব ভালই চলছে। সেই যে জ্বর হল, তারপর গেলাম গয়া, নালন্দা, পাওয়াপুরী, উদন্তপুরী (বিহারশরীফ) এবং রাজগীর।

কাজকর্ম ভবিষ্যতে Documentary তো পাবই। মনে হয় একলা feature film এরও chance অদূর ভবিষ্যতে মিলবে। ঠিকমত গুছিয়ে নিতে পারলে আর্থিক সংকট থেকে মোটামুটি পরিত্রাণ পাওয়া যাবে।

এবারকার যাত্রায় রাজগীরের মত আর কিছু চোখে ধরল না। আবার ৫ তারিখ নাগাদ যাবার কথা আছে ওখানে, কাজ আমার শেষ হয়নি। আমি এখানে এসে আমার team-কে split করে একদল পাঠিয়েছি মুজঃফরপুর মতিহারীর দিকে, তারা বৈশালী, নন্দনগড, লড়িয়া এইসব জায়গা ঘুরবে। আর একদল ভাগলপুর হয়ে বিক্রমশীলার ছবি তুলবে। আমি নিজে এখানে থেকে কাছে চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের fortress এবং প্রাচীন পাটলীপুত্র excavation চলছে, তারই ছবি তুলছি। এভাবে ভাগ না করলে ১৫।১৬ তারিখের আগে ফিরতে পারতাম না।

রাজগীর। আমি কোনদিন ভুলব না রাজগীরকে। গৌতমবুদ্ধ এর পথে পথে হেঁটেছেন। মহাবীর এখানে থাকতেন। নৃপতি বিম্বিসার যে পথ তৈরী করেছিলেন ৫০০ B.C.-তে সেই [···] পথ দিয়ে

হাঁটলাম। অজাতশত্রুর বিরাট জেলখানা আজও খাড়া রয়েছে। একটা জায়গায় একটা বিরাট army একদিন পার হয়ে গিয়েছিল। তাদের রথের চাকার দাগ ঘুরে গেছিল কাদার ওপরে, আজো আছে Retrified হয়ে! প্রতিটি কোনা এখানে বিচিত্র স্মৃতিতে ভরপুর। কাল স্থগিত হয়েছিল যেন এতদিন এখানে, হাওয়াতে একেবারে অন্যরকম গন্ধ। চারপাশে উঁচু পাহাড় একদিকে মাত্র ঢোকার পথ, অথচ ভেতরে অপূর্ব Valley, বাইরের গাছপালার সঙ্গে এই দশ মাইল Valleyর গাছের কোন সাদৃশ্য নেই। কি বিচিত্র গাছগুলো এখানে প্রতিটি গুল্ম-লতা পর্যন্ত ওষধি গাছ, মানে ওষুধ তৈরী হয়। এটা বোধহয় গন্ধমাদনের দোসর ভাই। প্রথম বসন্তের অপরূপ বর্ণাঢ্যতা, বিচিত্রসুন্দর রঙের সমাবেশ। মাঝখান দিয়ে বয়ে গেছে ছোট সরস্বতী নদী, প্রাচীন পুরানে বর্ণিত। মাঝেমাঝে কুণ্ড, আর প্রস্রবন, প্রত্যেকটি Hot spring, এখানে সব কুণ্ডের জল গরম, রোগ সারাবার নানা minerals মিশে আছে তাতে। মানুষ এখানে বেশী আসেনা। আসার পথ বড় কষ্টকর। পাহাড়ের নীচে বাইরের দিকে রাজগীর গাঁ, তার পাশে Hot spring এ চান করে দূর থেকে পাহাড়ের শোভা দেখেন বেশীর ভাগ যাত্রী, তাঁরা আবার প্রায়ই বাতের রোগী।

আমি এর কোনায় কোনায় ঘুরলাম। আবার যাব। আমার প্রগাঢ়তম অনুভূতির মুহূর্তগুলোর মধ্যে সবচেয়ে দামী একটি হল, সেদিন সন্ধ্যায় গৃধ্রকূটপর্বতের একেবারে শিখরে দাঁড়িয়ে থাকার সময়ে! এইখানে দেবদত্ত সিদ্ধার্থকে পাথর ছুঁড়ে মেরেছিল, এইখানে বিম্বিসার বুদ্ধের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছিল, এইখানে সেই বেদীকে জ্বালিয়ে দিয়েছিল দ্বাদশ শতাব্দীতে বক্তিয়ার খিলজী। সমস্ত কিছু চিহ্ন টাটকা হয়ে এখনও পড়ে আছে। দূরে রাজগীর—পঞ্চকের মাথার ওপরে সূর্য ডুবল, নীচে অপরূপ ওষধি-বনানী ম্লান হয়ে এল, সরস্বতী নদীটি পৈতের মত চিকচিক করে, কুণ্ডগুলোতে জল খেতে জঙ্গলের জানোয়ার বেরিয়ে এল, আমি সবাইকে পাঠিয়ে দিয়ে একা বসে রইলাম। জীবনের এই মুহূর্তগুলোতে তোমাকে সঙ্গী করতে না পারলে অর্ধেক থেকে যায় সবকিছু।

আমার সকল দুঃখ ধুয়ে যাচ্ছে ক্রমশঃ। আবার আমি পবিত্র হয়ে উঠেছি। তুমি আর এই পৃথিবী সর্বংসহা, সদাক্ষমাশীলা, উজাড় করে দেওয়ার গর্বে মহীয়সী। সন্ধ্যের আঁধার ঘন হয়ে নিবিড় হয়ে আসার মত আমাকে ঘিরে আসছে। কলম চলছে না, নতুন করে পুরোনো কথা কি আর লিখব।…ফেরার সময় হয়ে এল। ফিরেও পর্বতপ্রমাণ কাজ। কিন্তু এই কাজের ভীড়টাকে শেষ করতে পারলেই শিলং রওনা হওয়া তারপর? অপরূপ মাধুর্যে দিনসাতেক ছুটি ভোগ করা।

বেকার জীবনের ধিক্কার পেরিয়ে এমন আনন্দপুরী আমার জন্যে বিরাজ করবে সেটা [কী] আমি জানতাম? এইটুকু বলতে পারি, এই সুযোগটুকু যদি পাই, চুটিয়ে বাঁচব এবার। কি করে মানুষ হতে হয়, কি করে জীবনকে সার্থক করে তুলতে হয়, কি করে নিজেকে সম্পূর্ণ বিলিয়ে দিতে হয় দেশের মানুষের জন্যে কাজের মধ্যে, সৃষ্টির মধ্যে, তার পুরো রহস্যটা এবার জেনেছি। তাই আর মার জন্যে দুঃখ হয়না।

মার স্মৃতির সামনে মাথা নীচু করে দুদণ্ড দাঁড়িয়ে দুফোঁটা চোখের জল ফেলব দুজনে বিয়ের পরে, তারপর বোঁচকা কাঁধে করে বেরিয়ে পড়ব হাসিমুখে। সে হাসি কোনদিন মুছব না, কারণ বাঁচার রহস্য আমরা জেনে ফেলেছি। এটা আমার বিশ্বাস। এবং জ্ঞান।

দুটি অসহায় ছেলে-মেয়ে দূরে দূরে থেকে মার খেয়েছে, বাড়ি খেয়েছে, কাতরেছে, এখন হাত ধরাধরি করে তারা হাঁটবে, সুদৃঢ় পদক্ষেপ হবে। আবার মার খাবে, আবার পড়বে, আবার উঠবে, কাঁদবে, কাতরাবে, কিন্তু অসহায় আর থাকবেনা। এটা থাকবে তফাৎ, ওরা একটা social unit হয়ে গেছে।

৪.

কলকাতা

৮ই মার্চ

…কর্ণ জন্মেছিলেন সহজাত কবজকুণ্ডল নিয়ে, তুমি জন্মেছ সহজাত শুচিতা নিয়ে। ঝর্ণার ধারা যেখান দিয়ে বয়, সব ক্লেদ ধুয়ে নিয়ে যায়, তাই বলে কি সেই ধূসরতার এতটুকু তার নিজের গায়ে লাগে?

তোমাকে flatter করতে আমার বয়ে গেছে, কিন্তু আমি যে বারবার লক্ষ্য করেছি, তোমার শুভ্র চরিত্রের স্নিগ্ধতা নিয়ে বহু ক্লেদের মধ্য দিয়ে—তুমি পার হয়ে যাচ্ছ, অথচ কোন inhibition নেই, কোন সংস্কার নেই। অসীম এক আস্থা সবকিছুর ওপর আরোপ করে সব কিছুকে দায়িত্বশীল করে তোলা তোমার স্বভাবের আসল রহস্য। তুমি মানুষটি শরৎকালের মত। চিরকালের শিশু, অথচ চিরগভীর।

…প্রকৃতির প্রতি আমার মনোভাব বদলে যাচ্ছে। আগে উপলব্ধি করার দিকে, গভীর অনুভবের দিকে মন ঝুঁকত, এখন খালি আহরণ করার দিকে হয়েছে ঝোঁক। এইতো ঘুরলাম অনবদ্য প্রকৃতির মাঝখানটিতে। কিন্তু খালি জমাবার দিকে টান এবার আমার, যাতে করে জমিয়ে নিয়ে আর সবার কাছে তুলে ধরতে পারি, তাই ভেবে মৌমাছির মত পুঁজি করার চেষ্টা, জানিনা এটা ভাল কিনা। কিন্তু শুধু উপলব্ধিতে আর প্রাপ্তি নেই, একটা জিজ্ঞাসা, একটা সন্ধিৎসা আমায় খালি নুড়ি কুড়োবার মনোবৃত্তিতে পৌঁছে দিচ্ছি।

…তোমার পাইনবনের মধ্যে দিয়ে সাঁ সাঁ করে হাওয়া বয়ে যাওয়ার সঙ্গে জড়িয়ে আছে অনেক স্মৃতি, অনেক স্বাদ, অনেক অনুভূতি। …শিলং গিয়ে দু-তিনটি দিন যেন সুধায় থাকে ভরে। যেন আমার প্রথম শিলং দেখা, মায়ের শিলং দেখা, তোমার শিলং দেখা,—একেবারে অদ্ভুত আনন্দরসে ভর্তি হয়ে সারাজীবন গানের প্রথম কলির মত ঘুরে ঘুরে সামনে টেনে আনে আমার ভালবাসায় আচ্ছন্ন হয়ে যাওয়াকে।

…আজ দোল। ঘরে চুপ করে বসে আছি। এবারের দোল আমার এমন করেই গেল। এবার শুধু আমার হাতে থাকল বর্ষা। আমার সবচেয়ে প্রিয় ঋতু। তার দিকেই চেয়ে বসে থাকি।

৫.

কলকাতা
১৩. ৪. ৫৫

দিদিদের চিঠি পেয়েছি। ভীষণ খুসী। উপদেশও অনেক দিয়েছে। বড়দা বৌদি শুনলাম খুসী হয়েছেন, ক'দিন বাদে আসবেন, তখন কথা হবে।

IPTA conference এ Fraternal delegate হওয়া সম্বন্ধে তোমায় আগে লিখেছি। শচীনের সঙ্গে ও বীরেন রায়ের সঙ্গে এ ব্যাপারে দেখা করেছি ও কথা বলেছি। নির্মল ঘোষরা P.C. থেকে অনুমতি চেয়েছে, আগামীকাল আমায় জানাবে আমাকে Delegation দেওয়া হবে কিনা। কিন্তু কাজ মোটামুটি হয়ে গেছে। এমাসের শেষে আমাদের document নিয়ে D.C. আমাদের unit এর সঙ্গে বসবে ও বিস্তৃত আলোচনা করবে। IPTA-এর বর্তমান Conference সরাসরি আমাদের effect করবে না যতক্ষণ না আমাদের view points শোনা হচ্ছে। এসব দিক মোটামুটি ঠিকই আছে।

এসব ছেড়ে অন্যান্য দিক থেকে একটা হতাশ অবস্থার মধ্যে ধীরে ধীরে গিয়ে পড়ছি। *একদিকে অবজ্ঞা ও অপমান, তার থেকেও কলকাতাতে অনেকেরই ধারনা লক্ষ্মী খারাপ হয়ে গেল। বিরাট ভুলের মধ্যে গিয়ে পড়ছ তুমি। এটাই ভাবছে ওরা। ভাল দিক একটু আছে। শচীন সেনের খুব ইচ্ছে সে বরযাত্রী যায়। সে বলে তোমার লেখা আমন্ত্রণ পেলে সে যাবে। তুমি ওকে একটু লিখে দিও। এইরকম দু'একজন ছাড়া তোমাকে কেউ বুঝলনা।

আমি সৎ থাকার চেষ্টা করেছি আমার চিন্তায়, আমার লেখায়, আমার আনুগত্যে! বিয়ের পর এ জগত থেকে দূরে চলে যাব কিছু-কালের জন্য। স্তিমিত-শান্ত জীবনের প্রতি অদ্ভুত শ্রদ্ধা হচ্ছে। আমার পথ আমি জানি, জনতাকে সেবার পথ আমার সোজা, সেপথ এই ক্লেদ আর পরশ্রীকাতরতার মধ্যে দিয়ে নয়। স্তিমিত জীবনের মাঝেই সৃষ্টিশীল সে জীবন।

গত কয় বছরের বেকার সৃষ্টিহীন জীবনে যে ঋণের পুঁজি ঘাড়ে নিয়েছি, তাই আমাকে কুরে কুরে খাচ্ছে।

ভূপতিদার বাড়ি, নাগরিক, মণিবাবুর দল, বিয়ের প্রস্তুতির খরচ, সর্বস্বান্ত, আমাকে দিশেহারা করে তুলছে। নিজের চরম ছন্নছাড়াত্বের জন্য একইভাবে উদ্দাম হয়ে চলেছি। আজ পর্যন্ত আমার ব্যবহার খতিয়ে গিয়ে দেখলাম—ভূপতির বাড়ী বাদে আর সব ক্লেদ মুছে ফেলতে আমি গত কয় মাসের মধ্যেই পারতাম। চিন্তাশূন্য ব্যবহারের জন্য তারা বেড়েছে।

সৎভাবে ভবিষ্যৎ জীবন তৈরী করার চরিত্রবল আমার আছে, তাই সেটা এত অপরাধী করেনা আমায়। আবার আনন্দের স্বাদ সবকিছু পেরিয়ে আমরা পাব। জীবনটাকে সুধাময় করে তুলতে পারব।

৬.

কলকাতা

১৪.৪.৫৫

এ কয়দিন অত্যন্ত মনমরা দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে কেটেছে। কিন্তু আজ প্রথম যেন শান্ত হয়ে আসছি।

পরিষ্কার মনে হচ্ছে আজ জীবনের পরিপূর্ণ ছন্দবদলের দরকার হয়ে পড়েছে। বাঁচতে হলে productive members of society হতে হয়, এটা বুঝিইনি। জীবন গড়ব ভেবেছি, কিন্তু তার ভিত্তি যে উপার্জনক্ষমতা, সেটা একদম বুঝিনি। এর ওপর এক মারাত্মক ambition আমায় ছন্নছাড়া করে নিয়ে বেড়িয়েছে। জীবনের কাছ থেকে অনেক চাহিদা নিয়ে আমি রওয়ানা হয়েছিলাম। সর্বশ্রেষ্ঠ হব, এই ছিল দম্ভ। সবসময় স্বপ্ন দেখেছি, দেশে নয়—আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে জানা লোক হব। হায়রে, নিজের ক্ষমতাকে এত মূল্য দেওয়ার ফলে আজ এইখানে এসে দাঁড়িয়েছি। মুখে এটাকে অনেক সময় অস্বীকার করেছি, আজও হয়তো করি, কিন্তু চাপা আগুনটা এতদিন থেকেই গেছে। পথটা হিসেব না করে লক্ষ্যটাকে দেখেছি, তাই এত হোঁচট খাই। এবারে একটু পথটাকেই দেখতে হবে।

আজ বছরের শেষ দিন। বসন্তেরও শেষ। একদিন প্রচুর চিন্তা করেছি। কতকগুলো কথা ভেবেছি, তোমাকে জানাই। আমাদের অতীতের পাঁচ/ছয় বছরের সঙ্গে সব সম্পর্ক সত্যি সত্যি চুকিয়ে দিতে হবে। যা কিছু আমার টাকার জের, তাদের দায়িত্ব থেকে এবার আমি মুক্ত করব নিজেকে। নাগরিক সম্বন্ধে আর চিন্তাই করবনা। করে কোন লাভ নেই। সবার সর্বনাশ হয়েছে। আমারও কম হয়নি—বিরাট বোকামি করেছি, কিন্তু একা আমি নয়।

মাসিক একটা আয়ের সংস্থান করা প্রথম কর্তব্য। নইলে জীবনে স্নিগ্ধতা আসবেনা। দ্বিতীয় কর্তব্য আগামীবছর এম. এর. জন্য প্রস্তুত

হওয়া। তোমার short hand ইত্যাদিও আরম্ভ করবে কিনা ভেবে দেখো। Group Theatre সম্বন্ধে চিন্তা কোরনা, 'হ য ব র ল' Dramatise অর্ধেকের বেশী করে ফেলেছি, মে মাসের মধ্যে ওটা তৈরী হয়ে যাবে।

পার্টির দিকটি ভাবিনি। তেমন অবস্থার উদ্ভব হলে ভাবব, জনতার দিকটা ভেবেছি। আমার স্বাভাবিক ক্ষমতা ছিল লেখাতেই। তোমার মধ্যেও চাপা রয়েছে সে ক্ষমতা। এসো আমরা লেখাটাকে আঁকড়ে ধরি। লেখাকে develop করব, নাটক-উপন্যাস-গল্প, প্রবন্ধ, তার থেকে অর্থোপার্জনটা এখনই কিছু বিশেষ হবেনা, দুটো বছর লাগবে।

সব কিছুর ভিত্তি কিন্তু একটি বা দুটি চাকরী সংগ্রহ। তারপর দুবছর ধরে সাহিত্য-মঞ্চ-ফিল্মের জন্যে দুজনের প্রস্তুতি, আর তার সঙ্গে পরীক্ষা দিয়ে short hand শিখে উপায়ক্ষম হওয়া। আমিও short hand শিখতে রাজী আছি। ১৯৪৬/৪৭ থেকে আমাদের জীবন বাঁকাপথে চলে যায়। হতাশা আর চোরাবালি, অবসাদ আর আশা-ভঙ্গ,—১৯৫৫-এর এই মাঝামাঝিতে এসে একটা চরম অবস্থা গ্রহণ করেছে। এসো আমরা মাঝের কয়টা বছরের পিছিয়ে পড়াকে দুহাতে মুছে ফেলে ভুলে গিয়ে এগোই ১৯৫৭/৫৮এর দিকে। জীবনের শ্রেষ্ঠ দশটা বছর আমাদের ভুল করতে আর ভুল ভাঙ্গতে যাক। কিন্তু ভবিষ্যৎ জীবনটার ভিত্তি হোক দৃঢ়।

বছরের শেষ চিন্তাগুলো আমার এই ধরণেরই, ভাল করে আরো ভাব, আর আমাকে জানাও, তোমার চিন্তার ধারা থেকে আমায় বিচ্ছিন্ন রেখোনা। তোমার কথা ভাবলেই আমার নিজের সরল তাজা শৈশবের স্মৃতি সব মনে পড়ে, আর সৌভাগ্যের দৃপ্ততা আসে মনে।

আমার বড়দা হঠাৎ এলেন। তাঁর সঙ্গে কথা বলতে হবে এখন। দিদির বড় মেয়ে টুসকিও কাল বোম্বে থেকে এসেছে, এখনই এল ওর বরের সঙ্গে, ভীষণ খুসী ওরা সবাই। বড়দা—খুকু (মহাশ্বেতা), গীতা, সেজবৌদি, মা সবার কাছ থেকে তোমার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা শুনেছেন ইতিমধ্যেই। টুসকির ইতিমধ্যেই ভীষণ অবাক লাগছে আমাকে at

all কোন মেয়ের ভাল লাগে কি করে—আমার নোংরা পা, বিড়ী ও হাঁটু পর্যন্ত কাপড় তুলে বসাসমেত। ওর মন খারাপ হয়ে গেছে তোমার ভবিষ্যৎ ভেবে। আমি তোমার মোটেই উপযুক্ত নই, মিছিমিছি তোমাকে ডোবাচ্ছি। 'লক্ষ্মী' মহিলাটি জলে পড়লেন। এই হচ্ছে তার সুচিন্তিত অভিমত, বাড়ীর সবার কথা থেকে বোঝা গেল তোমাকে বিয়ে করতে পেরে আমি ধন্য। আমার অবস্থা এই হুল্লোড়ে পড়ে শোচনীয়, নিজেকে অপরাধী ভাবতে আরম্ভ করেছি।

বড়দা বোধহয় টাকার সমস্যার কিছু সমধান করবেন ভাবছেন। অস্পষ্ট দুশ্চিন্তায় আর মন খারাপ করবনা। আমরা বাঁচার জন্যে জন্মেছি। আমরা জীবনকে সার্থক করবই মিলিত কাজের মধ্যে দিয়ে। সামনে এখনও বহু বছর পড়ে আছে, ভবিষ্যতের মধ্যে নিজেদের প্রসারিত করে দিতে হবে। এইটুকুই এই বছরের শিক্ষা।

তোমাকে এই চিঠি লেখার মধ্যে দিয়ে আমি অনেক শক্ত হতে পেরেছি। তুমিও আমায় লেখ।

৭.

১৯. ৪. ৫৫

তোমার বেয়ারিং চিঠি দুখানা গাঁটগচ্চা দিয়ে কাল নিলাম। শচীনদার চিঠি দিতে আজ সকালে গিয়েছিলাম।

বরযাত্রী সম্বন্ধে ভাবছি—বড়দা বা সেজদা, ফন্তু, শচীন, কেষ্ট ভূপতিদা।

সাতপাক ইত্যাদি সম্বন্ধে তুমি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে কি কি শাস্তির মধ্যে দিয়ে পার হতে হবে, সেটা জেনে নিও ও আমাকে জানিও।

তোমার প্রশংসায় এখানে তো সবাই পঞ্চমুখ, বিশেষ করে খুকু leading part নিচ্ছে।

IPTA conference এর খবর দেই। শেষ অবধি নির্মল আমাকে কার্ড দেয়নি।

Conference সম্পূর্ণ fail করেছে। Report review পুরোটা rejected হয়েছে। constitution ছয়মাসের জন্য deferred হয়ে গেছে। show-এর দিকটা অত্যন্ত বাজে হয়েছে, বাইরের সংগঠন ও হেমাঙ্গদাদের আসাম troup মানরক্ষা করেছে।

শচীনদার সঙ্গে কথা বলে বুঝতে পারলাম। Party D.C. ইত্যাদিদের IPTA সম্বন্ধে ধারণা একেবারেই ভাল নেই। Conference এর achievement দেখে ও নির্মলদের জ্ঞানের পরিধি দেখে ওঁরা অত্যন্ত হতাশ। আমাদের সঙ্গে কথা বলতে ওঁরা বেশ eager. শচীনদার L.C. কেও সেই একই সঙ্গে আমাদের document-এর ওপর বসাতে চান। আশা করছি ২৫/২৬ তারিখে D.C. ও L.C. একসঙ্গে আমাদের document সম্বন্ধে আলোচনার জন্যে আমাদের সঙ্গে বসবে ও IPTA-র অন্যান্য unit-কেও সেই আলোচনায় ডাকবে। তার ওপরে কাল রাতে উৎপলের সঙ্গে অনেক কথা হল, ও আমার সঙ্গে এই document নিয়ে বসেছে এবং আমি party meetingএ তাকে ডাকানোর জন্যে D.C. ও L.C.-কে অনুরোধ করছি। হয়তো ডাকানো যাবে। ওর সম্বন্ধে সবদিক থেকেই এখন party অত্যন্ত খুসী। উৎপল একবার সুযোগ পেলেই নির্মলদের সঙ্গে সঙ্গে expose করবেই। অর্থাৎ এখন এইসব মিলিয়ে partyকে খানিকটা নাড়া দেওয়া বোধহয় সম্ভব হবে।

Group Theatre-এ 'হযবরল' Script করে কাল casting করব। বুলবুল-সনৎ-কেষ্ট ইত্যাদি অত্যন্ত উৎসাহিত। গীতা ঘটক রিহার্সালে আসছে। 'সাঁকো'তে ওকে মা করাচ্ছি। 'হযবরল'তে ও অত্যন্ত কাজে আসবে।

এ চিঠিতে খালি কাজের কথাই লিখলাম।···বাইরে বাইরে ঘুরে এসে তোমার কাছে খানিক থাকতে পেলে কি স্নিগ্ধতাই না লাগত।

হে কালোরাতের রাণী, তুমি থাক তোমার তারা আর আকাশ আর রাত আর ঝড় নিয়ে—তোমার আর কি?

৮.

২২.৪.৫৫

অরোরার কাজটার আশা এখনও সুদূরপরাহত নয়, হয়তো আর একটা Documentary এর মধ্যেই করতে পাব। এ ক'দিন এসব নিয়ে ভেবোনা। দুম্‌দাম্ কিছু করতে বারন করেছ, এই কথাটা বড় প্রাণে ধরেছে। সত্যি, ওমনি করেই আমি বারবার জালে জড়িয়ে পড়ি। এবার আর পড়ব না।

তোমার বাবার চিঠি না পেলে কাকে নেব, আর কাকে নেব না, ঠিক করতে পারছি না। এদিকে শৈলেন ছলছল চোখ করে ঘুরছে, অমলেশেরও প্রায় সেই দশা। কেষ্ট ডাক ছেড়ে কাঁদবে নিয়ে না গেলে। শচীন সেন prepare করছে যাবার জন্যে। নন্দ বাড়ীতে খুব সর্দারী করছে। বিজন ভট্টাচার্যও নিজের পয়সা খরচ করেও যেতে প্রস্তুত। কি যে করি! দাদারা এসব বিষয়ে সব সিদ্ধান্তের ভার আমার ওপর চাপিয়ে দিয়েছে।

তোমাকে লিখেছিলাম, short hand তোমার সঙ্গে আমিও শিখব। এম.এ.ও একসঙ্গে পড়ব। এখনও ইচ্ছে তাই। একা একা আর ধৈর্য নেই।

Group Theatreএ 'হযবরল' চলছে। গীতা একটা asset. অপূর্ব অভিনয়ক্ষমতা আছে মেয়ের। ওর দুই বোনও ওমাস থেকে এখানে থাকবে। দুটিকেই কাজে লাগিয়ে নেব।

তুমি এলে ভাল করে planning করতে হবে।

তোমার চিঠিতে ওখানকার প্রাকৃতিক বর্ণনা দাওনা কেন? আরো বড়ো করে দাও। তাই নিয়ে ঝগড়া করি বটে, কিন্তু খুব খারাপ লাগে না পড়তে। আর তোমার মনের ছোঁয়া তার থেকেই পাই। আশ্চর্য জানো, সাংসারিক হিসেবের আর দৈনন্দিন চিন্তার কথা যখন লেখ তুমি, তখন জমেনা। জমে যখনই তুমি অবান্তর কথায় চলে যাও। তোমার মনটা তখন বেরিয়ে আসতে থাকে। তোমার এই Depth-কে আরো বাড়াতে হবে, নইলে মুক্তিকামী মানুষদের পুরো কাজে তুমি আসবে না।

কলকাতার মধ্যেই শান্তির নীড় গড়া যায়, এ বিষয়ে আমি একমত। তার জন্য দরকার economic stability. সেটা যতদিন না গড়া যায়, ততদিন কিন্তু বড় কম হবে।

৯.

২৬.৪.৫৫

হেমাঙ্গদার সঙ্গে আগামীকাল সকালে engagement. পরে জানাচ্ছি কি কথা হল। গোলাম কুদ্দুসের সঙ্গেও একটা engagement

হয়েছে। জানিনা ও কি বলবে। সেটাও পরশু জানাব। পার্টির আলোচনাটা নাকি তুমি না এলে ভাল জমবে না, তাই D. C. র বীরেন রায় ওটা যে মাসে রেখেছে। তোমার প্রতি সবাইর টান ও শ্রদ্ধাও দেখি।

তোমার চিঠিগুলো বিরাট source of inspiration. ওগুলো বড়ো সাহায্য করছে আমায়।

শ্বশুরবাড়ী এসে হাঁচিকাশীর বদনাম হবে এই ভয়ে নাই বা মারা গেলে। হাঁচি-কাশী সমেত গ্রহণ যখন করে ফেলেছি, যখন মাথাধরার কারণে কোন Court of lawই Divorce admit করবে না, তখন অগত্যা তাকে হাঁচিসমেতই নিতে হবে। কি আর করি বল।

একটু কাজের কথা শোন। কোথাও কিচ্ছু নেই, হঠাৎ সলিল চৌধুরী বোম্বে থেকে এক টেলিগ্রাম করেছে, Filmistan Job allmost fixed. Passage Hotel expense free. Start immediately! একবছর আগে একটা casual কথা হয়েছিল, তারপর হুম্ করে এই তার। ফিল্মিস্তান ভারতের সবচেয়ে বড় প্রতিষ্ঠান আজ। হাতে একটা পয়সা নেই যে তার করি। তারপর এখন তার করেছি, যদি তুমি প্লেনের ভাড়া পাঠাও তার করে, তবে ২ তারিখে গিয়ে ৫ তারিখের মধ্যে কলকাতায় ফিরতে পারি। Contract করে এসে fly করে শিলং গিয়ে বিয়ে করে আবার ১৫ তারিখে নাগাদ join করতে পারি। তোমাকে সঙ্গে নিয়ে মাসখানেক গিয়ে বম্বেতে থেকে আসতে পারি। Contract হলে মোটা টাকা এখনই পাব, সংসার পাতার দুশ্চিন্তা থাকবে না, সব ধার মায় ভূপতির বাড়ী পর্যন্ত পরিষ্কার হয়ে যাবে। জীবনে আর কোন ক্লেদ কোথায় থাকবে না। নতুন অধ্যায় শুরু হবে জীবনে। একটি strokeএ অতীতকে দুহাতে মুছে ফেলা যাবে।

সলিলের টাকা পেলে খানিকটা ভরসা হবে। চাকরীটা হবে না, এই ধরেই এখন চলি। সেটা ধরেই বাড়ীতেও সবাই উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছে। বিশেষ করে রাঙ্গাদা। 'এ বৌটা সাক্ষাৎ লক্ষ্মী, সে আসার আগেই এমন প্রস্তাব আসা বিরাট শুভের চিহ্ন।' মা বলছে 'কল্যাণী বরদায়িনী আসছে ঘরে।' স্কোয়াডে বুলবুলরাও লাফাচ্ছে তাই বলে। শৈলেন নাচছে।

বাড়ীতে আর সব ভালই লাগছে। খালি 'সোম'টা ভাল লাগছে না। সেটা হচ্ছে 'এমন বাঁদরের গলায় শেষে মুক্তোর মালা পড়ল, অশেষ দুর্গতি করে ছাড়বে মেয়েটার'।

উদ্বেগ আর আশংকা, Security নেই তো জীবনে কোন! যা ধারণ করে থাকে তাই যদি ধর্ম হয়। তবে তুমি আমার ধর্ম। ভালবাসতে হলে চাই Classical approach, নীরবে ভালবাসার সাধনা করা,—সে করা কি কোনোদিন হয়ে উঠবে নিকট ভবিষ্যতে!

'নাগরিক'-এ একটা Dialogue লিখেছিলাম। নায়ক নায়িকাকে বলছে 'ঝাঁ-ঝাঁ রোদ্দুরে কালো দীঘিতে অবগাহন করার মত শান্তি তোমার সান্নিধ্যে।' Scene টা এখন বই-এ নেই। যখন লিখেছিলাম কল্পনায় কি তুমি ছিলে?—না। কারণ সে কল্পনা যে বাস্তবে এমন Literal truth হয়ে উঠবে, প্রতিটি পদক্ষেপে সত্তাকে নাড়া দেবে, যে অনুভূতি জাগাবে, তা বুঝিনি সেদিন। Communistদের Communism চাওয়ার মত আর কি! কল্পনায় সত্যকে পেয়েছিলাম সেদিন। আজ বাস্তবে পাচ্ছি।

১০.

৫. ৫. ৫৫

বিয়েটা Registration করে না করাটা জীবনের বিরাট ভুলতো নয়ই। ওটা ভুলই নয়। প্রথমতঃ এ পোড়া দেশে আইনতঃ একবর্ণে Civil marriage সিদ্ধ নয় (পরে হতে পারে), দ্বিতীয়ত সাতপাক (দশম শতাব্দী থেকে ওটা Romantically প্রচলিত, জান!)

সব সত্ত্বেও মন আনন্দে ভরে উঠেছিল। ওদিককার ওসব খুঁটিনাটি চিন্তা, এদিককার এক চরম পর্যায়ের লড়াই, এক এক করে পয়সা সংগ্রহ আর ব্যবস্থা করা—এসব ক্লেদ পেরিয়ে সোনালী আলোর মত বিয়েটা আমার কাছে প্রতিভাত হচ্ছিল। তার অবাঞ্ছনীয় দিকগুলোও তাদের সুন্দর, মানবীয়, মমতাময়, কাব্যময় অংশ নিয়ে সামনে এসে দাঁড়াচ্ছিল। মনগড়া লাগছিল ঘটনাটিকে।

একটি ছেলে আর একটি মেয়ের মেলাটা মানবিক প্রকাশের সৌধ শিখরের সামগ্রী বলে, আর সব কিছুকে ভাসিয়ে নিয়ে যায়।

এমন ঘটনা বিরাট সংঘটন, জগত সংসারটা ধনী হয়ে ওঠে এতে। এবার ছেলেটি আমি, মেয়েটি তুমি, আমার ফরমাস দেওয়া চাঁদটা ঝোলানো থাকবে, অর্ডারমাফিক হাওয়াটা বাঁদরামো করবে, মস্তরের তুক এক নয়া শিলং-এর রাত জন্মাবে, প্রকৃতি আমার সঙ্গে ষড়যন্ত্র করে উদ্দাম, চপল হয়ে উঠবে, এমনি একটা উপলব্ধি মনের কোণে সঞ্চারিত হচ্ছিল। স্তিমিত ধ্যানমগ্ন হরগৌরীর মিলনে একটা মহত্ত্ব আছে, তাই বলে হাসি দুষ্টুমি ঠাট্টা উচ্ছ্বলতা হৈ হৈ—হাট বসিয়ে মেলার কি কোন মূল্য নেই? (কুমারসম্ভব পড়াব এবার তোমায়,) রাবড়ী আমি সাটাতে খুব ভালবাসি, তাই বলে কোর্মা খাব না? অর্ডার দেওয়াটা হাতে ছিল না, আপাততঃ কোর্মাই ওড়াই। যখন রাবড়ী জুটল না একটা বোঁকা স্বামী জোটানোর মাশুল হিসেবে, তখন পাতের কোর্মাটা কুইনিন হয়ে যাবে গো আমার Das Kapital?

এ ধরণের বিয়ের একটা মাদকতা আছে, দিদিমাদের রসিকতার একটা ভারী বাঙ্গালী দিক আছে, কৌতূহলী শালী-শালাজদের হরিণী নয়নের কটাক্ষের নেশা আছে—তাই ভোগ করব ভেবেছিলাম। এরপরতো তুমিই একমাত্র আমার। তার ভাল দিক হচ্ছে, যখন যেমন রূপে চাইব, পাব। খারাপ হচ্ছে, আরতো Sir মুখ বদলানো যাবে না, চোখে হাত দিয়ে আড়াল ঢেকে দেবে। (সেখানে খাঁটি বাঙ্গালী তুমি, আপত্তি করে লাভ নেই)। উৎফুল্ল হয়ে উঠেছিলাম সাত-সতেরো ভেবে।

বিপ্লবের খাতিরে আমাদের আনন্দিত হওয়া উচিত ছিল। দুটো দেশপাগলা ছেলেমেয়ে প্রচণ্ড য়্যাডভেঞ্চার করতে বেরোচ্ছে, ভেবে দেখেছ? একেবারে অনভিজ্ঞ, তার ওপর দুটোই খামতিতে বোঝাই। পড়বে এবং উঠবে, উঠবে এবং পড়বে, এবং এরই মাঝ দিয়ে নিজেদের আদর্শ মানুষের যে ছবি মনে আছে, তাকে নিজেদের মাধ্যমে মূর্ত করে তুলবে। যা ছিল আমার, হারিয়ে গিয়েছিল, আবার তোমাকে পাওয়ার মধ্যে দিয়ে যা ফিরে আসবে, সেই হাসি হচ্ছে এ পথের আলো। জীবনের সঙ্গী আমরা, সেই স্বাস্থ্য যেখানে, জীবন সেখানে। হাসি যেখানে, স্বাস্থ্য সেখানে। শিশু হাসে, যোদ্ধা হাসে। Matter of fact হয়েও। Practical aspect of lifeকে সমাদর করেও, গম্ভীর

দর্শনবোধের গভীরে অনুপ্রবিষ্ট হয়েও হাসি আরো বেড়ে যায়। এমনকি Das Kapitalও তাকে রুখতে পারে না, ছট্‌কে বেরিয়ে আসে।

সেদিন যারা জমবে চারপাশে, তারা না জমলেও পারত। যখন জমেইছে, তখন জমুক। জমার ভিত্তি হচ্ছে আনন্দ, আর আমরাই তার Object, বড় পবিত্র করে তুলতে পারি ও দিনটাকে।

ভবিষ্যৎ জীবনের কথা ভবিষ্যতে হবে। ভেবেছিলাম, বাসরঘরে কথা যেখানে স্তম্ভিত হয়ে যায়, সেখানে পৌঁছোব গিয়ে, দেখছি ব্যাখ্যা করতে করতেই রাত কাবার হবে। সমস্ত অতীতের দোষ খতিয়ে দেখার যে Programme আপনি দিয়েছেন, সেটাই follow করব অগত্যা। Criticism-Self-Criticism এই পূর্ণিমার পরের রাতটা যাক। আরতো জীবনে সময় পাওয়া যাবে না, এদিন না হলে যে মহাভারত অশুদ্ধ।

তবে তাই হোক। কি পাল্লায় যে পড়েছি, ক'দিন আর বাঁচব কে জানে।

এ চিঠি যখন পাবে, তখন বোধহয় আমিও শিলং-এ।

দগ্ধভাল

ঋত্বিক

৩.

বোম্বে গোরেগাঁও। ফিল্মিস্তান ষ্টুডিয়োর চাকরী। গোরেগাঁওতে ফিল্মিস্তান ষ্টুডিয়োর কাছেই একটা ছোট্ট বাসায় আমরা ছিলাম। বাসাটি পাবার আগে ছিলাম ঋষিদার (ঋষিকেশ মুখার্জী) বাড়ীতে আন্ধেরীতে। ঋষিদা আমাদের জন্য খুব করেছিলেন। কাছেই ছিল বিমল রায়ের স্টুডিয়ো। দেবদাসের স্যুটিং দেখতে যেতাম।

সলিলদার (সলিল চৌধুরী) বাসাও ছিল আন্ধেরীতেই। গোরেগাঁওতে আমি যাই উমাপ্রসাদ মৈত্রকে নিয়ে। পরে আসে কেষ্ট মুখার্জী। কাজের চেষ্টায় কেষ্ট এক বছরের বেশী আমাদের কাছে ছিল।

গোরেগাঁওর বাসার কথা মনে হলেই মনে পড়ে বোম্বের বর্ষার কথা। জুন থেকে সেপ্টেম্বর একনাগাড়ে বৃষ্টি। ঝড়জল কোন বৈচিত্র্য নেই। বিরামহীন জলপড়া।

এরমধ্যেই চাকরী, বিসর্জনের রিহার্সাল ও অন্যান্য লেখা চলছিল। চাকরী, নাটকের রিহার্সাল ও লেখা নিয়ে ঠাসবুনুন দিনগুলোর মধ্যে ফাঁক ছিল না একটুও। কিন্তু শিল্পীমন বরাবরই ফিরে যেতে চেয়েছে কলকাতায় শিল্পসৃষ্টির পরিবেশে। আবারও উল্লেখ করছি চিঠির—কারণ ওঁর চিন্তাধারার প্রকাশ আছে এতে।

১.

৩০.৬.৫৫.

বোম্বে

আমি নির্বিঘ্নে এসে পৌছেছি। পথে দেখলাম সারা ভারতবর্ষ জুড়ে বৃষ্টি নেমেছে। যে রায়গড় কদিন আগে অমন ছিল, সেখানে এখন অবিশ্রান্ত বর্ষণ। সারাপথে একবার সূর্য দেখিনি। বুঝতেই পারছ, পথে কষ্ট এবার অনেক কম ছিল। বর্ষাকালের আগমনটা কলকাতায় বসে ঠিক অনুভবে আসেনি, পথে বেরিয়ে অনুভব করলাম।

এখানে এসে সলিলের কাছে জানলাম, মুখার্জি আমার কলকাতায় দেখা না করায় মনক্ষুণ্ণ হয়েছে,—বলেছে, নতুন বিয়ে করার ফলে আগামী একবছর নাকি আমি অকেজো থাকব, ও নাকি চাকরী দিয়ে ভুল করেছে। যাই হোক, কালই আমি দেখা করি এবং আজেবাজে বলে লিখিতভাবে কাজে join করি। কিন্তু কাজের যা ধারা দেখছি, অত্যন্ত খারাপ লাগছে। আসলে কোন কাজই নেই, মিছিমিছি আজেবাজে লিখতে হবে এখন, আর দশটা-পাঁচটা গিয়ে বসে থাকতে হবে। মুখার্জির বিরূপতা ঠেলে খুব এগোনোও আগামী দু-একমাসে যাবে না।

দাঁতে দাঁত চেপে শুধু পয়সার জন্যে এখন চেষ্টা করা। কতদূর সফল হবে জানি না। আর কিছু এখানে সম্ভব হবে না। ভাল কাজ করা, নিজের ক্ষমতা প্রকাশ করা বা সত্যিকারের খ্যাতির দিকে এগোনো, এসব সুদূর পরাহত মনে হচ্ছে। শুধুই মাসিক আয়ের পথ দেখা।

দেখো লক্ষ্মী, এ জীবন আমাদের নয়। পয়সার জন্যে করে যাওয়া, আগে করিনি। এখন করতে ঘেন্না হচ্ছে। যে করে হোক, হাজার-খানেক টাকার দেনা শোধ করতে পারলে, আর ভূপতিকে বছরখানেক মাসিক একশো করে দিতে পারলে আমি এসব ছেড়ে দেব। এ হবে না। আশেপাশে তো দেখছি, মাসে ৩।৪ হাজার টাকা আয় করেও শান্তি নেই কারো। অথচ নিজের মনের মত কাজ করে একপয়সাও না কামিয়ে আমি শান্তি পেয়েছি আগে।

যা ঠিক করেছি শোনো। এই ফিল্মিস্তানের চাকরীটা কতদিন থাকবে জানি না। যতদিন থাকে, এটাকে অবলম্বন করে একটা বাঁধা আয় হবে যত কমই হোক, ততদিন আমি সময়টাকে সত্যিকারের কাজ করার দিকে ব্যবহার করব।

প্রথমতঃ 'জ্বালা'টা শীগগির শেষ করে পাঠাব। তারপর, একটা নতুন One act play-এর প্লট ভেবেছি, সেটা লিখে ফেলব। আর তারপর একটা উপন্যাস মনে মনে ছক করছি, এবার আমি লিখতে বসবই। এইসব কাজের ওপরেই আমার জীবন নির্ভর করছে, ফিল্মে Serious কিছু করা যাবে, করতে দেবে না। আগামী তিনমাস এই সবগুলোই করব।

Group Theatre-এর ব্যাপার কি হবে, বুঝতে পারছি না। তবে তুমি আঁকড়ে রাখার চেষ্টা কোর সবাইকে খবর দিয়ে। পার্টির গণ্ডগোল যে কোনোদিকে মোড় নিতে পারে। সমস্যা উঠবেই। তাতে করে নিজেদের কাজ বন্ধ কোর না। কিন্তু পার্টির ব্যাপারটিও বেশীদিন এভাবে চলবে না। একটা ফয়সালা তোমাদের করতেই হবে।

এসবগুলো ছাড়াও পয়সা উপার্জনের চেষ্টা তোমায় করতে হবে। আমি কলকাতা ছাড়তে চাই না। ওখানেই যদি মাসে ৩।৪শ' টাকা দুজনে মিলে আয় করতে পারি তাহলেই আমার স্বর্গসুখ পাওয়া হয়। ফিল্মে নামকরা আর উন্নতি করার জন্যে যে দাম আমায় এখানে দিতে হবে, তা দিতে আমি চাই না। কলকাতায় লিখে বা অন্য কিছু করে বা Documentary করে যদি মাসে ঐ টাকা পাই, আর দু-তিন বছর বাদে বাদে একটা ছবি করতে পাই, তাহলে একেবারে Ideal হয়। নিজেদের জীবনটাকে গুছিয়ে তাহলে Plan করতে পারি, বাঁচতে পারি।

তোমাকে আমি পেলাম। ভাল করে পাবার আগেই এইসব জঞ্জাল শুরু হয়ে গেল। যদি সুযোগ পাই, তাহলে আগামী একবছর আমি এই জঞ্জাল সাফ করব এই বম্বেতে বসে, আর তুমি প্রস্তুত করবে নিজেকে। অন্ততঃ এই বছরটা আমি দেখবই। আর সুযোগ খুঁজব কি করে কলকাতায় কিছু আয়ের পথ করা যায়। একবার করতে পারলে এখানে আর একদিনও থাকা নয়।

২.

বোম্বে
৫.৭.৫৫

বিমলদা আমার গল্পটা এখনই কিনে নেবেন এবং বিমল রায় প্রোডাকসন থেকে আগামী ছবি করবেন জানা গেল। আজ থেকে বসতে বলেছেন। ৫।৬ দিনের মধ্যে শ'পাঁচেক টাকা advance দেবেন।

গোড়েগাঁওতে (আমাদের ষ্টুডিও যেখানে) একটি ছোট্ট বাড়ী পেয়েছি। যদি বিমলদার টাকা পাই, তাহলে নিয়ে নেব। বিমলদার

টাকা এখনও হাতে আসেনি, আর ফিল্ম লাইনের কথার কিছুই স্থিরতা নেই। তবু এবারে মনে হচ্ছে পেয়ে যাব। সমস্ত যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পাব এবার যদি টাকাটা পাই। তাই না পাওয়া পর্যন্ত বড় ভয় করছে।

ফিল্মিস্তানের জন্যে একটা গল্প ভেবেছি। বড় ভাল লাগছে নিজের। একজন atomic scientist রিসার্চ করতে করতে ঘুমিয়ে পড়ে ভবিষ্যৎ পৃথিবীর স্বপ্ন দেখছে, যখন Universal Scientific community হয়ে গেছে। যথারীতি নাচ-গান রোমান্সের অবকাশ রাখতেই হবে, জমাট নাট্যকল্পনাও করতেই হবে, বোম্বে ফিল্মের সব উপাদানই ঢোকাতে হবে। তবু scientific advancement আর Social structure আর Psychological evolutionটা সম্পূর্ণ বজায় রাখা যাবে অথচ মজার গল্প হবে। পুজোর সময় কলকাতায় গিয়ে ডাঃ মেঘনাদ সাহার কাছ থেকে সাহায্য চাইব। এখানেও Nuclear Physics Laboratory-এর কর্তাদের সাহায্যে গ্রহণ করা হবে। গল্পটা শশধর মুখার্জী পরশু শুনতে চায়, যদি পছন্দ করে, তাহলে ভাল কিছু করার দুরাশা করা যাবে।

এ সমস্ত কিছুতেই আমার অত্যন্ত একাগ্রতা দরকার। কিন্তু তোমার খবর না পেয়ে মন বড় অশান্ত হয়ে থাকে। সপ্তাহে অন্তত চারটে চিঠি তোমার কাছ থেকে আসা উচিৎ। আমার জীবনের আনন্দের উৎস হচ্ছ তুমি।

৩.

বোম্বে

১১.৭.৫৫

...অনেকদিন আগে একটা মুখের কথা লিখেছিলাম মনে পড়ছে। শ্যামলা রঙের একটা মুখ। পেছনে কালো জলের ছলকানো, তারই পটভূমিতে সে মুখ।

আজ গানের প্রথম কলির মত সে মুখটা ঘুরে ঘুরে সামনে আসছে। জীবন-গানের প্রথম কলি। তাই আবার সে মুখের কথা লিখলাম। জীবনময় লিখব।

'সঞ্চয়িতা'র প্রথম দিকের 'নিষ্ফল কামনা' কবিতাটা পড়। বুড়ো আগেভাগে সকলের মনের ভাব লিখে গেছে। আমারও।

...আর একটা জিনিস গত পুজো থেকে সত্যিই হয়ে গিয়েছিল। একটার পর একটা ব্যর্থতা, আশাভঙ্গ, বেকারী, অর্থাভাব,—এসবের ওপরে ঘৃণ্য পরপর রাজনৈতিক আক্রমণ আমার স্বাস্থ্য ভেতরে ভেতরে একদম ভেঙ্গে দিয়েছিল। শুধু মনের জোরে চলেছি, নিজেই জানতাম না। একজন পর্যটক যেমন করে মরুভূমির ভেতরে জল না পেয়েও একগুঁয়ে হয়ে চলে মরুদ্যানে পৌঁছয়ই, কিন্তু স্বাস্থ্য চুরমার হয়ে যায়। আমার ভেতরে প্রাণশক্তি ফুরিয়ে গেছে, জান! আজ ডাক্তার বলেছে।

ডাক্তারের মতে আমার এখন বাঁধা জীবন দরকার। আগের চিঠিতে তোমাকে লিখেছি, নিমোনিয়া হয়েছিল। এখন সেরেছে, খুব দুর্বলতা ছাড়া আর কিছু নেই। এখন রুটিন বাঁধা খাওয়া শোওয়া, টনিক খাওয়া, এইভাবে চললে স্বাস্থ্যটা আবার দাঁড়িয়ে যাবে।

তোমাকে না পেলে আমি চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যেতাম। আর্থিক-অনটন সাময়িক বলে এখন আমার মনে হয়। হয়তো একে কাটিয়ে সাধারণ জীবনযাপনের উপযুক্ত আয় আমি করতে পারব। কিন্তু সেই সঙ্গে আর সবদিক ফলেফুলে ভরে তুলতে হবে।

৪.

বোম্বে

১০.১১.৫৫

...হঠাৎ আজ সেজদার চিঠি পেলাম Central Government থেকে 'নাগরিক' State Award দেবার জন্যে মনোনীত হয়েছে। এতবড় সম্মান হঠাৎ এসে হাজির। এত দুঃখের পরে আজ কি সত্যিই কপালে জয়তিলক আঁকা হবে?

এ যদি হয়, তাহলে তোমার আমার জীবনের অনেক জটিলতা কেটে যাবে। সংগ্রামের স্তর হয়ে যাবে ভিন্ন, অন্ততঃ প্রতিষ্ঠা ও সম্মান অনেক বেশী হয়ে যাবে। এরই মধ্যে Filmistan-এ এর ফল ফলতে আরম্ভ করেছে। ভারতবর্ষের সর্বশ্রেষ্ঠ সম্মান, নিজের ক্ষেত্রে প্রচুর প্রতিপত্তি, এই হবে এর ফল।

ক্রমশঃই সংস্কার এসে যাচ্ছে তোমার সম্বন্ধে, তুমি কি সত্যিই লক্ষ্মী?

৭৫.

২৪.১১.৫৫

'নাগরিক' এর application দিতে দেরী হয়ে গিয়েছিল। তবু ওরা accept করেছে বলে সেজদা জানিয়েছে। competition-এর ফলাফল এখনও পাইনি।

State award পাওয়া এবং মুক্তি পাওয়া সম্বন্ধে এখনও কিছুরই স্থিরত্ব নেই। দিন পনেরোর মধ্যেই যা হবার তা হবে।

আনন্দ, এইটুকুই, ছবিটা স্বীকৃতি পেয়েছে। এর বেশী এখন না ভাবাই ভাল।

ইতিমধ্যেই চৌধুরী ইনিয়েবিনিয়ে একটা চিঠি দিয়েছিল, তার জবাবে বেশ কিছু লিখে দেওয়া গেছে। মনে হয়, এবার একটা শেষ চেষ্টা ও করবে। সেজদাকেও লিখেছি।

পার্টির উত্তর দিতে বড় দেরী হয়ে গেল। কিছুতেই এর আগে আর গুছিয়ে উঠতে পারলাম না। গতকাল type করে এক রাম চিঠি দিয়েছি। তবে আশা করা বৃথা, এ সম্বন্ধে আর ভাবছি না এখনকার মত।

এইমাত্র বুলগানিন ও ক্রুশ্চেভ ষ্টুডিওর সামনে দিয়ে আরে কলোনীতে গেলেন।

এই পচা কমার্শিয়াল শহরটার মধ্যে প্রাণ জেগেছে দেখা গেল দুদিন আগে সংযুক্ত মহারাষ্ট্র আন্দোলনে। মনে হচ্ছিল, কলকাতায় আছি। আবার তারই প্রকাশ সোভিয়েত নেতাদের স্বতঃস্ফূর্ত সম্বর্ধনাতে। সোভিয়েতকে এরা এত ভালবাসে! আর সত্যিকারের নেতা, সত্যিকারের খাঁটি অপূর্ব মানুষ মনে হল বিশেষ করে ক্রুশ্চেভকে। এদেশে কম্যুনিষ্ট বিপ্লব যে কত শীগগির এগিয়ে আসছে, কত গভীরে যে নাড়া খাচ্ছে পাঁচহাজার বছর ধরে সভ্য এই জাতটা!

এখন মনে হয় দুঃখ নেই, ইতিহাসের গতিরোধ করা সম্ভব নয়, ভারতবর্ষ শোষিত নিপীড়িতদের মুক্তি দিয়ে জাতীয়মুক্তির সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবীর মুক্তি নিয়ে আসবেই। দেরী হচ্ছে, বিভ্রান্তি হচ্ছে···

ভয় নেই, মরার আগেই দেখে যাব আমরা ভারতবর্ষ মুক্ত জনতার পুরোভাগে, পৃথিবী শোষণের বাঁধন ছিঁড়েছে, বিজ্ঞান নবজাতক

গ্রহের জন্ম দিয়েছে। ভগবান হয়তো পিছু হটতে হটতে গিয়ে মঙ্গলগ্রহে আড্ডা গেড়েছে—পৃথিবীটাকে বিজ্ঞানের হাতে ছেড়ে দিয়েছে।

এ সবই আমরা বেঁচে থাকতেই হবে। মুষড়ে পড়ো না, এর জন্য আমাদের যা করণীয়, করে আমরা যাবই। সক্রিয়ভাবে ইতিহাসের সামিল হব, হাজার হাজার জনতার ভাল করব।

মার চিঠি পেয়েছি, বড টানাটানি। টাকা পাঠিয়েছি। সীতাদি-দের সঙ্গে 'বিসর্জন' ধরেছি।

এখানে মৃণাল সেন ও সমরেশ বসু চাকরী সংক্রান্ত কাজে এসেছে। মৃণালের সঙ্গে গল্প করে বড় আনন্দে কাটছে।

৬.

বোম্বে

৬. ১২. ৫৫

···আমার চরিত্রের প্রধান একটা দিক যেখানে অভাব, সেটা হচ্ছে আজো পর্যন্ত আমি আমার কাজে সাফল্যের স্বাদ পাইনি। কোন কাজ শেষ পর্যন্ত সুসমাপ্ত করে উঠতে পারিনি আমি। হয়তো এবার পারব। সেইটি পাবার দিকে একাগ্র হতে গিয়ে অনেক কিছুকে তাচ্ছিল্য করেছি···একটি পুরুষের জীবনে এটা যে কতবড় অভাব, এবং এটা যে কিভাবে চরিত্রের খারাপ দিকগুলোকে জাগ্রত করে, ভাবলে বুঝতে পারবে। আমার পরিস্থিতি আশপাশ, অতীত এগুলোকে বোঝ। অনেক দোষের কারণগুলোকে খুঁজে পাবে, কাটাবারও পথ পাবে।··

৭.

বোম্বে

১০. ১২. ৫৫

···গত চিঠিতে লেখার কথা তোমাকে লিখেছি, এ চিঠিতে দেখলাম তুমিও তাই ভাবছ। তুমি আমাকে একদিকে মাত্র অপূর্ণ রেখেছ। তোমার সৃষ্টিশীলতার গৌরবে কবে আমি গর্ব অনুভব করতে পারব?

তোমার সৃষ্টির মধ্যে তোমাকে দেখতে চাই। তোমার কল্পনার রাশ ছাড়ার মধ্যে আমার জন্যে অনেক কিছু রেখেছ দেখলাম, প্রতিষ্ঠা, নিজের Production, আদর্শ Stage, আরো কত কি! আর নিজের জন্যে? একটুখানি হয়তো প্রতিষ্ঠিত হওয়া।

বাঙ্গালীর ঘরের সেই চিরন্তন লক্ষ্মীর নিঃস্বার্থ মনোভাব। কিন্তু এ চলবে না। নিজেকে নিয়ে স্বপ্ন দেখতে হবে, আকুল হয়ে উঠতে হবে, —অনেক দূরের তারায় দৃষ্টি নিবদ্ধ করতে হবে। তোমার মনের ছোঁয়া পেয়ে আমার মন বিকশিত হচ্ছে, আর তুমি নিজে সেই অপরূপ ঐশ্বর্য নিয়ে একটুখানি হয়তো এগোবে?

বাঙ্গালীর ঘরে, দেশের অখ্যাত কোণায় কত মেয়ে আটকা পড়ে কাতরাচ্ছে, কত মেয়ে নিজেকে নিংড়ে নিঃশেষ করে দিচ্ছে নিজেদের আপনার জনের জন্যে, কত মেয়ে অসীম শক্তি নিয়ে থরথর করে কেঁপে ফুটে বেরোতে না পেরে একদিন শুকিয়ে মরে যাচ্ছে,—তাদের সকলের অব্যক্ত কান্না তোমার কাছে পৌঁচেছে, তুমি চীৎকার করে বলবে না? কতশো বছরের যে মহান বাংলা সংস্কৃতি, মানবতাবোধের শ্রেষ্ঠতম বিকাশ যেখানে,—তার ধারাকে বয়ে নিয়ে এসে আজকের মহাসমুদ্রে ঢেলে দেবার দায়িত্ব কার?

যে জ্বালা, যে দীপ্ত অনুভূতি তোমার মধ্যে ঘুরপাক খাচ্ছে, তাকে প্রকাশ তোমাকে করতেই হবে। আর তারই মধ্যে দিয়ে সার্থক হয়ে উঠবে তুমি, হয়ে উঠবো আমি।

দুঃখের পাথার আছে সামনে। অনেক অভাব, অনেক কষ্ট, অনেক অবজ্ঞা সহ্য করা এখনও বাকী, একথা জানি। আর এও জানি আমাদের দুজনের মেলার মত এত বড় ঘটনাটা যখন ঘটে গেছে, তখন সবকিছু আমরা পেরোবই, আর পেরিয়ে গিয়ে অপেক্ষা করছি আদর্শ সাধনের মধ্যেকার যে তৃপ্তি, যে আনন্দ, তাকে পাবই। তাই আমি এখন বেপরোয়া, এবার রওনা হব। আমি তৈরী। তুমি কেন আর দেরী করবে?

সমরেশ বসু এখানে আছে, তার সঙ্গে লেখা নিয়ে অনেক আলোচনা হয়েছে। সে বলে, তোমার ও আমার লেখা এই মুহূর্তে সে বই করে ছাপার ব্যবস্থা করে দিতে পারে। আমার উপর তার অত্যন্ত শ্রদ্ধা।

'বিসর্জন' এখন পুরোদমে চলছে। এখানের সবাই অত্যন্ত মুগ্ধ।

৮.

বোম্বে

১৬. ১২. ৫৫

আমার মনে হচ্ছে, অনেক কিছু আবার বোধহয় মোড় ঘুরতে চলেছে। প্রথমতঃ, যে গল্প তৈরী করেছিলাম, সেটা মুখার্জীর পছন্দ হয় নি। সে আরো বোম্বাই মার্কা ব্যাপার করতে চায়। সেরকম করে কখনো ভাবিনি, আর ভাবতেও ভাল লাগে না, কাজেই জানি না কতদূর তার পছন্দসই করে বদল করতে পারব। তবে লড়াই না করে ছাড়ব না, আপ্রাণ চেষ্টা করব যতখানি প্রাণবন্ত রাখা যায় গল্পটা। গল্প অদলবদল নিয়েই ভয়ংকর খাটতে হচ্ছে এখন। এটা এখন এমন পর্যায়ে এসে পড়েছে যে rejectও হয়ে যেতে পারে, আবার আমার কথামতও হতে পারে।

এ বিষয়ে আশা করছি এক সপ্তাহের মধ্যেই স্থির হবে। এইসব ঝামেলার মধ্যে আমার মাইনে বাড়ার কথা চাপা পড়ে গেছে। আমি চিঠি দিয়েছিলাম Officially, উত্তর দেয় নি।

ইতিমধ্যে নিরঞ্জন সেনের ভাই মটা এসে ঝোলাঝুলি করছে, ওর কোম্পানী থেকে বিমল রায় একটা বাংলা ছবি Produce করছেন, সেটা পরিচালনা করে দেবার জন্যে। সেটা কলকাতায় করতে হবে।···

কলকাতায় ফিরলে রাধা ফিল্মস এখনই আমাকে পরিচালনার দায়িত্ব দিতে চায়। সেটা মটার through দিয়ে রাধার মালিক জানিয়েছেন—সেজদার চিঠিতে জানলাম, অরোরার ওরাও আমাকে পেলে কাজ দেয়। এসব ধরতে পারা যায়, যদি সম্মানের সঙ্গে একটা কাজ হাতে নিয়ে কলকাতায় ফিরতে পারি। অন্ততঃ ছয়মাসের security নিয়ে ফিরলে হয়তো চেষ্টা করা যায়।

এখান থেকে পালাবার কথা ভেবে মন খুসী হচ্ছে, আবার কলকাতার আর্থিক জীবনের কথা ভেবে দমে যাচ্ছি, যা হয় করব। সমস্ত developmentএর বিষয়ে তোমাকে যত শীঘ্র পারি জানাব। নেই একটা ঝুঁকি, কি বল প্রাণের লক্ষ্মী ?

৯.

১লা জানুয়ারী

১৯৫৬

...আজ পয়লা জানুয়ারী আমার মন একদিকে বড় মুষড়ে গেছে, আর একদিকে কাজের কথা খালি মাথায় এসে ভীড় করেছে।

পঞ্চান্ন সালে পেলাম কি? আর হারালাম কোথায়? প্রথম পাওয়া তোমাকে...ও বছরটা আরম্ভ করেছিলাম রিক্ত অবস্থায়, কোথাও কিছু ছিলনা আমার, পার্টি থেকে অবাঞ্ছিত, আর্থিক চরম জঞ্জালে, দৈহিক শ্রান্তিতে বোঝাই, মনে পরম দীনতা, আশা মৃত, কোনদিন কিছু হবেনা আমার এই ধারণা বদ্ধমূল, প্রতিকূল স্রোত তখন জোরে বইছে। আমার জীবনে কোন ঘটনা ঘটবে একথা মনে হত না। একলা ঘরের মধ্যে আবদ্ধ, বন্দীজীবন। গোটা-কয় ছেলে আর তুমি, আমার শেষ আশ্রয় সেদিনের যা কিছু করেছি, কোন জিনিসই সফল সার্থকতায় পৌছয়নি। এই হচ্ছে, ১৯৫৪ সালের ১লা জানুয়ারী।

আর আজ? তুমি আমার হয়েছ। নিজেদের কাছে নয়, সামাজিক ভাবেও। আমার পরম সম্পদ, জীবনের চিরকালের বিস্ময়, তোমাকে আমি আপন করেছি এই বছরটার মধ্যে। তোমার মধ্যে দিয়ে আমি সমাজ-জীবনে শিকড় খুঁজে পেলাম।

...এখন শত আঘাতেও সহ্য করতে পারি। কোন বিপদেই মন আগের মত মুষড়ে পড়েনা, অদ্ভুত একটা জোর সবসময় মনের মধ্যে আছে। একজন আমাকে ভালবাসে, একজনের কাছে আমি সার্থক, সে আমায় শত দোষ সত্ত্বেও সম্পূর্ণ গ্রহণ করে,—এই ঘটনা যে আমার মাথা কত উঁচু করে তুলছে, তা লিখে বোঝানো যায়না। আমি আজ-কাল প্রতিপদে এটা অনুভব করছি। আমি আমার জীবনের ব্রতে সফল হবই।...

এ বছরে হয়েছে একটা চাকরী। অত্যন্ত দীন। কিন্তু নিজে উপায় করে গ্রাসাচ্ছাদন করার পথ একটা হয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে ইঙ্গিত পাচ্ছি আজকে, আগামী দিনে শিল্পজীবনে সার্থকতা হয়তো আসবে। অর্থাৎ সংগ্রাম করার আশা আজকে আছে। কিছু বন্ধু পেয়েছি আবার। আবার নিজেকে প্রসারিত করে দেবার অবকাশ বুঝি তৈরী হল।

কিন্তু চিরদিনের মত পার্টি আমার হারালো—জীবনে আদর্শ যা ছিল, জলাঞ্জলি গেল। আমার প্রতিজ্ঞা করতে ইচ্ছে করছে, আবার পার্টিতে সগৌরবে একদিন ফিরে যাবই। পার্টির গলদ যাবে, আমাকে বুঝবে, আমার আশেপাশে আবার কাজের উদ্যম আর ব্যস্ততা চলবে। এরমধ্যে ঢুকে যেতে না পারলে জীবনে কিছুতেই আনন্দ নেই।

আর এসে জুটেছে এ বছরে এক ক্লেদাক্ত ঘৃণ্য পরিবেশ। এই যান্ত্রিক সহরের সমস্ত পচা নোংরামি আমায় ক্রমশঃ পাগল করে তুলছে। কি করে এবছর ফুরোবার আগেই নিজের জমিতে ফিরে গিয়ে গ্রাসাচ্ছাদন করা যায়, শিল্পসৃষ্টি করা যায়,—তার পরিকল্পনা করতে হবে।

কলকাতায় ছবি পরিচালনা করার সুযোগ আগামী জুনের মধ্যে করতেই হবে। এবং এবাঁর সুযোগ পেলে, তার পরিপূর্ণ সদ্ব্যবহার প্রাণ ঢেলে করতে হবে। তার ওপরেই নির্ভর করছে ভবিষ্যতে শিল্প-চেষ্টার সুযোগ ও দেশ থেকে খাবার অবকাশ।

এই হচ্ছে আমার বছরকার মূল কাজ। আমাকে বাংলায় একটি ছবি সম্পূর্ণ করতে হবে আমার সমস্ত ক্ষমতা উজাড় করে দিয়ে।

দ্বিতীয়তঃ তোমার লেখাকে আঁকড়ে ধরতেই হবে এবার থেকে।

তোমার প্রচণ্ড সংবেদনশীল মনকে এবার সবার সামনে তুলে ধরতে হবে। সেই Introductionই হচ্ছে আমার প্রধান করণীয়। এই সঙ্গে আমার লেখাও আবার শুরু করতে হবে। এবং আমি তা করব। লেখক হিসেবে নাম আমাকে করতে হবে। এর সঙ্গে, যে ছেলেগুলো আমার চরম বিপদের দিনে আমার সঙ্গী ছিল, তাদের নিয়ে নাটক তৈরী করতেই হবে। এ বছরের মধ্যে Group Theatre-এর অন্ততঃ একটি নতুন নাটক পেশ করতে হবে।

১৯৫৭ সালের ১লা জানুয়ারী আমাদের গর্বের সঙ্গে বলতেই হবে, এগুলো আমরা অর্জন করেছি।

এইসঙ্গে পার্টি ও জনতার কাজে আরো কাছে এগিয়ে যাব আমরা। হয়তো এত শীঘ্র পুরোটা হবে না, কিন্তু পথে যে এগোচ্ছি, তার আভাস পাব।

আমরা কি ফুলেফলে ভরে উঠব না?

১০.

৮,১.৫৬.

বোম্বে

তুমি আসার সময় উমাটাকে কি শৈলেনটাকে নিয়ে এলে জমবে খুব। নাটক জমছে। ফেব্রুয়ারীতে show. আর অনেক নতুন লোকের সঙ্গে আলাপ হয়েছে। সলিলও আমাকে কেন জানি না হঠাৎ ভালবেসে ফেলেছে। সেদিন আচমকা বলল, আমার জন্যে সত্যি ও একটা টান অনুভব করতে আরম্ভ করেছে। সেটা আমিও দেখতে পাচ্ছি।

মার জন্যে, সেজবৌদির বাচ্চাদের জন্যে, সেজদার জন্যে আজ আমার বড় মন কেমন করছে। ওদের সকলকে ভাল করে আদর শ্রদ্ধা করে এস। মাকে বোল, যে করে হোক প্রতিমাসে আমি টাকা পাঠাবই।

তোমার শেষ চিঠি সম্বন্ধে আর কি লিখব। আমার সমস্ত কল্যাণ কামনা রইল তোমার জন্যে, তোমার জন্যেই আমার সমস্ত কিছু উৎসর্গ করা রইল।

তুমি না থাকলে কোথায় চলে যেতাম, ভাবতে ভয় করে, তুমি থাকতে কোথায় যাচ্ছি, ভাবতে জোর আসে।

চিঠিগুলো পডতে পড়তে ও অনুলিপি করতে করতে চলে গিয়েছিলাম সুদূর অতীতে। বারবার মনে হচ্ছে ঐ সময়কার অবস্থা, চিন্তাধারা ও মনোভাবের প্রকাশ, যে ভাবে আছি, আমি নিজের ভাষায় লিখে তা ব্যক্ত করতে পারতাম না। মনে পড়ে কি গভীর স্নেহভালবাসা ও একটি মঙ্গলাকাঙ্ক্ষা ঘিরে ছিল আমার জীবনকে।

সমস্ত হতাশা, বেকারী, অর্থাভাব, অবজ্ঞা, অপমানের থেকে জীবন ফুলে-ফলে ভরার প্রতিজ্ঞা নিয়ে শুরু হলো ১৯৫৬ সাল।

জীবনে একটি অধ্যায়ের শেষ।

৪.

১৯৫৬ সালের কথা মনে হলেই মনে পড়ে মার কথা। আমি কিছুদিন শিলংএ বাবার কাছে থেকে, বোম্বে যাবার আগে কদিন কলকাতায় মার কাছে

ছিলাম। মার কাছে ঐ কদিন থাকা আমার জীবনের উজ্জ্বলতম ও মধুরতম স্মৃতি।

বিয়ের আগেই মার সঙ্গে আলাপ পরিচয় হয়েছিল। বিয়ের পরে মা আমার বাবাকে চিঠি লিখেছিলেন : '...বাড়ীতে সকলের ছোট বৌ হোল ও কাজেই লক্ষ্মীকে খুব আদরের সঙ্গেই সবাই গ্রহণ করিয়াছি।...আমার সাধ্যানুযায়ী লক্ষ্মীর আদর যত্নের কোন ত্রুটি হইবে না'...মা আমাকে ঘোমটা দিতে বারণ করেছিলেন। আর বারবার বলেছিলেন—'তুমি মেয়ের মতো থাকবে।

এইসময় তাঁর আদরযত্নের কথা জীবনে ভুলব না। রোজ সকালে জিজ্ঞেস করতেন 'আজ কি খাবে?' আর বলতেন 'আজ লক্ষ্মী রান্না করবে'। এরপর গুছিয়ে দিলে নিজেই রান্না করতেন। আমি ঐ ফাঁকে তাঁর ঘর, বিছানা, জামাকাপড় পরিষ্কার করতাম, রোদে দিতাম। বিকেলে সবাইকে বলতেন লক্ষ্মী এই করেছে, ওই করেছে।

রোজ সকালে কাসুন্দি ইত্যাদি রোদে দিতাম। বলতেন, 'তোমাকে সব শিখিয়ে দেব।'

পৌষসংক্রান্তির দিন বহু বছর পর পিঠে করলেন, সেইদিন ও যে কদিন ছিলাম রোজ বলতেন : 'সামনের বছর আমি থাকবনা তুমি বা তোমরা করবে।' ভাবতাম বয়স হয়েছে তাই এইরকম বলছেন। বোম্বে চলে আসার দিন বারবার বললেন, 'দুজন মিলে সুখেশান্তিতে ঘরসংসার করো।' আরো বহু কথা।

বিয়ের পর যেদিন প্রথম আসি সেদিন বলেছিলেন : 'তুমি আমার শেষজীবনে এসেছো, আমি তোমাকে অনেক কিছু দিতে পারলাম না, কিন্তু প্রাণভরে আশীর্বাদ করছি। আর টাকাপয়সাটা জীবনে বড়ো নয়, মনের শান্তিটা বড়ো।'

আমার দিদিমাও বিয়ের সময়ে আশ্চর্যভাবে এই কথাই বলেছিলেন 'জীবনে টাকাটা বড় নয়, মনের শান্তিটাই বড়ো।'

দিদিমা ছিলেন হাকিম গিন্নী। আমার দাদামশাই ছিলেন E. A. C. মা ছিলেন ম্যাজিস্ট্রেট গিন্নী। সুতরাং দুজনেরই মুখে সেদিন ঐকথাগুলো শুনে অবাক হয়েছিলাম।

আজ ভাবি, এর আগেও বারবার মনে হয়েছে—মা ও দিদিমার

আশীর্বাদেই জীবনে বড়ো বিপদের দিন পার হয়ে এসেছি। আর তাঁদের আশীর্বাদেই বোধহয় জীবনে একটা জায়গায় গিয়ে পৌছব।

বম্বে চলে আসি। তিনদিন পরেই টেলিগ্রাম এল, মার খুব খারাপ অবস্থা। আমরা সেদিনই কলকাতা রওয়ানা হই। সকালে পৌছে প্রণাম করি। ঐ অসুস্থতার মধ্যেও প্রণাম করলে মা আশীর্বাদ করেন। রাত্রে আমার ভাগ্নীকে বলি 'আজ রাত্রে আমি মার কাছে বসব ও জাগব।'

ভোরে মা শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

পরম স্নেহশীলা, ধৈর্যশীলা ও একজন মহীয়সী মহিলা হিসাবে মার স্মৃতি আমার মনে উজ্জ্বল হয়ে আছে। মাকে কোনদিন ভুলবনা।

টেলিগ্রাম পেয়ে কলকাতা যাবার আগে শশধর মুখার্জী কিছু টাকা অগ্রিম দিয়েছিলেন। এমনিতে স্নেহও করতেন। এবার বেশ কিছুদিন উনি বোধহয় চিকিৎসার জন্য বিলেতে ছিলেন। ফিরে আসার আগেই 'মধুমতী'র চিত্রনাট্য লেখা আরম্ভ হয়েছিল। ফিল্মিস্তানের জন্য 'রাজা' গল্পটিই চিত্রনাট্য আকারে লেখা চলছিল। বারবার অনেক বদলাতে হচ্ছিল। কিছুতেই পছন্দ হয়না। এদিকে মাইনেও বাড়েনি। সুতরাং চাকরী ছেড়ে দেওয়াই স্থির করেন। শশধরবাবুকে লিখেছিলেন ওই সময়ে :

177, Jawaher Nagar.
Goregaon,
Bombay, 10th April, '56.

Mr. Mukherjee, Sir,

I take this opportunity to express my heartfelt good wishes for your quick and complete recovery. Believe me, Sir, I was extremely anxious about you when I heard of the operation. I was also touched by your most impassioned letter written to the staff.

I, of all persons, have much reason to feel grateful to you. You know the reason. As you know, I took up this position here in Filmistan to be near you and to watch the inner workings of the most successfull film-making process in India from close quarters.

I have done so for about ten months now.

I think I have learnt a point or two. At least my vision has changed to a great extent by coming here from the back-waters of Bengal.

This I owe solely to you.

One day, in the very beginning, you told me that you are not interested in developing personal relations with me, your sole concern being work.

In the past agonising and inactive months, you have had opportunities to know me for all my worth and you must have formed your opinion. My sincere desire is to see your opinion translated into action.

I am ever ready to take the rough with the smooth.

But, before taking the plunge, one thing seems to be my duty, I must speak out my reactions.

This I will do, because I know you are always full of thought for your work. You know everybody is a non-entity minus his work, And so, how to improve, how to keep up the pace, how to scare again and again,—these are always uppermost in your mind.

In your bed of convalescence, you have a rare opportunity for a re-appraisal. This chance will be denied to you the moment you set foot here.

I consider you the most incisive intellect I have met in in this industry. Your range is wide, you can contact any subject, any emotion, any new mode of approach. If you suffer you suffer by default,—by a negative surrounding which constantly beds you down into the sure of dogma and grooves of well set patterns.

This is your struggle.

But to-day you are in a country where you can see the

pictures which will make you feel that it all is not bluff, and one thing you may become conscious of filmi s increasingly becoming adult. Approach of naive hypocrisy and pandering to the baser instincts of men alone is not always enough to-day for delivering the goods.

Even with the fear of boring you with a long and uncalled for letter I must put forward a suggestion.

To-day, a window has to be opened.

This has become the prime necessity for everyone who wants to go for ward.

You are a worshipper of facts, Sir. And what is more, you are also a manufacturer of facts. You know facts are not born, they are made.

My request is to you, please create a corner where new facts can be made.

Make a department for experimental film making. Appoint persons with necessary flares, put all sorts of hurdles before them,—a low budget, no starts, no good equipments, no fancy name in technicians, no massive sets, no legendary music director, and also, no colour,—just ideas. Let them get out of the studios and shoot out of doors, let them know that any story can be a great story with proper treatment, and also treatment mainly includes camera treatment. Let them see the world thru of the camera, let them explore possibllities of editing table, creative sound track, camera set-up.

I have learnt from you that film scores thru intoxication. Intoxication is easier to dish out without art. All great art is intoxication but all intoxication is not art.

And when the genuine article arrives, falsehood withers away.

Get hold of sincere workers. They themselves are intoxicated with their ideas. If properly guided, they can move mountains and can turn deserts into gardens.

This country, specially in all India field, is yet to see an honest picture. All it has met with hitherto are progressive bluffs. Things are changing. After five years, if things go on in the same way, these bluffs are bound to be at the top, in absence of the genuine article.

But the man who surreptitiously opens an window to-day and goes on truing to manufacture facts, is bound to scare in one, of his innumerable attempts. Then the fact at the box-office will be farn. The fact then, will be worshipped by hardheaded businessman.

This task needs foresight. One man in my knowledge has the requisite foresight , grit and solid spine to carry thru such revolutionary programme. He is you.

This is, incidentally, the way of survival. There is no other way, in the long run. The name of Filmistan, with its creator, will fade in public memory within a shorttime, otherwise.

Create the small corner, nurture it with step-motherly affection. Hurl sbstacles in its path, those who will grow, will be sturdy. Yourself lend the specialised knowledge of unique success in box-office, but do not make a compromise.

Judge the results by the total offects, synthetically—and not un-necessarily analytically, that is mere details, approach and handling of a subject. Sometimes all the matter go down the drain when you start weighing water with a sieve.

I do not know whether this will ever come up, but if it does, I will weep in ecstasy.

You have all the qualities of being the pioneer. You can break all barrier by bringing in a fresh and powerful mind, you can throw your boys all over the country with a camera and a heart.

Once the idea takes hold of your mind, the practical implementation and organisation part of it will be easy.

I, personally, do not feel like staying here if such a small corner is not made. I do not aspire after position or money but I must feel that I am living a worthy life. It is better to go away anywhere else and fight tooth and nail for such intoxicating film making. I do not see any future in this smug complacency. This environment is fetter.

After all if I miss the bus I can always fall back upon my second line of defence, whatever it may be.

But what about you, Sir? You must crown your career with something profound, something enobling, something which will bring a meaning in your existence, you must have such an youthful Laboratory.

Believe me, Sir, I have not written this with any personal motivation, nor to hurt you. I have written because somehow I found something which I have not found anywhere else.

In the meanwhile, I have finished detail work on the script of 'Raja' which Mr. Kaul is not doing, also I have written two stories for Sachin Sarkar about a dancer's life, and am now writing a story about a coalmine for Bedi. All these are awaiting your return.

I do not know whether I have done right or wrong by being so brutally frank with you, but I cannot ever be a professional job-hunter in search for a career. I would

rather take the risk. If I have hurt you or made you angry, pardon me. It was unintentional.

My deepest regards to you and Mrs. Mukherji.

I am, Sir,

Yours faithfully
Ritwik Ghatak

শশধর মুখার্জী দেখা করবার জন্য ডেকে পাঠিয়েছিলেন। উদয়শংকর-এর ভাই শচীনশংকর এর সঙ্গে আমাদের খুবই হৃদ্যতা হয়েছিল। আমাদের গোরেগাঁওয়ের বাড়িতে আসতেন। মহেশ কাউলের বাড়ীতেও দু একবার গিয়েছি। ফিল্মিস্থানে গল্প লেখার সময় আলোচনা হতো দুজনে মিলে। 'মধুমতী' লেখা প্রায় শেষ হয়। ঋষিদার প্রথম ছবি 'মুসাফিরে'র স্ক্রিপট লেখা শুরু হয়। ঋষিদা ও সলিলদার সঙ্গে মিলে তিন বন্ধুতে ঠিক করেন গল্পটি। জন্ম, মৃত্যু, বিবাহ—তিনটি ঘটনা একই বাড়িতে ঘটছে, এই নিয়ে গল্প। লেখার সময় কিছু কিছু শুনেছিলাম। কিন্তু ছবিটি আমার দেখার সুযোগ হয়নি। আমি তখন শিলং ছিলাম।

৫.

গোরেগাঁও ছেড়ে ওয়ার্ডেন রোডে একটা ফ্ল্যাট পেয়ে আমরা চলে আসি। ফ্ল্যাটটিতে ছিলেন পরিচালক সত্যেন বসু। গোরেগাঁওতে কেষ্ট মুখার্জী ও শৈলেন ঘোষ আমাদের বাসায় ছিলেন। ভূপতিদা ও সমীরণ দত্তকেও আনার ইচ্ছা ছিল। হয়ে ওঠেনি।

ওয়ার্ডেন রোডে আসার পর রাঙাদা (মেজো ভাসুর) নাগপুর থেকে আসেন। দেবতুল্য লোক ছিলেন তিনি।

এরপর একবার কলকাতায় গিয়ে 'নাগরিক' রিলিজ করবার শেষ চেষ্টা হয়। কলকাতা যাবার পরই চিঠি পেলাম—'মা'র কথা বারবার মনে হচ্ছে। চারিপাশে মা'র স্মৃতি। লক্ষ্মী, আমি আরো ভাল হব এবার থেকে। আরো দায়িত্ব নেব। কাজ করব।'

কিন্তু শেষ পর্যন্ত চেষ্টা সফল হয়নি। যতোটুকু আমার মনে আছে বা বুঝেছি—ডিস্ট্রিবিউটর চৌধুরী ছবিটি লুকিয়ে লুকিয়ে মফঃস্বলে কিছু কিছু

দেখিয়েছিলেন। কলকাতায় রিলিজ না করে মফঃস্বলে দেখানোর রেওয়াজ নেই। সুতরাং শেষ চেষ্টার ঐখানেই শেষ হয়।

ছোড়দা ও ডলিদি ও আমাদের ছোট্ট ভাগ্নীটিকে নিয়ে বোম্বে ফিরে আসেন। এই সময় প্রায়ই আসতো অনীশ ও গীতা। আর আসতো আমার বড়ো ভাগ্নী টুস্‌কী। টুকীকে নিয়ে আমরা একবার খাণ্ডালা বেড়াতে গিয়েছিলাম।

ভাগ্নে, ভাগ্নীদের প্রতি ওঁর স্নেহ ভালবাসা ছিল অসীম।

'মধুমতীর' স্যুটিং আরম্ভ হয়। স্যুটিং দেখতে একদিন গিয়েছিলাম। দিলীপকুমারের সঙ্গে হৃদ্যতা ছিল খুব।

জুহুবীচে বলরাজসাহানীর বাড়ীতে মাঝে মাঝে যেতাম। একদিন আলোচনা করতে করতে রাত হয়ে যায়। আর বাড়ী ফেরা হয় না।

'মুসাফিরে'র পরেই হীতেন চৌধুরী একটি গল্পের স্ক্রিপট লেখান। গল্পটি পরে ছবি করান নি।

মেরিন ড্রাইভের কাছেই ডাঃ পুরন্দরের নার্সিং হোমে বড়ো মেয়েটির জন্ম হয়। মেজদি ছ'মাস ছিলেন। চলে যাবার পর সারাদিন মেয়েটিকে নিয়ে একাই থাকতাম। রাঙাদাও কিছুদিন ছিলেন না। মধুমতীর স্যুটিং চলছিল আন্ধেরী, সেইখান থেকে বান্দ্রাতে এসে হিতেনদার গল্পের স্ক্রিপট লিখে বাড়ী ফিরতে ফিরতে অনেক রাত হয়ে যেতো। কিন্তু তাড়াতাড়ি ফিরলে, এসেই প্রথম ছোট্ট মেয়েটিকে কোলে নিয়ে বসতেন।

'বিসর্জনের' পর 'মুসাফিরোঁকে লিয়ে'র রিহার্সাল চলছে। শেষের দিকে নাটকের রিহার্সাল ওয়ার্ডেন রোডেই হতো, আমাদের ফ্ল্যাটের কাছেই। তখন আমিও প্রায়ই যেতাম। নাটকটির আলোর কাজ করবার জন্য তাপস সেন এসেছিলেন।

মন ক্রমশঃ কলকাতা যাবার জন্য তৈরী। বোম্বে থাকলে হয়তো টাকা হতো, কিন্তু মনের মতো কাজ হতো না। আমি একটি কথাও বলতাম না। বিয়ের আগে, বিয়ের পরে বিরাট চাকরী, বিরাট টাকার কথা কখনো ভাবতাম না। টাকাতো কাজ করলেই আসবে। বড়ো কথা শিল্পীমন ও দার্শনিক গভীরতার প্রকাশ। আর আমি স্ত্রীতো নিশ্চয়ই, কিন্তু তার চাইতেও বড়ো সংগ্রামী সাথী, বন্ধু ও শুভানুধ্যায়ী।

সাংসারিক ক্ষেত্রে, প্রতিদিনের জীবনে অস্বাভাবিকতা ছিল। সেটা

বুঝতে একটু সময় লেগেছে, তারপর তা মেনে নিয়েছি। টাকাপয়সা সমস্ত আমার হাতে দিতেন। আয় থেকে ব্যয় বেশী করা, দায়িত্ব বেশী নেওয়া ইত্যাদিও ছিল—কিন্তু চলে গেছে।

ওয়ার্ডেন রোডের সাততলা বাড়ির পাঁচতলার ঐ ফ্ল্যাটটি খাদির জিনিস পত্র কিনে সাজানো হয়েছিল। খাদির জিনিষ খুব পছন্দ ছিল। পোশাকও পছন্দ ছিল খদ্দরের পাঞ্জাবী, গেরুয়া কলিদার পাঞ্জাবী ইত্যাদি।

ফ্ল্যাটটির বারন্দায় কাঁচের বড়ো জানলায় দাঁড়িয়ে দূরে দেখা যেতো আরব সাগরের নীলজল, কাম্বালার সমুদ্র তীরে যেন আকাশের নীল রঙের সঙ্গে মিশে আছে। রোজ রাত্রে দাঁড়িয়ে শুনতাম সমুদ্রের গর্জন ও জলোচ্ছ্বাস, অন্ধকারে দূরে দেখা যেতো ছোট বড়ো পাথরের মাঝে মাঝে আছড়ে পড়া নীল সমুদ্রের ঢেউ।

১৯৫৬ সাল শেষ হলো।

পরের বছর মার্চ মাসে আমরা কলকাতা চলে আসি। ঝাপসা হয়ে আসে বোম্বে, গোরেগাঁও, ওয়ার্ডেন রোডের সমুদ্র সৈকতে।

'অমৃতকুম্ভের সন্ধানের' চিত্রনাট্য লেখা চলছিল তখন। এমনি কাজ-কর্মের চেষ্টাও চলছিল। বি. এন. সরকার বলেন দেড়-দুই মাসের মধ্যেই সরোজ রায়চৌধুরীর 'নতুন ফসল' আরম্ভ করবেন।

আমরা কলকাতায় আসায় সুভাষদা (কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়) খুব খুসী হন। লেখা ও সাহিত্যিক জীবন সম্বন্ধে ওঁর সঙ্গে আলোচনা হতো অনেক।

শেষ পর্যন্ত 'নতুন ফসল' হলো না। বি. এন. সরকার একটি চিঠি দিয়ে জানান, ছবিটি এখনই তাঁর পক্ষে করা সম্ভব নয়। চিঠিটি এই রকম :

11. 6. 57.

Dear Mr. Ghatak,

After you had left last evening I had been thinking things over about the prospects of my being able to start and finish a production.

With the heavy commitments over Studio No. 1 of N. T. I do not think it will be possible for me to know the exact financial position till at least the end of August.

I do not want once again to find myself in an unpleasant situation due to conditions beyond my control.

I have, therefore, to request you to take up some other engagement. I shall contact you again when I feel that I am certain about being able to finish a picture satis factorily.

I have made the position frankly clear and I hope to be excused for any inconvenience that I may have caused you in advertently.

Thanking you,

Yours Sincerely

B. N. Sircar.

বি. এন. সরকার মহাশয়ের কাজ আরম্ভ করতে দেরী হবে, তাই তখন শিবশংকর মিত্রের লেখা 'আর্জান সর্দার' বইটি ছবি করবার জন্য আলোচনা ও স্ক্রিপ্‌ট লেখা চলছিল। ছবিটি কেন হল না, মনে নেই। বোম্বেতেই ফিরে যেতে হতো।

শেষ পর্যন্ত আশ্চর্য ভাবে শুরু হলো 'অযান্ত্রিক'। অযান্ত্রিক গল্পটি আগেই দীনেন গুপ্ত ও উমাপ্রসাদ মৈত্রের সঙ্গে মিলে কিনে রাখা হয়েছিল। প্রমোদদা তখন দুটো ছবি (পরশপাথর, লৌহকপাট) আরম্ভ করেছিলেন, তবু তাদের স্নেহের ঋত্বিককে দিয়ে তৃতীয় ছবি আরম্ভ করানো অসীম সাহসের পরিচয়।
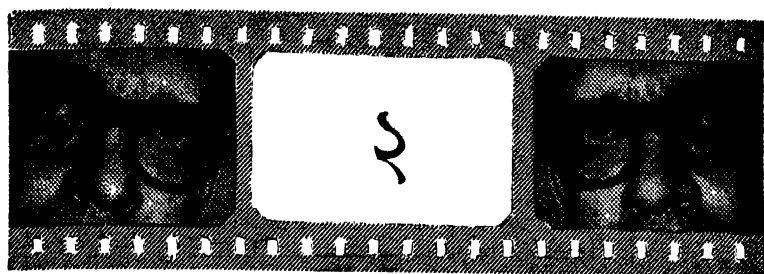
অযান্ত্রিকের কথা ভাবলে বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে আসে মন। ছোটগল্প লেখকদের মধ্যে সুবোধ ঘোষের নাম বিখ্যাত। এবং তাঁর বিখ্যাত গল্পগুলোর মধ্যে 'অযান্ত্রিক' একটি। সেই গল্প নিয়ে ছবি করার সুযোগ এল আকস্মিকভাবে। একটি ভাঙা গাড়ী আর তার ড্রাইভার বিমল আর ছোটনাগপুরের উপত্যকা ও প্রাকৃতিক সম্পদকে মূলধন করে শুরু হলো অযান্ত্রিক ছবি। প্রথম শট নিয়ে ছবি আরম্ভ করার পরই চিঠিতে জানলাম খুব ভাল শট হয়েছে। আর 'মা'র কথা খুব মনে পড়ছে, মা বেঁচে থাকল না আজ পর্যন্ত, থাকলে শান্তি পেত।'

এতো বছর বাদে আবার সুযোগ এল জীবনে। তখনো মনে ভাবনা এ সুযোগের সদ্ব্যবহার করা যাবে কিনা।...এতো দিনের আশা আকাঙ্ক্ষা, চিন্তা ভাবনা, দর্শন মূর্ত হয়ে উঠলো ছবিতে—বিমল ও তার ভাঙা গাড়ী। হর্নের আওয়াজ, গাড়ীটি চলার সময় চারপাশের প্রকৃতি, শব্দের ব্যবহার ও আবহসংগীতের সুর! রাঁচী ও নেতারহাটের সুটিংএর অনেক লোকেশনই দেখেছি, স্বপ্নের মত আজ সব মনে আসে—কিন্তু সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, বৈশিষ্ট্যপূর্ণ জায়গা ও ঘটনাটির কথা ভুলব না।

সেটা হল ওঁরাওদের নাচের দৃশ্যাবলী। আগের দিন গ্রামে গ্রামে খবর দেওয়া হয়েছিল। পরদিন সকাল থেকে দূর দূরান্তের গ্রাম থেকে আদিবাসী ওঁরাও ছেলেমেয়েরা নাচতে নাচতে আসছিল। এই আদিবাসীদের সম্বন্ধে আগে রাঁচীতে লেখা চিঠি থেকে জেনেছিলাম। সেদিন এদের গান, বাঁশী, হাত ধরাধরি করে আসা ছেলেমেয়েদের নাচের ছন্দ, সরলতা ও লাবণ্য বিস্ময়ে হতবাক করে দিয়েছিল! আর আসছেতো আসছেই, কোন শেষ নেই।

সত্যি এরা আমাদের দেশের সম্পদ। সেদিন শট নিতে নিতে সন্ধ্যে হয়ে এসেছিল। এই আদিবাসীরা ছবিটির প্রাণ। বিমল এদেরই মত

সরল ও শিশু। কিন্তু কী হলো এদের সংগ্রহ করার ফল? কতটা নিল একে দেশের লোক? 'চলচ্চিত্রচিন্তা' প্রবন্ধে আছে:

"আমার ভুল হয়েছিল, সর্বজনগ্রাহ্য বস্তুর মধ্যে দিয়ে ব্যাপারটিকে টেনে আনতে পারিনি। কিন্তু উপায়ও ছিল না, বিষয়বস্তু এবং পটভূমিকার জন্যে।· ·কাজেই esoteric হয়ে থাকতে হলো, সাধারণ গ্রাহ্য হওয়া গেল না।

যে নৃত্যগীতাদির অনুষ্ঠান আমি অযান্ত্রিকে দেখিয়েছি তাতে 'কোথা বেঞ্জা' 'খাতুরা', 'চালি বেনো', 'ঝুমের', 'লুঝরি' ইত্যাদি বহু সাংকেতিক নৃত্যের সমাবেশে মহাযাত্রাদৃশ্য সন্নিবিষ্ট ছিল। এতে করে প্রকাশ পাচ্ছিল জন্ম, শিকারে যাওয়া, বিবাহ, মৃত্যু, পূর্বপুরুষের প্রতি পূজা এবং নবজন্ম,—এই সমস্ত cycle টা।

অযান্ত্রিকের main theme মৌল উপজীব্য ছিল একটাই। যাকে আমরা 'the law of life; জীবনের নিয়ম বলতে পারি। পাগলের নতুন গামলা পেয়ে পুরানটি ভুলে যাওয়ার সেই নিষ্ঠুর দৃশ্য এবং সর্বশেষে এক শিশুর হাতে জগদ্দলের ক্রেংকার ধ্বনি, যাতে বিমলকে উপলব্ধির হাসিতে ভুলিয়ে দিয়েছিল,—এগুলোতে সেই কথাই প্রকাশ করেছে। এ যেন variation on a minor scale of the main theme, a sort of echo, যা যে কোন Symphonic structure এর প্রাণবস্তু।"

এখানে বুঝতে পারি মনের চিন্তাধারা কোনদিকে পরিণতি লাভ করছে। 'অযান্ত্রিকে'র সংগীত নিয়ে লেখা দুটো খাতাতে নিজের হাতে বিস্তৃতভাবে সব লেখা। মাঝে মাঝে দুই একটা স্কেচও আছে।

Music	1. Bimal's music (slow) orchestra	5 times.
	2. Bimal's solo Swarode	2 times
	3. ঝালা (piece)	1 time.
	4. ঝালা (full)	1 time.
	5. Last Scene—Crescendo TKI Reserve TK2	1 time.
	6. তিলককামোদ	1 time.
	7. সরোদ ভৈরবী 1st piece (sign music 8 times included hue)	2 times.

8.	সরোদ ভৈরবী 2nd piece	Reserve.
9.	,, ,, 3rd piece	Reserve.
10.	,, ,, 4th piece	Reserve.
11.	,, ,, 5th piece	2 times.
12.	সরোদ তেহাই	1 time.
13.	Title piece	1 time.
14.	J' Sign music	8 times.
15.	Title piece 2. প্রিণ্ট-এ দেবেনা	1 time.
16.	Hill sound (M. O.)	15 times.
17.	Mouth organ crash	1 time.
18.	Mouth organ train	1 time.
19.	Mouth organ jud back—ঔ—effect	1 time.
20.	Mouth organ church এক টুকরো রাখতে হবে	2 times.
21.	Kajal music	3 times.
22.	Hashi music	2 times.
23.	তানপুরার ঝংকার—খানিকটা দরকার	1 time.
24.	Night stn & stand	1 time.
25.	Kesto last	1 time.
26.	Kuli new dress	1 time.
27.	প্রণাম করা	1 time.
28.	বাঁশী Solo (তিলংকোষ) লাগবে	1 time.
29.	কিতারা বাঁশী (1st piece 8 times)	1 time.
30.	মুরোজ (cuts)	2 times.
34.	Kajal Return Orchestra	1 time.
35.	Kajal Return Violin	1 time.
38.	মুরোজ 3rd Sg. begin	1 time.
41.	সেতার ও সরোদ (শেষটা ভাল)	1 time.
42.	সেতার solo (করুণ সন্ধ্যা)	1 time.
43.	সেতার solo (তিলংকোষ)	1 time.
45.	সেতার সন্ধ্যারাগ	Reserve.

মিউজিকের রেকর্ডিং যখন হচ্ছিল, তখনকার কথা কিছু মনে পড়ছে। বিরাট অর্কেস্ট্রা, অনেক লোকজন। আছেন আলি আকবর খাঁ, নিখিল বন্দ্যোপাধ্যায় ও শিশিরকণা ধরচৌধুরী। মধ্যরাত্রি পর্যন্তও কিছু কিছু লোকজন ছিলেন। তারপরে কেউ নেই। সীতাদি ও আমি শেষ পর্যন্ত বসেছিলাম। মেয়ে দুটিকে ল্যাবরেটরীতে শুইয়ে রেখেছিলাম। পরিচালক ও আলি আকবর খাঁ মাঝে মাঝে একটু একটু মদ্যপান করছেন। শেষ রাত্রে নেশা কমলেও কাজের বিরতি নেই।

ভোর হয়ে আসে। আস্তে আস্তে দেখি শুয়ে পড়তে। মুখে বারবার একটা কথা—'আমি আমার জীবনের সবকিছু দিয়ে বইটা করেছি। জীবন-সংশয় করে শট্ নিয়েছি।'

সেটা অবশ্য খোকার (দীনেন গুপ্ত) মুখেও শুনেছিলাম। কাজের মধ্যেই ছিল সমস্ত মন, প্রাণ, জীবন।

সেদিন ছিল আমাদের বিবাহবার্ষিকী।

সন্ধ্যার সময় আলি আকবর খাঁর বাড়ীতে যাই।

সেদিনই প্রথম অন্নপূর্ণাদিদির সঙ্গে পরিচয় হয়।

আলি আকবর খাঁ অনেকক্ষণ সরোদ বাজান।

বৌদি রান্না করে খাইয়েছিলেন।

অযান্ত্রিক মুক্তি পাবার পরদিন আমি ও ভবী হলে যাই। সেদিন বোধহয় প্রেসের লোকজনদের সঙ্গে আলাপ আলোচনা, পার্টি ইত্যাদি ছিল। গায়ে সিল্কের পাঞ্জাবী ও ধুতি—কিন্তু সমস্ত মুখ লাল। প্রচুর খাওয়া হয়েছে। এরই রেশ চললো। কাজ পেলে আনন্দে, কাজ না পেলে দুঃখে।

বেশ কিছুদিন পর আমি শিলং চলে গেলাম। অনেকদিন পর চিঠিতে (৯. ১০. ৫৮.) জানলাম 'বাড়ী থেকে পালিয়ে' ও 'কত অজানারে' বই দুটি করা ঠিক হয়েছে। লিখছেন: 'হঠাৎ কালী (ব্যানার্জী) এসে 'কত অজানারে' ছবিটা করার জন্য চেপে ধরেছে। ও নিজে করছিল, এখন আমাকে দিয়ে করাতে চায়। ওই নিজের পকেট থেকে আজ চারশ টাকা দিয়ে গেল আগাম হিসেবে। ও আমার সম্বন্ধে বেশ sentimental বলে মনে হল।'

এর পরের চিঠিতেই (১৪. ১০. ৫৮) 'বাড়ী থেকে পালিয়ে' জনতা পিকচার্সে আজ contract সই করেছি। পঁচাশী হাজার টাকা দেবে। ওতে

ছবিটা হয়ে যাবে। লাহিড়ীদের বাড়ী থেকে একপয়সাও দিতে হবে না। নভেম্বরের মাঝামাঝি সুটিং আরম্ভ হবে।'

২.

যে শিশুমনে ছোটবেলায় একদিন রূপকথার ছবি জেগেছিল, 'বাড়ী থেকে পালিয়ে' ছবির মধ্যে মনে হয় সেই মনের প্রকাশ। এল ডোরাডোর কাহিনী অরিণক নদী, গহন আফ্রিকার জঙ্গল কাঞ্চন কল্পনা করে।

'বাড়ী থেকে পালিয়ে' মহানগরীর যান্ত্রিক জীবনে—"সুখী রাজপুত্রের' গল্প, হরিদাসের কাহিনী…'কোনো এক গলির মোড়ে মাকে দেখা', মাসী, গঙ্গার ওপরে জাহাজ দেখে দূর দেশে যাওয়ার স্বপ্ন।…আবার বাড়ী ফিরে আসা। 'বাড়ীই সবথেকে ভাল।'

কাঞ্চনের স্বপ্ন দেখার দৃশ্য, মায়ের ভূমিকায় পদ্মাদেবীর ও হরিদাসের ভূমিকায় কালীব্যানার্জীর অভিনয়, প্রমোদদার ছেলের কাঞ্চনের ভূমিকায় ও ছোট মেয়েটির অভিনয় ছবিটিকে জীবন্ত করেছিল।

এই একটি মন সবসময়ই ছিল। ছোড়দাকে বোম্বে নিয়ে যাবার পর—পরে আবার কলকাতায় নিয়ে আসা হয়। দুইভাইকে এবার প্রায়ই বলতে শুনেছি—'আমাদের পকেটে সবসময়ই একটা দুষ্টমী লুকিয়ে থাকে।'

'বাড়ী থেকে পালিয়ে' সম্বন্ধে ওঁর নিজের লেখা—শিবরাম চক্রবর্তীর যুদ্ধ-পূর্বোত্তর বাংলা একটা ছবিকে টেনে আনার চেষ্টা করেছি—যুদ্ধ-পরোত্তর বাংলা দেশে। আমি জানিনা কতখানি সফল হয়েছে। তবে মূল বক্তব্যটাকে আমি নিশ্চয়ই বদলে দেবার চেষ্টা করেছিলাম।'

কিন্তু 'বাড়ী থেকে পালিয়ে', ফ্লপ হলো। 'কত অজানারে' শেষ হল না।

'অযান্ত্রিকের' বিমল, 'বাড়ী থেকে পালিয়ে'র 'হরিদাস' কালী ব্যানার্জীকে দেখে আমরা মুগ্ধ ছিলাম। 'কত অজানারে' ছবিতে 'বারওয়েল' সাহেবের অভিনয়ও ছিল নিখুঁত। একদিন সাহেব ধুতি চাদর পরে বাড়ী এসেছেন। **Make up** টা দেওয়া হয়েছিল আমার শ্বশুরমশাইএর। তিনি যেরকম চুল আঁচড়াতেন, গোঁফ যেভাবে পাকিয়ে রাখতেন, অবিকল সেইরকম। অনিল চাটার্জী, উৎপল দত্ত, ছবি বিশ্বাস, অসীমকুমার, গীতা দে ও করুণাদি: সকলের অভিনয়ই মনে পড়ে।

এরপরে এল 'মেঘে ঢাকা তারা'। আগেই লিখেছি 'স্ত্রীর পত্র'র পরে

নাটক করা বন্ধ হয়ে যায়। কিন্তু ঐ সময় থেকে প্রচুর প্রবন্ধ লেখা শুরু হয়। আর সঙ্গীতের প্রতি অনুরাগ ও জ্ঞান বিশেষভাবে মনে পড়ে। প্রতিমাসে প্রচুর বই ও রেকর্ড কেনা হতো।

সবসময়ই একটা কথা শুনতাম 'বইপড়া আমার ধর্ম।' বুদ্ধের ওপরে অনেক বই পড়তে দেখেছি।

অসীম শ্রদ্ধা ছিল বুদ্ধের প্রতি। আর শ্রদ্ধা ছিল বিদ্যাসাগর, এব্রাহাম লিংকন ও লেনিনের প্রতি। নাটক, ফিল্ম ছাড়া প্রচুর বই জমিয়েছিলেন আর্কিয়োলজি-র উপর।

বুদ্ধের সম্বন্ধে কয়েকটি বই

1. Gotama The Buddha : Ananda K. Coomaraswamy & I. B. Horner. 2. Studies in the origins of Buddhism : Govind Chandra Pande. 3. Sacred Books of The Buddhists Vol. XIX. 4. The Mahavastu Vol. III : Translated from the Buddhist Sanskrit. By J. J. Jones.

আর্কিয়োলজি-র ওপরে কয়েকটি বই

1. Dark Age Britain : Edward Thurlow Leeds. 2. The Most Ancient East : Gordon Childe. 3. Piecing Together the Past ; Gordon Childe. 4. The Prehistory of Scotland : Gordon Childe. 5. Archaeology in the U.S.S.R. : Alexander Mongait. 6. The Art of Indian Asia : Heinrich Zimmer. 7. The Personality of India—Pre & Prato-Historic Foundation of India & Pakistan : Bendapudi Subbarao. 8. History Unearthed : Leonard Wooley. 9. The wonder that was India : A.L.Basham. (A survey of the culture of the Indian Sub-Continent before the coming of the Muslims. 10. The Tombs of the Tibetan Kings ; Seric Orientale : Roma Giuseppe Tucci.

কিছু প্রিয় বই

1. The Collected works : C. G. Yung. 2. The Great Mother : An analysis of the Archetype : Erich Neumann.

3. Before Philosophy : H. Frankfort & others. 4. The Outlines of Mythology : Lewisp Sence. 5. The Historical Development of Indian Music : Swami Prajnanananda. 6. The Dance of Shiva : Ananda Coomaraswamy. 7. Play Production : Henning Nelms. 8. A Source Book in Theatrical History : A. M. Nagler. 9. Directing the Play : A source book of stage craft. 10. Method or Madness : Robert Lewis. 11. Practical Make-up for the Stage : T. W. Bamford. 12. Aristophanes.

ফিল্ম—

1. Preface to Film : Raymand Williams & Michael Oppom. 2. Kino : A History of the Russian and Soviet Films. 3. One Viva Mexico : M. Eisenstein. 4. Sergei Prokofiev. 5. Sergei Eisensrem : Notes of a Film Director. 6. Composing for the Films : Hanns Eisler. 7. The Little Fellow—The life and work of Charles Spencer Chaplin. : Peter Catis & Thelma Niklans. 8. Sergei M. Eisenstein : Marie Seton.

নাটক—

1 Bertolt Brecht : Marianne Kesting. 2. The Living Stage : Kenneth Macgowan William Melnity. 3. Stage and Film Decor : R. Myerscough-Walker. 4. Moscow Theatres : V. Komissarzhevsky. 5. Vakhtancov—The School of Stage Art : Nikolai Gorchakov. 6. Parables for the Theater : Bertolt Brecht. 7. Theatre : The Rediscovery of Style ; Michel Saint Denis. 8. Sophocles : The Theban Plays King Oedipus : E. F. Watling. 9. The Technique of Play Production : A. K. Royd. 10. On Actors & The Art of Acting : George Henry Lewes. 11. Staging the Play : Norah Lambourne. 12. Theatre Arts Anthology. 13. Masters of The Drama : John Gassner. 14. Brecht : A Collection of Critical

Essays. Edited by Peter Demety. 15. Stanislavsky : On the Art of the Stage. 16. Ashley Dukes.

রেকর্ডের মধ্যে সবচেয়ে প্রিয় ছিল বীটোফেনের সিম্ফনি। প্রায় সবই ছিল। 5th Sympnony বহু জায়গায় সঙ্গীতের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয়েছে। যুক্তি তক্কো গপ্পোতেও ছিল।

সন্ধ্যার পর কাজকর্ম সেরে বাইরের ঘরে বসে বীয়ার খাচ্ছেন ঘরে রেকর্ড বেজে চলছে Beethoven choral Tchaikovsky.—Swan lake, Sleeping Beauty, Hamlet, Beethoven Violin Concerto. Carnival of the Animals, Nutcracker Suite, Leonara, Moonlight. The Gambler. কখনো Paul Robeson এর Swanee River, Old Folk at home, Poor old Joe, Songs my mother taught me, Trees ইত্যাদি। কিংবা শচীনদেববর্মণ, আব্বাসউদ্দীন বা বিভিন্ন রবীন্দ্রসংগীত।

বই, রেকর্ড, প্রবন্ধলেখা সকাল থেকে রাত পর্যন্ত কাজ। বাড়ীতে একটা পরিবেশ ছিল তখন। জানতাম এমনি করেই জীবন চলবে—আরো বই, আরো রেকর্ড, আরো লেখা—আরো কাজ জীবনকে অনেক বিস্তৃত করবে, উন্নত করবে। যে স্বপ্ন একদিন দেখেছিলাম সফল হবে।

আমি তখন নতুন করে এম. এ. ক্লাস করছি যাদবপুরে। শেষ হয় 'মেঘে ঢাকা তারা'। নানা সময়ের প্রবন্ধ—'মেঘে ঢাকা তারা' সম্পর্কে উনি নিজে লিখছেন :

> "এর নামটাও আমার দেওয়া। 'চেনামুখ' নামে কোন এক জনপ্রিয় কাগজে এ গল্পটা বেরিয়েছিল। এর মধ্যে কোন একটা জিনিষ আমাকে আঘাত করেছিল। তাই Bill শেক্সপীয়রের "The cloud clapped star" এইটে আমার মাথায় এসে দাঁড়িয়েছিল। এবং সম্পূর্ণভাবে ভেঙে আমি এই ছবির Script করি। এটা খানিকটা sentimental হতে পারে, কিন্তু এর মধ্যে থেকেই আমার ছবিতে overtones throw করার ব্যাপারটা আসতে আরম্ভ করে। এইখানে আমি ভারতীয় Mythologyকে ব্যবহার করা শুরু করি। যেটা আমার জীবনের একটা অংশ।
>
> "এখানে আমার উচ্চাকাঙ্ক্ষা অনেক। কারণ একটা Universal theme নিয়ে আমি কাজ করছি। এবং নিজেকে পরিব্যাপ্ত করে করে ফেলার চেষ্টা করেছি আমাদের ঐতিহ্যের মধ্যে। গত সাত-

আটশো বছরের বাংলাদেশে একটা বড়ো মজার ব্যাপার গড়ে উঠেছিল যা একেবারেই বাঙালী। স্মার্তপ্রভাবপুষ্ট বাঙালী সমাজ গৌরীদানেতে পাগল হয়ে উঠেছিল। সেই অষ্টমবর্ষীয় শিশু খেলার আঙিনা ছেড়ে অজানা গাঁয়ের অজানা বাড়ীতে গিয়ে চারিপাশের ভ্রূকুটি কুটিল মুখগুলো দেখে বড়োই ভয় পেতো, বড়োই তার নিজের বাড়ীর জন্য মন কেমন করতো।

এই ব্যথা আমাদের লোককথায় শাশ্বত কালের জন্যে বিধৃত হয়ে আছে। এই কান্না ঝরছে আমাদের আগমনী বিজয়াতে। তাই দুর্গা আমাদের মেয়ে, তাই শরৎ কালে বড়ো মন কেমন করা।

Great Mother archetype এর এই বিচিত্র বহিঃপ্রকাশ।...তাই আমার নীতার জন্মদিন হয় জগদ্ধাত্রী পুজোর দিন। তাই যক্ষ্মার আবিষ্কারের সময় মেনকার বিজয়ার বিলাপোক্তি শোনা যায় 'আয় গো উমা কোলে লই।' নীতা মহাকাল পাহাড়কে জীবনভোর দেখতে চায়, দেখে তখনই যখন মহামিলন ঘনিয়ে আসে, মহাকালরূপী সংহারদেব তাকে আলিঙ্গন দেন সেই পরম অবলুপ্তিতে।"

ছবিটি সকলের মনকে মথিত করে। সঙ্গীতের প্রয়োগও বইটিকে একটি বিশেষ পর্যায়ে নিয়ে যায়। অনিল চ্যাটার্জীর গলায় (এ. টি. কাননের গাওয়া) সুর সাধার সময় বারবার যে ক্লাসিকাল সংগীতের সুর শোনা যায়— সংগীতজ্ঞ হয়ে ফেরার পর সেই সুর সমস্ত পরিণতি নিয়ে মূর্ত হয়ে ওঠেন্ 'লগ পতি পতি' গান। নীতার যক্ষ্মা ধরা পড়ে—সরোদের সুর বাজে তীব্রতম সুরে আর 'যে রাতে মোর দুয়ারগুলি' মনের বেদনাকে প্রকাশ করে সমস্ত ব্যঞ্জনায়।

ছবিটির শেষ দৃশ্যে নীতা বাঁচবে না মারা যাবে, এই নিয়ে একটু মতদ্বৈধ ছিল। তাই শিলং পাহাড়ে দুই রকম ছবি নেওয়া হয়। 'দাদা আমি বাঁচতে চাই' দৃশ্য শিলং পিকে। অন্য দৃশ্য স্প্রেডিকেল ফলসের ধারে।

'মেঘে ঢাকা তারা' মুক্তিলাভ করার পর অনেক চিঠি আসে। বৌধায়ন চট্টোপাধ্যায়ের একটা চিঠি আসে: 'ভগবান আপনার মঙ্গল করুন।' এরপরে বিষ্ণু দে ও প্রণতিদির চিঠি। সবাই এতো খুশী হয়েছিলেন—চিঠিতে তারই উল্লেখ। বৌধায়নবাবু পরে একটা প্রবন্ধ লিখেছিলেন। মণীন্দ্র রায় ও তপতীদিও চিঠি লিখেছিলেন। স্টেটস্‌ম্যান পত্রিকায় একটা চিঠি

পাঠিয়েছিলেন বৌধায়ন চট্টোপাধ্যায়, নৃপেন বন্দোপাধ্যায়, অশোক সেন প্রভৃতি কয়জন মিলে। চিঠিটি ছাপা হয়নি।

এদিকে আবার ঐ সময়ই স্টুডিয়োতে সাধারণ টেকনিসিয়ানদের নিয়ে ইউনিয়ন গড়ার কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন। সে-সময়কার একটি উল্লেখ-যোগ্য প্রবন্ধ বাংলাদেশের চলচ্চিত্রশিল্পের কলাকুশলীদের সম্পর্কে লেখা। বছরের পর বছর টেকনিশিয়ানরা কি সামান্য বেতনে কাজ করে সেটা কল্পনার বাইরে। কোন ভবিষ্যৎ নেই, উন্নতি নেই। অথচ একটি ছবি করতে হাজার হাজার টাকা খরচ হয়। নায়কনায়িকাদের টাকার অঙ্ক বেড়েই চলে। এই চরম দুর্দশা ও দারিদ্র্যের মধ্যে কর্মরত কলা-কুশলীদের সম্বন্ধে লেখা প্রবন্ধটি এখানে উল্লেখ করবার মত :

চলচ্চিত্রশিল্পীদের কলাকুশলীদের সম্পর্কে

"বাংলা দেশের চলচ্চিত্রশিল্পের কলাকুশলীদের কথাটি বলার ভার আমার ওপর পড়েছে। জানিনা আমার কোন্ উপযুক্ততা আপনারা দেখেছেন। সে যাই হোক, আমার দুঃখী ভাইদের হয়ে দুকথা বলার সুযোগ দিয়ে আপনারা আমায় কৃতজ্ঞ করলেন।

বাংলাদেশের কলাকুশলীদের অবস্থা যে ঠিক কতখানি পরিমাণে, কত চরমভাবে খারাপ, তা দেশের লোক জানেন না। আমাদের গ্ল্যামারের পাশেই যে হতাশা আর অবসাদের বাসা, তার একমাত্র তুলনা হতে পারে উজ্জ্বল প্রদীপের তলার নিকষ কালো আঁধারের সঙ্গেই। কলকাতা সহরের মত জায়গায় ষোল বছর এক নাগাড়ে চাকরী করার পরেও একজন সুদক্ষ কলাকুশলী মাসে পঞ্চাশ টাকা মাইনে নিয়ে ছেলেপুলে নিয়ে ঘরসংসার করে হাড়ভাঙ্গা খাটুনী করতে বাধ্য হন। কর্মরত অবস্থায় কর্তৃপক্ষের বিবেচনার দোষে মারা পড়েন যে কলাকুশলী, তাঁর পরিবার না পায় তার কোন ক্ষতিপূরণ না হয় দুর্ঘটনার ন্যায্য বিচার। কত কলাকুশলীদের যে হকের টাকা মারা পড়ে, তার ইয়ত্তা নেই। এসব কথা লিখতে বসলে হাজার হাজার সত্য ঘটনা আমারই অভিজ্ঞতা থেকে আমি খাতার যত পাতা ভরে লিখে যেতে পারি। এবং তার প্রমাণ দরকার হলে উপস্থিত করতেও আমি দ্বিধা করব না।

এবং এই যে আমাদের অবস্থা, তা দিনের পর দিন খারাপই হয়ে

চলেছে। অবস্থা এমন হয়েছে যে, ভাবতে গেলে দম আটকে আসে। আমাদের চোখের সামনে আশার আলোও আজ নেই। এবং এটা তখনই ঘটছে যখন বাংলা ছবি ভারতের মুখ উজ্জ্বল করছে, সংস্কৃতির উন্নতি করছে, দেশবিদেশের মানুষকে তৃপ্ত করছে।

এ-অবস্থা থাকতে পারে না, এবং আমার দৃঢ় বিশ্বাস তা থাকবেও না। দেশের মানুষের দৃষ্টি আমাদের দিকে ফিরবেই।

আমাদের বলা হয়, চিত্রশিল্পের সংকট ঘনীভূত হচ্ছে, এবং তার ফল হিসেবেই এসব কিছু ঘটছে।

আমি বলব, এটা ডাঁহা মিথ্যে কথা। সম্পূর্ণ মিথ্যে কথা। পশ্চিম বাংলা সরকারের হিসেবেই তার প্রমাণ রয়েছে। এই শিল্প থেকে সরকার আমোদকর হিসেবে বার্ষিক আয় করেন চার কোটি টাকা (আজকাল আবার আমোদকর বাড়ানো হয়েছে)। সমস্ত মালিকরা মিলে লাভ করেন পাঁচ কোটি টাকা। যে শিল্প বছরে আয় দেয় নয় কোটি টাকা, এবং যার আয় বছর বছর বেড়েই চলেছে, তার কি ধরনের সংকট হতে পারে, সেটা সহজেই অনুমান করা চলে। সে সংকট হচ্ছে, মানুষের তৈরী। সত্যিকারের সংকট সেটা নয়।

কোন্ মানুষ? চিত্রপ্রদর্শক।

যে যাই বলুন, আমি পরিষ্কার বলব, ছবিগুলোর মালিকরাই হচ্ছেন কেন্দ্রবিন্দু, যাঁরা এই সংকটের জন্ম দিয়েছেন। এবং সর্বপ্রকার অজুহাত দিয়ে সেটিকে টিকিয়ে রেখেছেন। দেখুন, একটা ছবির শতকরা ষাট ভাগেরও বেশী আয় কেড়ে নিয়ে যান প্রদর্শকরা, অথচ এর সমস্ত ক্ষেত্রেই তাঁরা এক পয়সাও ব্যয় করেন না ছবি তৈরী করার জন্য। এমনকি তাঁদের ছবিঘরগুলোও সাজিয়ে দেন প্রযোজকরা। 'হোল্ডওভার' আর 'হাউস্ প্রোটেকশান' বলে দুটি মোক্ষম কথার তাঁরা জন্ম দিয়েছেন, যার বাংলা মানে হচ্ছে,—Head I win, Tail I lose! তাঁদের সাপ্তাহিক লাভের গায়ে (তাঁদের খরচের নয়, তাঁদের ন্যূনতম hundred percent লাভের গায়ে) তাঁরা আঁচড়টি পর্যন্ত লাগাতে দেবেন না।

এই যে কোটি কোটি টাকা তাঁরা নিয়ে যাচ্ছেন এই Industry থেকে, তার এককণাও তাঁরা Industry-তে ফেরত পাঠাবেন না,

এখানে টাকা লগ্নী করবেন না। তাতে নাকি ভীষণ ঝুঁকি। তার বদলে তাঁরা সেই টাকায় Switzerland-এ হাওয়া বদলাতে যাবেন, Mosaic করা প্রাসাদ তুলবেন, মিল-কারখানা করবেন।

একটা Industryর যেটা আয় হয়, তার একটা বড় অংশ যদি নিয়মিত ফিরে এই Industryতেই লগ্নী না হয়, যদি সেটা (অর্থাৎ এই Creamটা) যদি চুঁইয়ে চুঁইয়ে বেরিয়ে যায় একটা ছ্যাদা কুঁজোর জলের মত, তাহলে যে রক্তশূন্যতা দেখা দেবে, এটা যে কোন অর্থ-নীতিবিদ অতি সহজেই বুঝতে পারবেন।

আজকাল এঁরা সব ছবিঘরেই panoramic screen করে তাঁদের রুচির পরিমাণ দেখাচ্ছেন। আচ্ছা বলুনতো, আমাদের কাজ করতে হয় সেই মান্ধাতার আমলের ভাঙ্গা ক্যামেরা দিয়ে, এরকম বিষণ্ণ রসিকতা তাঁরা করছেন কেন ?

এরকম যুক্তিহীন ফ্যাসাদ খুব কমই আছে। হপ্তায় একটা মর্ণিং শো এঁদের থাকে, তার মধ্যে হয়তো দশটা পাঁচটা ছবি Wide screen এর হয়, তার জন্যে তাঁরা এতশত ঘটা করে ছবির পর্দাটাকে ছড়িয়ে দিলেন বেঢপভাবে। আর যেটা রেগুলার ছবি, এই অধমদের কাজ-গুলো, সেটাকে প্রতি হপ্তায় দেখাতে হয় একুশটি বার করে। আর তার প্রত্যেকটিরই হয় ছবির মাথা কাটে, নইলে তলা দেখা যায় না। কারণ ওপরে নিচে নর্মাল Screen-এর বেজায় গরমিল। আপনি নায়কের চোখের তলা থেকে মুখটা দেখছেন, তারপরেই ঝপাস্ করে অপারেটার ফ্রেমটা নামিয়ে ঠোঁট দুটো কেটে চুল পর্যন্ত দেখিয়ে দিল, আর সর্বক্ষণ সংলাপ চলছে। এ ঘটনা হামেশাই ঘটছে।

এই হচ্ছে এঁদের সমস্ত ব্যবহারের একটা প্রতীকী ব্যাপার। আর এই হচ্ছে, আমার মনে পড়ে যায়, আজকালকার প্রায় বীভৎস Star System এর কথা। বাংলাদেশের তেমন জুড়ী একটিই আছেন। এঁরা সমস্ত কলাকুশলীদের বিশটা ছবির পারিশ্রমিক একটা ছবিতেই নিয়ে যান। এঁদের ছাড়া নাকি ছবি চলে না। এই আর একটা ডাঁহা মিথ্যে কথা। এটারও জন্ম দিয়েছেন কিছু সুবিধাবাদী লোক। এবং আজও তাঁরা উচ্চকণ্ঠে সেকথা ঘোষণা করতে কুণ্ঠিত হচ্ছেন না। কিন্তু এই কথা যদি সত্যি হয়, তাহলে একনিশ্বাসে আমি এত ছবির নাম

করে যেতে পারি, যার একটাতেও এই কামধেনু ত্রুটি নেই। আপনারা কখনও হিসেব করে দেখেছেন, যতগুলি Golden Jubilee ছবি গত কয় বছরে হয়েছে (যেমন রাণী রাসমণি, ক্ষুধিত পাষাণ, শেষ-পর্যন্ত, মায়ামৃগ, এবং আরো), তার কয়টিতে এই ত্রুটি দেখা গেছে ?

অথচ এঁদের গ্ল্যামার তৈরী করি আমরাই। আমার ঐ আধপেটা খাওয়া Electrician যদি ঠিক মত আলোটা না দিত, আর আমার পরিচালক যদি ঠিকমত তাঁকে ব্যবহার না করতেন, এবং আমি যদি ঠিকভাবে তার মুখখানা না তুলতাম—তবে তার মুখখানিতে যে ঐ Glamour-এর এক কণাও থাকত না।

আমি বিশ্বাস করি, পরিচালকই হচ্ছেন সব। তিনিই আমাদের চালক, তিনিই আমাদের তৈরী করেন। তিনি অভিনেতা অভিনেত্রীকে যেমন প্রতিষ্ঠিত করেন, ঠিক তেমনি আমাদের কলাকুশলীকেও তাঁদের সুযোগ দেন। তৈরী করে নেন। ছবির স্রষ্টা হচ্ছেন পরিচালক। তাঁর প্রতি শ্রদ্ধার বদলে কিছু অভিনেতা অভিনেত্রীকে নিয়ে নাচানাচি শুধু অজ্ঞতার পরিচায়ক নয়। রীতিমত পীড়াদায়ক।

সবশেষে আমি একটা অনুযোগ করব। আমি সে অনুযোগ করব আমাদের কল্যাণরাষ্ট্রের কর্ণধারদের কাছে।

তাঁদের জানা দরকার, যে সব ছবি আজ বাইরে ভারতের মুখোজ্জ্বল করছে, সেগুলো তৈরী হচ্ছে কেমনভাবে। তাঁদের অনুরোধ করব, আমাদের স্টুডিও ল্যাবরেটরীগুলো তাঁরা এসে দেখে যান।

দেখে যান দুটো কারণে। দেখুন আমরা কি ভোজবাজী করছি কি জিনিষ দিয়ে। যে সব লক্কড় যন্ত্রপাতি দিয়ে আমরা সোনা ফলাচ্ছি,—বিদেশের কথা দূরস্থান বোম্বে মাদ্রাজের কলাকুশলীরাও এগুলো দেখলে আঁতকে উঠত। ছুঁতেই সাহস পেত না।

দ্বিতীয় কারণটা হচ্ছে, তাঁরা দেখুন কাকে বলে প্রদীপের তলায় অন্ধকার। তাঁরা ছবিঘরগুলোর ঝকঝকে তকতকে চেহারা দেখছেন,—একবার এসে পরিদর্শন করে যান আমাদের বাংলা স্টুডিও-গুলোর ছেঁড়াচট, অস্বাস্থ্যকর ফ্লোর, আর দারিদ্র্যপূর্ণ আমাদের কুশ্রী চেহারাগুলো।

তখন বুঝবেন, বাংলার ছেলেরা অসাধ্যসাধন আজও করছে।

তাঁরা যে চারকোটি টাকা শুধু তুলে নিয়ে যাচ্ছেন, তার একটা অংশও কি তাঁরা আমাদের, আমাদের Industry-র এবং আমাদের আর্টের উন্নতির জন্যে লাগাতে পারেন না ?

তাঁদের অনেক জ্ঞানগম্যি আছে, আমার তা নেই। তাঁরা কি পারেন না নতুন যন্ত্রপাতি আমদানি করে আমাদের প্রযোজক-স্টুডিও মালিকদের হাতে তুলে দিতে? (অবশ্য ধার হিসাবে।) তাঁরা কি এইসব কলাকুশলীদের Co-operative করে টাকা দিতে পারেন না প্রামাণ্য তথ্যচিত্র করার জন্য, এমনকি Feature Film করার জন্য ? তাঁরা কি আমাদের Welfare এর জন্য ব্যবস্থা করতে পারেন না, হাসপাতালের বেড্ দেওয়া থেকে আরম্ভ করে Dearness allowance দেওয়ার মধ্যে দিয়ে ?

আমার মনে হয়, তাঁরা সবই পারেন। তাঁরা এই ছবিঘরের মালিক-দের অন্যায় শোষণ থেকে আমাদের ছবিকে মুক্তি দিতে পারেন। তাঁরা এইসব রাঘববোয়াল Starদের কালোটাকা নেওয়া বন্ধ করতে পারেন। তাঁরা চাকরীর সুযোগ আমাদের বাড়িয়ে দিতে পারেন।

আমি বিশ্বাস করি, তাঁরা এগুলো করবেন। এবং তার মধ্যে দিয়ে দেশের মানুষের কল্যাণকর ছবি দেখার সুযোগ আরো বাড়িয়ে দেবেন এবং বিদেশে আমাদের মাথা আরো উঁচু করে দেবেন।

আমরা মরে আছি। তাঁরা আমাদের বাঁচাবেন।”

যতটুকু মনে পড়ে, এই সময়ই ‘গ্যালিলিও চরিত’ নাটকটি অনুবাদ করা হয়। নাটকটি সুনীল দত্ত ছাপিয়েছিলেন। তাতে একটি ছোট ভূমিকা আছে। আর একটি ভূমিকা ব্রেখট্ সম্বন্ধে লেখা হয়েছিল।

৩.

সমস্ত দিক থেকে ব্যাপক, কর্মময় এই জীবনের মধ্যেই শুরু হয় ‘কোমল গান্ধার’।

প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত ছবিটির পটভূমিতে গভীরতম এক দেশপ্রেমের সুর ধ্বনিত হচ্ছে। অভিনেতা-অভিনেত্রীদের মুখে বারবার শোনা যায় ভারতীয় গণনাট্য সংঘের নবজীবনের গান। লোকসংগীতের সুর পদ্মার চরে।

বাইরে শো করতে গিয়ে একজন ছেলেহারানো মা তাঁর মৃত ছেলের একটি মেডেল নায়ককে দেন ও মুকুন্দদাসের কথা বলেন।

অনস্য়ার মার কথা বলার সময় আবহসংগীতের সুরে মূর্ত হয়ে ওঠে একটি করুণ দেশপ্রেমের সুর।

ভৃগুকে আক্রমণ করার পর যখন নায়ককে একা রেখে একে একে সবাই চলে যায়—তখন গগন নিয়ে আসে নতুন নাটক :

'এত ভঙ্গ বঙ্গদেশ তবু রঙ্গে ভরা।'

ঈশ্বর গুপ্তের কবিতা। নাটকটির শোএর আগে ভৃগু অনস্য়াকে দেশপ্রেমের কথা বলে উদ্বুদ্ধ করছে। সেদিন ছিল শিক্ষক ধর্মঘট। শিক্ষকরা রাস্তায় বসে আছেন। একজন কর্মী আসে অনস্য়ার কাছে টাকা চাইতে। একটি ছোট ছেলে অনস্য়ার আঁচল টেনে ধরে। 'দিদি পয়সা দেনা'। অনস্য়া বাংলাদেশের প্রতীক, শকুন্তলার প্রতীক।

'কোমল গান্ধার প্রসঙ্গে' প্রবন্ধে লিখেছেন :

> "পতিগৃহে যাত্রাকালে শকুন্তলাকে তার বহু পরিচিত জগৎ, ঐ আজন্ম বাসভূমি আশ্রম থেকে নিজেকে ছিন্ন করে নিতে হয়েছিল।
>
> বাংলাদেশের শকুন্তলার প্রতিমূর্তি এ ছবির নায়িকা, আর একালের যুবচিত্তে যে বিক্ষোভের প্রসার, তারই প্রকাশ নায়কের চরিত্রে, সে সম্পূর্ণ সুস্থও নয়, প্রকৃতিস্থও নয়, অবদমিত, কিছুটা বিকারগ্রস্ত।
>
> রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব ও সংঘর্ষ, দীনমলিন নাট্য-আন্দোলন ও দলাদলির প্রায় বাস্তবানুগ চিত্রায়ণ ও তৎসমান্তরাল কৌতুকাবহ প্রেমাখ্যান এ সমস্তই পরিকল্পিত ও সন্নিবেশিত হয়েছে মূল পরিকল্পনা অনুসারে—রূপকগুলিকে সমৃদ্ধ করবার উদ্দেশ্যে। একটি বাস্তবধৃত, বহুবিষয়-সমন্বিত জটিল নক্সা (pattern) প্রস্তুত করাই ছিল অভিপ্রেত।"

'মানবসমাজ, আমাদের ঐতিহ্য' প্রবন্ধে :

> "কোমল গান্ধার। শকুন্তলা বাংলাদেশে পরিণত হয় আমার কাছে। রবিঠাকুরের সেই আশ্চর্যসুন্দর প্রবন্ধটি শকুন্তলা এবং মিরাণ্ডার অপূর্ব তুলনা যেখানে রয়েছে, সেটি আমাকে প্রভাবিত করে। চারপাশের যে দ্বিধা, যে ভাঙন আমি জানি—তার মূল হচ্ছে ভাঙা-বাংলা। পূর্ববাংলার লোক বলে একথা মনে করিনা। গোটা বাংলার

ঐতিহ্যটা আয়ত্ত করার চেষ্টা করি বলেই একথা জানি যে, দুই বাংলার মিলন অবশ্যম্ভাবী। তার রাজনৈতিক তাৎপর্য আমার হিসাব করার কথা নয়, কিন্তু সাংস্কৃতিক মূল্য আমার কাছে অবধারিত।

তাই কোমল গান্ধারের মূল সুর হচ্ছে মিলনের। স্তরের ওপর স্তর দিয়ে, রূপকের ওপর রূপক চাপিয়ে, বিদ্যুতের ঝিলিকের মতো যদি কোথাও সেই জীবনসত্যটিকে ছুঁতে পারি সেই চেষ্টাই করেছিলাম।"

'চলচ্চিত্র চিন্তা' প্রবন্ধে :

["কোমল গান্ধার। এখানে আমার সমস্যা কাহিনীর তিনস্তরের বিবরণ। আমি অনসূয়ার দ্বিধাবিভক্ত মন, বাংলার গণনাট্য আন্দোলনের দ্বিধাগ্রস্ত নেতৃত্ব এবং দ্বিধাবিভক্ত বাংলাদেশের মর্মবেদনা, তিনটিকেই একত্রে টানতে চেয়েছিলাম। শব্দের দিক থেকে বহুশত শতাব্দীর সুরকথাকে মিলিয়ে ছবির ওপরে নতুন দ্যোতনা অভিনিবিষ্ট করতে চেষ্টা করেছিলাম। Archetypally, এদের বিরোধী হচ্ছে বিবাহ, মিলন। 'আমের তলায় ঝামুর ঝুমুর কলাতলায় বিয়া। আইলেনগো সোন্দরীর জামাই মটুক মাথায় দিয়া॥ মিস্ত্রী বানাইছে পীড়ি চাইরকোণা তুলিয়া। ব্রাহ্মণে চিত্রাইছে পীড়ি মধ্যে সোনা দিয়া। আইজ হইব সীতার বিয়া॥

এই গানগুলির ব্যবহারের পিছনে একটি চিন্তার্থ ছিল তা হচ্ছে মিলনের ভাবখানি, যা অবশ্যম্ভাবী। 'নাম রেখেছি কোমল গান্ধার মনে মনে' রবিঠাকুর বলে গেছেন। বিষ্ণু দে তাকে নিয়ে এগিয়ে গেছেন বাংলাদেশেতে। আমি সেইখান থেকে শুরু করেছিলাম।"]

এই দেশপ্রেম ও মিলনের সুরে 'কোমল গান্ধার' বড়ো পবিত্র ছবি। কিন্তু দর্শকের আনুকূল্য লাভ না করায় যে আঘাত আসে, সমস্ত জীবনটাকে তা ছিন্নভিন্ন করে দিল।

British Film Institute এর ডিরেক্টর James Quinn এর সঙ্গে এই সময় 'অযান্ত্রিক' নিয়ে কথাবার্তা হয়। ছবিটি লণ্ডনে পাঠানো হয়। কিন্তু ফেরৎ আসে। James Quinn চিঠিতে জানান :

December 15, 1961.

Dear Mr. Ghatak,

Thank you for your letter of November 10. I am sorry for the delay in replying to it. We considered carefully the possibility of including "Ajaantrik" in the London Film Festival, but owing to pressure on screen time I am afraid we were not able to do so. We do, however, like your film and should it prove possible to arrange an Indian Film Season at the National Film Theatre at some future date, we would like to include "Ajaantrik."

For the record, you will wish to know that your Film was despatched by the Institute on November 9 and should reach you very shortly, if it has not already arrived.

With kind regards,

Yours sincerely,
James Quinn.
Director.

৪.

এত কিছুর পর এবার শুরু হলো 'সুবর্ণরেখা'। এই ছবিটির কথা মনে হলেই 'আমার ছবি' প্রবন্ধটির কথা মনে পড়ে :

'আমরা এক বিড়ম্বিতকালে জন্মেছি। আমাদের বাল্যকাল বা আমাদের কিশোর বয়স যে সময় কাটে সে সময় দেখেছি বাংলার পরিপূর্ণ রূপ। রবীন্দ্রনাথ তাঁর দিগ্বিজয়ী প্রতিভায় সাহিত্যকীর্তির তুঙ্গে অবস্থান করছেন। কল্লোলগোষ্ঠীর সাহিত্যকর্মে বাংলা সাহিত্য নব-বিকশিত। স্কুলকলেজ ও যুবসমাজে জাতীয় আন্দোলন পূর্ণ-প্রসারী।

রূপকথা, পাঁচালী আর বারোমাসের তেরোপার্বণের গ্রামবাংলা নবজীবনের আশায় থৈ থৈ করছে। এমন সময় এলো যুদ্ধ, এলো

মন্বন্তর, মুসলীম লীগ আর কংগ্রেসরা দেশের সর্বনাশ ঘটিয়ে দেশটিকে টুকরো করে দিয়ে আদায় করল ভগ্নস্বাধীনতা। সাম্প্রদায়িক দাংগার বন্যা ছুটলো চারদিকে। গঙ্গা পদ্মার জল ভাইয়ের রক্তে লাল হয়ে গেল। এ আমাদের নিজের চোখে দেখা অভিজ্ঞতা। আমাদের স্বপ্ন গেল বিলীন হয়ে। আমরা এক লক্ষ্মীছাড়া জীর্ণ বাংলাকে আঁকড়ে ধরে মুখ থুবড়ে পড়ে রইলাম। এ কোন্ বাংলা, যেখানে দারিদ্র্য আর নীতিহীনতা আমাদের নিত্যসঙ্গী, যেখানে কালোবাজারী আর অসৎ রাজনৈতিকের রাজত্ব, যেখানে বিভীষিকা আর দুঃখ মানুষের নিয়তি।

আমি যে কটি ছবিই শেষের দিকে করেছি, কল্পনায় ও ভাবে এই বিষয় থেকে মুক্ত হতে পারিনি। আমার সবচেয়ে যেটা জরুরী বলে বোধ হয়েছে সেটা এই বিভক্ত বাংলার জরাজীর্ণ চেহারাটাকে লোক-চক্ষে উপস্থিত করা, বাঙালীকে নিজেদের অস্তিত্ব, নিজেদের অতীত ও ভবিষ্যৎ সম্পর্কে সচেতন করে দেওয়ার প্রয়োজনীয়তা। শিল্পী হিসাবে সর্বদাই সৎ থাকতে চেষ্টা করেছি, কতটুকু কৃতকার্য তা ভবিষ্যৎ উত্তরাধিকারীরাই বলবে।

'মেঘে ঢাকা তারা' আর 'কোমল গান্ধার' করার পর 'সুবর্ণরেখা' ছবিতে হাত দিই।...যে কটি পাঁচিল অতিক্রম করে এই ছবি করতে হল সে প্রসঙ্গ বাদ দেওয়া যাক।...

'সুবর্ণরেখা' ছবিতে যদি অভিরাম আর সীতা, হরপ্রসাদ আর ঈশ্বরের সমস্যাকে যথাযথ মূর্ত করে ধরতে পারি তবে অভিরামের মায়ের মৃত্যু, পতিতালয়ে ঈশ্বরের সীতাকে আবিষ্কার প্রভৃতি ঘটনাকে খুব অসম্ভব বলে ঠেকবে না।

বিভক্ত জরাজীর্ণ বাংলার যে রূপ আমরা প্রত্যক্ষ করছি দিনের পর দিন, তার ঐ পতিতালয়ে সীতার মতই দশা। আর আমরা অবিভক্ত বঙ্গের বাসিন্দেরা যেন উন্মত্ত নিশাযাপনের পর আচ্ছন্নদৃষ্টি বেঁচে আছি।"

'সুবর্ণরেখা প্রসঙ্গে' প্রবন্ধে :

"প্রত্যক্ষভাবে 'সুবর্ণরেখা' ছবিতে উপস্থাপিত সংকট উদ্বাস্তুসমস্যাকে অবলম্বন করে আছে। কিন্তু 'উদ্বাস্তু' বা 'বাস্তুহারা' বলতে এ ছবিতে কেবল পূর্ববঙ্গের বাস্তুহারাদেরই বোঝাচ্ছে না—ঐ কথাটির সাহায্যে

আমি অন্যতর ব্যঞ্জনা দিতে চেয়েছি। আমাদের দিনে আমরা সকলেই জীবনের মূল হারিয়ে বাস্তহারা হয়ে আছি এটাও আমার বক্তব্য। 'বাস্তহারা' কথাটিকে এইভাবে বিশেষ ভৌগোলিক স্তর থেকে সামান্য স্তরে উন্নতি করাই অম্বিষ্ট, ছবিতে হরপ্রসাদের মুখের সংলাপে, (আমরা 'বায়ুভূত, নিরালম্ব') কিংবা ছবির প্রথমেই এসে একজন কর্মচারীর মুখে, 'উদ্বাস্ত ! কে উদ্বাস্ত নয়?' এই কথায় সেই ইঙ্গিতই দেওয়া হয়েছে।…

'সুবর্ণরেখা'কে আমি ক্রনিকল্ প্লের ভঙ্গিতে ধরার চেষ্টা করেছি। পরিচয়লিপি থেকেই তার ইঙ্গিত দেবার চেষ্টা করেছি। এ-ধরনের ক্রনিকলের যা রীতিনীতি হওয়া উচিত সেগুলোকে বজায় রেখে মাঝে মাঝে লেখা এনেছি।…

এ ছবি করতে গিয়ে একটা স্তরে রবীন্দ্রনাথের 'শিশুতীর্থ' আমাকে ভীষণভাবে প্রভাবিত করেছিল। সেটা শুধু শেষে গিয়ে দুটো লাইন জুড়ে দেবার ব্যাপার নয়। গোটা ছবিময় গোড়া থেকে টুকরো টুকরো সংলাপে, কিছু কিছু সংগীতের ব্যবহারে, কিছু কিছু ঘটনার সংস্থাপনে 'শিশুতীর্থ' অনিবার্যভাবেই এসে পড়েছে। এবং সেই-জন্যই শেষের তিনটি লাইনও অনিবার্য। ওটা নিরাশারও নয়, অবক্ষয়েরও নয়।

আর ভাল করে অনুধাবন করতে বলি ছবিতে ব্যবহৃত বেদ ও উপ-নিষদের শ্লোকগুলি। অনেক ভেবে, অনেক বাছাই করে ঐ কটিকে আমি গ্রহণ করেছিলাম। তাদের প্রত্যেকটির বিশেষ ব্যঞ্জনা আছে এবং আমার অর্থ প্রকাশের পক্ষে তারা খুবই সাহায্য করেছে।"

'চলচ্চিত্র সাহিত্য ও আমার ছবি' প্রবন্ধেও আছে :

"এটা বুঝতে হলে খানিকটা পরিমাণে উপনিষদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে হয়। আমি যে শেষ করেছি 'চরৈবেতি' মন্ত্রের ওপরে এটাকে বুঝতে ভারতীয় দর্শনের সঙ্গে খানিকটা যোগাযোগ রাখা দরকার।"

'চলচ্চিত্র চিন্তা' প্রবন্ধে আছে আর্কিটাইপাল ইমেজের কথা :

"একটি শিশুমেয়ে তার দ্যোতনাময় নামটি হচ্ছে সীতা, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের এক প্রলয়ক্ষেত্রের মধ্যে পরমানন্দে হাততালি দিয়ে গেয়ে বেড়াচ্ছে। হঠাৎ তার সম্মুখে এসে দাঁড়ালো কালীমূর্তি the terrible

Mother। মেয়েটি গেল ভয় খেয়ে। এরপরে প্রকাশ পেল ওটি ছিল একটি বহুরূপী।...সুদূর অতীত থেকে যে archetypal image আমাদের haunt করছে সে আজকে দৃঢ় পায়ে সারা জগতে পাক খেয়ে বেড়াচ্ছে, তার নাম Hydrogen bomb, তার নাম Strategic Air Command, তার নাম হয়তো বা De Gaulle হয়তো বা Adeneur হয়তো বা উল্লেখ করা চলেনা এমন কোন নাম। পরম বিধ্বংসী এই যে সংহার শক্তি, আমরা ঐ ছোট্ট সীতার মতন হয়তো তার সামনেই পড়ে গেছি।...খালি মনে হয়েছিল এক মহাপ্রলয়ের মূক সাক্ষীর পর দাঁড়িয়ে এত আনন্দ ভালো না। এত সরলতা ভালো না। ধাক্কা দরকার।" ১)

ছোট্ট সীতা আমাদের চোখের সামনে ভেসে ওঠে।...উদ্বাস্তু কলোনী, সীতার নতুন বাড়ীতে যাওয়ার ইচ্ছা। ঈশ্বরের চাকরী। সুবর্ণরেখা নদীর ধারে এসে অভিরাম ও সীতার আনন্দ। ভাঙ্গা এরোড্রামের বিস্তীর্ণ রানওয়ের ওপর দুটি সরল শিশুর দৌড়োনো, কথা! দৃশ্যটি অবিস্মরণীয়!

অভিরাম ও সীতা বড়ো হয়।...সীতার গান শালবনে, বাড়ীতে, ভাঙা এরোড্রোমের ওপর।...অভিরাম বাগ্দীছেলে জেনে ঈশ্বরের বিরূপতা—সীতা মিথ্যা সহ্য করে না। বিবাহের রাত্রির দৃশ্য। সীতা অভিরামের সঙ্গে চলে আসে। বিবাহের মুকুট ভেসে চলে নদীর জলে।...

অভিরামের চাকরী হয় না। চেষ্টা করে বাড়ীটা বদলাবার। সীতার ছেলেও নতুন বাড়ীর স্বপ্ন দেখে। মায়ের মুখে গান শোনে 'আজ ধানের ক্ষেতে রৌদ্রছায়ায় লুকোচুরি খেলা।' অভিরামের দুর্ঘটনা—সীতার পড়ে যাওয়ার দৃশ্য।......মহাপ্রলয়ের পর বীনু মামার সঙ্গে সুবর্ণরেখা নদীর ধারে এসে ছুটে চলে ধানের ক্ষেত দেখে নতুন বাড়ীর দিকে।......

এরই মাঝে হরপ্রসাদের কথা—উত্তিষ্ঠত জাগ্রত। প্রাপ্য বরান্ নিবোধত ক্ষুরস্য ধারা নিশিতা দুরত্যয়া দুর্গং পথস্তৎ কবয়ো বদন্তি।...... এটম বোমা দেখে নাই। যুদ্ধ দেখে নাই। মন্বন্তর দেখে নাই। দাঙ্গা দেখে নাই। দেশভাগ দেখে নাই। অকারণ সেই পুরাতন সূর্যবন্দনা মন্ত্র ওঁ ভূর্ভবঃ স্বঃ তৎ সবিতুর্বরেণ্যং ভর্গো দেবস্য ধীমহি ধিয়োয়োনঃ প্রচোদয়াৎ ওঁ। তারপর কি আছে?'

অন্তর্জলী কর, অন্তর্জলী কর।......তারপর থাকবে কেবল মধুবাতা

ঋতায়তে। মধু ক্ষরন্তি সিন্ধবঃ। শান্তি শান্তি। ক্রতো স্মর কৃতং স্মর ক্রতো স্মর কৃতং স্মর।

সমস্ত ছবিটি একটি কবিতা। পুরোনো পুঁথির পাতায় লেখা দিয়ে শুরু হয়, শেষ হয় জয় হোক মানুষের, ঐ নবজাতকের, চিরজীবিতের।

কিন্তু জানা গেল যে ছবিটি মুক্তিলাভ করবে না। একটি কথা এর পর থেকেই বারবারই শুনেছি, 'লক্ষ্মী আমি মারা যাব।' 'আর দুই বছর', কখনো 'একবছর।' 'আমাকে আরো কষ্ট পেতে হবে।'—আমার চেতনা প্রায় লুপ্ত হবার মতো হতো। কিন্তু কি করবো? কথাগুলো তো শুনতেই হবে।

এতো অস্বাভাবিকতার সম্মুখীন হতে হবে জীবনে কোনদিন কি ভেবেছি? মার মৃত্যু ও একটির পর একটি ঘটনা জীবনকে অস্বাভাবিক থেকে আরো অস্বাভাবিকতারই দিকে এগিয়ে নিয়ে চলে।

৫.

আলাউদ্দীন খাঁকে নিয়ে ডকুমেণ্টারিটি করবার জন্য মাইহার যাওয়া আমার জীবনে একটি পবিত্র স্মৃতি। বাবা ও অন্নপূর্ণাদিদিকে কোনদিন ভুলব না। ছবিটির জন্য একটি স্ক্রিপট লেখা হয়েছিল। বাবার মেজাজ বুঝেবুঝে ছবি নেওয়া হয়। শেষ করতে পারলে অনবদ্য হতো।

গ্যারাণ্টর-এর অভাবে আরণ্যক এফ. এফ. সি অনুমোদন করেনি। সিনোপ্‌সিসটা এখনো মনে পড়ে। কলকাতার জনাকীর্ণ রাস্তায় দেখা যায় একটি মহিষকে। কি অনাদর ও দুর্দশা!……দৃশ্যটি মিলিয়ে যায়—ভেসে ওঠে লবটুলিয়া ও নাড়াবইহারের জঙ্গল—দাঁড়িয়ে আছে মহিষের দেবতা টাবরাঁড়ো—বিরাট মাথা উঁচু করে।……

অবস্থা আরো খারাপের দিকে চলল। বোম্বেতে কিছু কাজের কথাবার্তা হয়েছিল। সেই সমস্ত কাজকর্মের চেষ্টার জন্য ও প্রতীক্ষায় বোম্বে কিছুদিন থাকতে হয়েছিল। ছোট্ট ছেলে ও দুটি মেয়েকে নিয়ে প্রতীক্ষায় আমার দিন কাটছে। এমন সময় পেলাম একটা চিঠি:

> খোকাবাবার নাম রেখেছি—ঋতবান্। চলন্তিকা দেখে নিও। কথাটার মানে 'ধার্মিক'। আশাকরি নামটা তোমার ভাল লাগবে।…

অন্নপ্রাশনের ঘটা আমি গেলে যে করে হোক করব। এখন যদি পৌঁছতে না পারি ছোটখাটোভাবে করতে পার কিনা দেখ।

এরপরে যে ভোজপুরী গল্পটি করার ঠিক হয় সেই গল্পটির ব্যাপারে বছরের শেষের দিকে আবার কিছুদিন বোম্বে থাকতে হয়েছিল। তখন একটা চিঠি পাই :

> এখানে এসে অবধি দম ফেলার অবকাশ পাচ্ছিনা। তার ওপরে ভোজপুরীর টাকার লোক এখনো আসে নি। ২/৩ দিন পরে আসবে।…যাক্ সব ভালই চলছে। রবিশংকর দারুণ সুর করেছে। একটা ঘুমপাড়ানী গান—'সোনা ছেলে, ভাল ছেলে, আর কেঁদোনা।/ পরীরাণী আসবে 'খনি॥' শুনলেই আমার ছেলের কথা মনে পড়ে। এবার Tape করে নিয়ে আসব।

ফিরে এসে এই গান রোজ ছেলেকে গেয়ে শোনাতেন আর বাইরে নিয়ে গিয়ে পায়রা দেখাতেন রোজ সকালবেলা।

…শুরু হলো 'বগলার বঙ্গদর্শন।' গল্পটি হাসির এবং খুব সুন্দর। আমরা প্রতীক্ষা করছিলাম কবে ছবিটা শেষ হবে। ছবিটিতে কাঞ্চনের ভূমিকায় অভিনয় করবার জন্য বোম্বে থেকে আনা হয়েছিল ইন্দ্রাণী মুখার্জীকে। নায়কের ভূমিকার জন্য আসানসোল থেকে সুনীলকে। তখন মদের মাত্রা অসম্ভব বেড়ে গেছে। গোপাল একটি ভ্যানে মদ সাজিয়ে বা ঠিক করে রেখে দিত। প্রতিটি শট্-এর কম্পোজিশন করে আসার পর একটুখানি খাওয়া হতো। কিন্তু এর মধ্যেও যতটুকু কাজ হয়েছিল, এখনও মনে পড়ে, খুবই ভাল।

একদিন সকালে সুটিং হচ্ছে ইন্দ্রাণীকে নিয়ে। একটি গাছের নীচে শিউলিফুল ঝরে পড়ছে। ইন্দ্রাণীকে পরানো হয়েছে একটি চওড়া লালপাড়-শাড়ী, কপালে বড়ো লালটিপ। পায়ে নূপুর। ইন্দ্রাণী গাছের নীচে লাফাচ্ছে। শিউলিফুল ঝরে পড়ছে, উজ্জ্বল লাগছে কপালের টিপ।

এই দৃশ্যটি বা কাঞ্চনের এই চেহারাটি কিভাবে ছবিতে লাগানো হতো জানিনা, কিন্তু ছবিটির কথা ভাবলেই মনে হয় এই মূর্তিটি নিশ্চয়ই ছবিতে একটি বিশেষ রূপের ইঙ্গিত সৃষ্টি করতো।

একটি সেটএর কাজ শেষ হয়ে দ্বিতীয় সেট পড়েছে, জহর রায় পরিবেশক ঠিক করবেন ঠিক ছিল। কিন্তু ঠিক না হওয়ায় আর কাজ হয়নি। পুজোর ছুটি আরম্ভ হয়। রমণ মহেশ্বরী গৌরীপুর যাবার টিকিট

কেটে দেন। আমি ছেলেমেয়েদের নিয়ে যাই শিমুলতলা। আমার শরীর তখন খুবই খারাপ।

গৌরীপুর যাবার অনেকদিন থেকেই ইচ্ছে ছিল। ওখানে প্রমথেশ বড়ুয়ার বাড়ী। প্রমথেশ বড়ুয়ার ভাই প্রকৃতিশ বড়ুয়া (প্রতিমা বড়ুয়ার বাবা) বা লালজী আছেন।

হাতীধরার ওপরে একটি ছবি করার ব্যাপারে লালজীর সঙ্গে সমস্ত আলাপ আলোচনা হয়। একটি গল্পও তৈরী হয়। ইন্দ্রাণী মুখার্জী ও সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়কে নিয়ে ছবিটি করার ইচ্ছে ছিল।

বহুদিন বাইরের ঘরে বসে অনেক আলোচনা হয়। ছবিটি কেন হলনা এখন ঠিক মনে নেই।

তবে বহু পরিকল্পনাই তো কার্যকরী হয়নি। যেমন—আরণ্যক, এই হাতীধরার গল্প ও জসীমউদ্দীনের নকশী কাঁথার মাঠ। 'নকশীকাঁথার মাঠ' করবারও খুব ইচ্ছে ছিল। নাচের কোরিওগ্রাফী করবার কথা ছিল উদয়শংকর-এর। এই বইটি সম্বন্ধেও বহু আলোচনা হয়েছে। কেন হলনা, কেন সমস্ত পরিকল্পনা ব্যর্থ হল, জীবন হতাশায় ভরে গেল, মদের মাত্রা বেড়ে গেল—শিমুলতলায় গিয়ে ভাবতাম। আমি তখন পিঠের শিরদাঁড়ার ব্যথায় অসুস্থ। ওষুধ, ইনজেকশন চলছে। গৌরীপুর থেকে শিমুলতলা এসে শুধু মহুয়া খাওয়া চলছিল। ফিরে এসে আর বগলার বঙ্গদর্শন শেষ হল না। এই ছবিটির জন্য কয়টি গান টেকিং করা হয়েছিল। যেমন 'আমার অঙ্গে অঙ্গে...' আরতির গলায়, আর 'আমার মাহুত বন্ধুরে' প্রতিমা বড়ুয়ার গলায়। গান টেকিংএর সময় কোন কোন যন্ত্র বাজবে, কিভাবে বাজবে, কতক্ষণ বাজবে, সব বারবার বলে দিতে দেখতাম। সংগীত-পরিচালক হবার কথা ছিল হৃদয়রঞ্জন কুশারীর।

ঐ দুটি গানই খুব পছন্দ হয়েছিল। কিন্তু দেখা দিতে থাকে অ্যালকোহলিক ইনস্যানিটি। চরম অস্বাভাবিক অবস্থা। দিনেরাত্রে যখন তখন টেপরেকর্ডারে ঐ গানগুলো শোনা হতো।

ভেবেছিলাম ছেলের জন্মের পরে একটি বড়ো ফ্ল্যাট ভাড়া করা হবে, কাজকর্ম ঠিকমতো করে জীবনটা সুন্দর হবে। কিন্তু মাথা ঠিক হল না। অসমাপ্ত হয়ে রইলো কাজকর্ম।

৬.

কিন্তু এর মধ্যেও, ঐ সালেও, অনেক প্রবন্ধ লেখা হয়েছে।

'মানব সমাজ, আমাদের ঐতিহ্য, ছবিকরা ও আমার প্রচেষ্টা' এই প্রবন্ধটিতে লিখছেন :

"এইখানটিতে পুজো-আর্চার সঙ্গে ব্যাপারটির বেজায় মিল। এর প্রাথমিক স্তরে আছে—দেবতার সঙ্গে সাংসারিকের লেনদেনের কারবার। একেবারে গভীরে গিয়ে সেই অনির্বচনীয়।

এই যে গভীরতম দিকটি, এর স্বরূপ বুঝতে Comparative mythology আমাদের প্রচুর সাহায্য করে। শুধু সিনেমায় নয়, সর্বকালের সব শিল্পেই।...

এবং এই mythology দেখায় যে সমস্ত সভ্যতার ইতিহাস দুই রকম মানবচেতনার সংঘর্ষের ইতিহাস। এক হচ্ছে কর্মযোগীদের চেতনা, আর এক ভাবুকদের চেতনা। এই ভাবুকই কবি, শিল্পী Shaman, medicine man, ঋষি এবং মন্ত্রদ্রষ্টা।

এই tender minded-রাই অশান্ত, চঞ্চল এবং এদের মধ্যেই archetype দ্যুতিময়ভাবে খেলা করতে থাকে। অর্থাৎ প্রকাশমান হয়। যেমন ধরুন না – এই archetypeটি : প্রথম মানুষের যে শিল্প-কলার নিদর্শন আমরা পাই, তা হচ্ছে প্যালিওলিথিক যুগের, স্পেন ও ফ্রান্সের মধ্যবর্তী পিরেনিজ পর্বতমালার গভীর গুহাগুলিতে, নগ্ন মাতৃকামূর্তি। এবং এই Great Mother সারা পৃথিবীর বিভিন্ন জাতির চেতনায় আজও haunt করছে। এর দুই রূপ—এক হচ্ছে বরাভয়, Sophia, আর এক হচ্ছে ত্রাসদাত্রী কালী, চণ্ডীর রূপ। আমাদের পুরাণে এই দেবীকে একত্রে দুই রূপে কল্পনা করা হয়েছে, 'দেবীসূক্ত'। এবং আমাদের সমাজের মজ্জায় মজ্জায় ঢুকে আছে এই মাতৃভাবরূপী archetypeটি।

বাংলাদেশের সমস্ত আগমনী বিজয়ার গান, লোককথার সমস্ত গভীর দিকগুলো এই সাক্ষ্যই বহন করছে।"

ঐ সময়কার বিখ্যাত প্রবন্ধ—'সারি সারি পাঁচিল' :

"একটি করে ছবি করার জন্য আমাদের যে কতগুলো পাঁচিল টপকাতে হয়, তা যদি আপনারা জানতেন তাহলে আরএকটু হয়তো ক্ষমা করতেন আমাদের।...

অথচ আপনাদের হাতেই সব। আপনারাই সব। আপনাদের রায়ই সব। আপনারা আক্রমণ করুন, আঘাত করুন, বাঁচতে দিন।...

আপনারাও একটি বড় পাঁচিল। বোধহয় সবচেয়ে বড় পাঁচিল।

আমাদের দেশ রামায়ণ মহাভারতের দেশ, আমাদের দেশের চাষী যে দর্শনের কথা বলে, তা মিলবে না বহুদেশেই। আমরা আমাদের দুঃখকে ভালবাসি। আমাদের আনন্দকেও। তবু নিশ্চিন্ত না হওয়া পর্যন্ত আমরা আপনাদের ছাড়ব না। কিছু একটা জন্মাবেই, থরথর করছে আজ ছবির দুনিয়া।

আপনারা আমাদের অনুভব করুন, বুঝুন, আমরা একটা বহতা নদীর মাঝ দিয়ে বইছি, আজ এই মুহূর্তে আমরা যা, তাই আমাদের শেষ পরিণতি নয়। আমরা অনেক বড় হয়ে অনেকটা ছায়া দেব, শুধু জলসিঞ্চনের অপেক্ষা।...

এই যে, একটা ঢাকনার মতো মানুষের সব শুভকে ঢেকে রেখেছে শুধু প্রাণধারণের গ্লানি, সেটা হঠাৎ যেদিন উঠে যাবে, সেদিন হাই-ড্রোজেন শক্তির পরিব্যাপনের মতো মানুষের ইচ্ছা আর ক্ষমতা ব্যাপ্ত হবে। সেদিন আমরা আর কাঁদুনি গাইতে আসব না।

সেদিন রাস্তায় এত গুলিও চলবেনা, এত মা-ও কাঁদবেনা, আর আমরা চুটিয়ে ছবি করবই। কারণ, বহু পাঁচিল সেদিন ধ্বসে যাবেই।"

'ছবিতে শব্দ' প্রবন্ধে:

..."তখন আসে শব্দ-সংমিশ্রণের স্তর। বিভিন্ন শব্দকে বিভিন্ন স্তরে বাজিয়ে তা সঠিক স্থানটিতে পৌছে দিতে হয়। কোনটি বা খুব জোরে, কোনটিকে বা শুধু অনুভূতির স্তরে বাজিয়ে তবেই গিয়ে ব্যাপারটা দাঁড়ায়।...

তাই বলছিলাম, স্থিরচিত্র মুক্তি খুঁজছে গতির মধ্যে। মূক চলচ্চিত্র প্রগলভ হতে চেয়েছে, সশব্দ চিত্র সে আয়তন বাড়িয়ে দিয়েছে, নগ্ন হয়ে গেছে, অন্য একটা কিছু খোঁজার মধ্যে। চূড়ান্ত শিল্প যে সংগীত তার নির্ব্যক্ত উদগ্র এককতায় পৌছবার সাধনা বোধহয় ওর।

তবে যে কোন শিল্পই শিল্প হয়না, যতক্ষণ না তার একটা বাতাবরণ থাকে। চলচ্চিত্রে শব্দেরও একটা ধাঁচ, একটা গোটা নক্সা থাকে।

সেটিকে ধরবার চেষ্টা করা যেমন তৃপ্তিদায়ক, তেমনি ছবিটিকে বুঝতে, তাকে ওজন করতে, তা আমাদের সাহায্য করে।"

'শিল্প ও সততা' প্রবন্ধে :

..."কথাটা হচ্ছে সব শিল্পকর্মেরই সত্যকারের শিল্প পদবাচ্য হতে হলে, সর্বপ্রথম হতে হবে সত্যবাদী। এই হচ্ছে শিল্পবিচারের দৃঢ়তম মানদণ্ড এবং যুগ যুগ ধরে স্বীকৃত।...

আমাদের দেশের কথা ভাবতে গেলে, বিশেষ করে এইসব কথাগুলিই মনে হয়, জীবনের কাছে যাওয়া তাকে কঠিনভাবে ভালবাসা অথবা পবিত্রভাবে ঘৃণা করা, ছবির জন্য ছবি করা নয়—প্রাণের জন্য ছবি করা এ যেন এ দেশে নূ (Gnu)-র মতই দুষ্প্রাপ্য জন্তু।

প্রাথমিক চিন্তা, প্রাথমিকভাবে জীবনে কোন একটা ফলবান খণ্ডের সঙ্গে আত্মিক যোগাযোগ, সৎভাবে নিজের উপলব্ধির গণ্ডীর মধ্যে বিচরণ, ছবি করার এই আদি সর্তগুলোই বড় দুষ্কর হয়ে পড়েছে এদেশে খুঁজে বের করা। নতুন যাঁরা আসছেন তাঁদের মধ্যেও সেই স্ফুলিংগ দেখছিনা।

তাই আমার মনে হয় আমরা এখনো বহুদূরে আছি। এখনও বোধহয় অনেকটা পথ যাবার আছে। মাঝে মাঝে মনটা অবসাদে আচ্ছন্ন হয়ে যায়।

সেই সব সময়, হঠাৎ মেঘের ঝিলিক দিয়ে আন্তোনিওনির মত মহৎ শিল্পীদের উক্তিগুলো হাতের কাছে আসে।

তারা নতুন করে বল দেয়।"

'নাজারিন ও লুই বুনুয়েল' প্রবন্ধে :

"হিন্দুধর্ম সেদিক থেকে অনেক ফিচেল এবং বদ। একটা উদাহরণ দিলেই ব্যাপারটা পরিষ্কার হয়। নাগার্জুনের শূন্যবাদ (বোধহয় তদানীন্তন কাল পর্যন্ত মানবচিন্তার উচ্চতম শিখর, কারণ নাগার্জুন ছিলেন পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মনীষীদের অন্যতম) যেহেতু বৌদ্ধদর্শনের (মহাযানবাদী) যুক্তিযুক্তভাবে পরমসিদ্ধান্ত, তাই, যতোদিন

ভদ্দরলোক বেঁচে ছিলেন—হিন্দুরা চুটিয়ে গাল দিয়েছে তাঁকে। যখন তিনি নিরাপদভাবে একেবারেই মৃত এবং কিছু শতাব্দী কেটে গেছে, তখন arch-reactionary শংকর, সেটিকে আত্মসাৎ করে ও কুক্ষিগত করে বেড়ে অদ্বৈতবাদ বলে চালিয়ে দিলেন। এবং হিন্দুধর্মের একটা cornerstone হয়ে রইলো অদ্বৈতবাদ। যতদিন বুদ্ধ বেঁচে, (দৈহিক-ভাবে না হোক, মানুষের মনে এবং সামাজিক শক্তি হিসেবে) ততোদিন, তাঁর সঙ্গে প্রচুর কুস্তি চললো, আবার যখন তিনি আর নেই, তখন তাঁকে বিষ্ণুর অবতার করে ছেড়ে দেওয়া হলো। স্তোত্র লিখলেন জয়দেব।

এরকম ভুরিভুরি নমুনা দেখানো যাবে, যাতে করে ভারতীয় আর্যধর্মের বৈশিষ্ট্য এবং ফিচলেমি পরিষ্কার হয়ে আসে।"......

৭.

১৯৬৪ সালের শেষে পুণা ফিল্ম ইনস্টিটিউট থেকে লেকচার দেবার জন্য ডাকতো। তাই মাঝে মাঝে পুণা যেতে হতো। এর পরের বছরের প্রথম দিকে চালচলনের অস্বাভাবিকতা বেড়ে যায়। এরই মাঝে শেষ পর্যন্ত পুণার চাকরীটি হয়। তখন পর্যন্ত নিজেকে বদলাবার আন্তরিক ইচ্ছা ছিল। তখনকার চিঠিতে তার উল্লেখ আছে। ছেলেমেয়েদের জন্য চিন্তাও ছিল। আর খুবই ইচ্ছে ছিল 'বগলার বঙ্গদর্শন' শেষ করবার।

যথাসময়ে এসে পড়েছি। এখানে এরা আমার প্রোগ্রাম করে দিয়েছে। এরা চায়, আমি ৩০ তারিখ পর্যন্ত থাকি।

কিন্তু কলকাতায় কি ঘটছে, তার জন্যে মন ভীষণ খারাপ হয়ে আছে। যদি পার, নারানকে দিয়ে কুশারীর কাছ থেকে খবর নিয়ে জানিও। তার ওপরে এখানে থাকা ঠিক করব।

এদের এখানে অত্যন্ত আদর পাচ্ছি। এই একমাত্র জায়গা এখনও বাকী আছে, যেখানে সবাই আমার জন্য উদগ্রীব। মুরারী বলছে, যে কোন সময়ে আমি join করতে পারি। আমি ফেব্রুয়ারীতে আসব

বলেছি। কারণ 'বগলা' যদি হয়, শেষ করে আসতে হবে। আবার না হলে সংসার চলবে কি করে—যাই হোক, আমি বলেছি, final date জানাব কলকাতায় ফিরে, এখানে বাড়ী পাওয়াও মুস্কিল। কাজেই এবার সেসব খোঁজও করে যাব।

দিনরাত ব্যস্ত। পরে আবার লিখব।

আমি ৩১ তারিখে রওনা হয়ে খুব সম্ভব ২ তারিখে কলকাতা পৌছব। এরপরে এখানে আর থাকা যাবে না। চাকরীর ব্যাপারটা মোটামুটি পাকা। পাঁচ বছরের contract. আমি মার্চের গোড়ায় আসব বলেছি। কারণ, পরে আরো ২।১ মাস পেছোনো যেতে পারে। আমার এখন একমাত্র চেষ্টা হবে, রমণের ছবিটা শেষ করে দেওয়া, তারপর আর আমার ছবি করার মোটে ইচ্ছে নেই, কলকাতাও আর ভাল লাগছে না। এখানে সম্মান, বাঁধা মাইনে এবং মনের মত কাজ। Summer vacation এর আগে join করতে পারলে আফগানিস্তানে ২ মাস গিয়ে Experimental Film করার সুযোগ আছে।

মুরারীর অগাধ আস্থা আমার ওপরে, ইন্দিরা গান্ধীও অনেক কিছু করেছে আমার জন্যে, গিয়ে বলব।

Part time ৩।৪ মাস আমি যে কোন সময়ে করতে পারি। সে কথা হয়ে গেছে। কিন্তু এখন Guaranteed একটা কিছু কয়েক বছরের জন্য করতে পারলে ভাল হয়। গিয়ে আর সব কথা বলব। নারানকে এক'দিন কাছে রেখো।

…অজিতকে জিজ্ঞাসা কোর,—পথে বা এখানে এসে একেবারে ছেড়ে দিয়েছি। এই ২/২½ মাস হোক আমার চেষ্টা। দেখি, আবার সহজ জীবনে ফিরতে পারি কিনা।

টাকা যেমন পারি পাঠাচ্ছি, ২০ তারিখ নাগাদ শ'চারেক টাকা

পাবে। ও মাসের গোড়ার দিকে মোটা টাকা পাঠালে অবিলম্বে বাড়ীটা ছাড়, ও বাড়ীটা আমার কাছে সবসময় এখন Death House মনে হয়, তোমাদের বলি না।

বাচ্চাদের জন্য যতখানি পার খরচ কর, তোমার জন্যে যা দরকার (স্বাস্থ্যের ভালর জন্যে), ইতস্ততঃ কোর না।

বেশী লিখলাম না। নারান নিশ্চয়ই থাকে। অজিত মাসকাবারে দিয়ে যাবে। আমি ৭৫৲ দিয়ে একটা একা ঘর নিয়েছি। টুনু-বুলু-বাবুকে আপ্রাণ ভালবাসা। তোমাকে তো বটেই। সব থেকে তোমাকে বঞ্চিত করলেও তুমি ছাড়া আমার কেউ নেই। সব ছেড়ে টাকা টাকা করে ঘুরে সেটাকেই প্রকাশ করার বোধহয় চেষ্টা করি। জানিনা ঠিক।

…আমার এখানকার চাকরী হবে বলেই মনে হচ্ছে। আর মাসখানেক বাদে পাকা হবে। আমার এ কাজই ভাল। তবে এখানে একা থাকা বড়ই কষ্টকর। মনটা সবসময় খারাপ থাকে।

টাকাটা এখন পাওয়া গেল না। হপ্তাখানেক পরে হয়তো পেতে পারি। কষ্ট করে আর ক'টা দিন চালাও, তারপর হয়তো একটা সুস্থির অবস্থা আসবে।

আমি বারো তারিখে রওনা হয়ে ১৪ই কলকাতা পৌছোচ্ছি। এক সপ্তাহের ছুটি নিয়ে যাচ্ছি। এখানে দম আটকে আসছে। তিনদিন কলকাতায় থাকলেও মনটা ভাল হবে।

তাছাড়া সুবর্ণরেখা Franceএ পাঠানোর ব্যাপারটাও পাকা হয়েছে। সেজন্যে রমেশকে দরকার এবং অনেক কিছু কলকাতায় করার আছে। আর একটু কথা বোম্বেতে হলে তোমাকে আমি কি কি করতে হবে লিখব, নারানকে দিয়ে সেগুলো করিও।

যাবার সময় আবার কিছু টাকা নিয়ে যাব। টুনু-বুলু-বাবুর জন্য জামা, তোমার জন্য শাড়ী।

…এখানে আসার পর থেকে আমি <u>একদম</u> খাচ্ছি না। এবং ইচ্ছে আছে আর খাবও না। এভাবে আমাদের সবার জীবন নষ্ট হতে দেব না। একবার শেষ চেষ্টা করে দেখি।

আমার দৃঢ় বিশ্বাস, যা গেছে তাকে আর ফেরানো যাবে না, কিন্তু এখনও <u>অনেক</u> কিছু করার ক্ষমতা আছে, তোমাদের আনন্দ দেবার আছে এবং সেগুলো আমি দেবই। কিন্তু পুণার চাকরী না নিলে কিছুতেই হবে না। ঐ পরিবেশ থেকে আমাকে কিছুদিনের জন্যে বেরিয়ে আসতেই হবে। অনেকবার বলেছি, এবার কাজে দেখাতে হবে।

শরীরের চিকিৎসা কোর। পয়সার কথা একদম ভেবো না। বাকী সমস্যা এক এক করে সমাধান করে ফেলা যাবে।

—বেশী লেখা যায় না।

…শেষ অবধি আজকে সইটা করেই ফেললাম। এখন থেকে আমি এখানকার Vice-Principal।

নারাণকে লিখছি Matric ও B. A. Certificate Original এবং Passport পাঠাতে। ওটা না এলে আমার নাম Gazetted হবে না। মাইনেও পাব না।

আমার এলার্জি কমে গেছে, Drink রাত্রে। এখনই Permit নিতে যাচ্ছি। ওটা তৈরী হয়ে পড়ে আছে।

এতদিন তোমাকে লিখিনি। কারণ অসিতবাবুর টাকাটা আসার জন্যে অপেক্ষা করছিলাম। আজ এসেছে।

…আসার সময় তোমার যা চেহারা দেখে এসেছি, প্রতি মুহূর্তে আমার ভয় করছে। ভাল করে চিকিৎসা কর। আমি জানি, আমিই

তোমার একমাত্র অসুখ, এবং আমি ঠিক না হলে তোমার ভাল হবে না। এবং তুমি আমার ওপরে সম্পূর্ণ আস্থা হারিয়ে ফেলেছ।

আমার Task হচ্ছে, সেই আস্থাকে আবার জাগরূক করা। দেখি পারি কিনা। কিন্তু তোমাকে কোনদিনই দোষ দেব না। দোষ সম্পূর্ণ আমার। আমার শরীরটাও অসম্ভব খারাপ। জোর করে চেষ্টা করছি যাতে আবার স্বাস্থ্য ফিরে পাই।

'সুবর্ণরেখা' ৩০ তারিখে Release শুনছি। এখনও পাকা খবর পাই নি। পেলে জানাব। এটা হলে আমি ২৬।২৭ তারিখে দিন সাতেকের জন্য যাব এবং Distributorএর পয়সায় একদিনের জন্য শিলং ঘুরে আসব। তোমাদের সবার জন্য কিছু জিনিষপত্র কিনেছি। সেগুলো তাহলে ডাকে পাঠাব না। না হলে ডাকেই পাঠিয়ে দেব।

কুশারীরা বলেছে, ছবি সেপ্টেম্বরে শুরু করবে। ওদের খবরও আশা করছি এক সপ্তাহের মধ্যেই পাব।

'সুবর্ণরেখা' Veniceএ Selected হয়েছে। এখানের সরকার বাঁদরামো না করলে ওটাও একসপ্তাহের মধ্যে Venice যাবে।

এখানে কাজে ডুবে আছি। প্রচুর সম্মান এবং শ্রদ্ধা। এইটেই সান্ত্বনা।

পত্রপাঠ জবাব দিও। টুনুবুলুবাবুর কথা সারাক্ষণ মনে পড়ে।

তোমাকে ছেড়ে থাকা যায় না।…এখনও মাইনে পাইনি। ২১ তারিখে medical হবে। মনে হয়, অগাস্টের প্রথমেই মাইনে পাওয়া যাবে। প্রাণভরা ভালবাসা, ভালবাসা, ভালবাসা।

Film Institute of India
Poona-4

আমার শ্রীমতি,

ভালবাসা, ভালবাসা, প্রাণভরে ভালবাসা।

আর কিছু আপনাকে লেখার নেই।

নমস্কার মশায়।

আপনারই একমাত্র

ঋত্বিক

এখানে এমন বিশ্রী ঝগড়ার মধ্যে পড়ে গেছি যে, অন্য কিছু করার সময়ই পাচ্ছি না। চাকরিটা শেষ অবধি রাখব কিনা আমাকে ভাবতে হচ্ছে। যাকগে, এসব নিয়ে তুমি একদম চিন্তিত হয়ো না। যা করার আমি করব।

তোমাদের চারজনের মুখ খালি খালি মনে পড়ে। এই নিয়েই বেঁচে আছি।

আমি সেপ্টেম্বরের ২০।২৫ তারিখে কলকাতায় যাচ্ছি। তখন শিলং-এ গিয়ে তোমাকে কলকাতায় নিয়ে আসব।

মনের উদ্বেগ একেবারে কাটিয়ে শরীরটাকে ভাল কর। প্রতি সপ্তাহে চিঠি দিও।

পুণায় বড় গণ্ডগোল। আমি তাই লিখতে পারিনি। আমি আগামী ১৮।১৯ তারিখে মাদ্রাজ হয়ে পণ্ডিচেরী যাব মিলির সঙ্গে দেখা করতে, ওর চিঠি সঙ্গে পাঠালাম।

কলকাতায় হয়তো ২৫ তারিখে যাব। গেলে শিলং পাহাড়ে গিয়ে তোমার সঙ্গে দেখা করব।

ভীষণ ব্যস্ত, Riot-এর জন্য। চিন্তা কোরনা।

এ খালি বদমাইসী।

আমার তিনপাখীকে পরম আদর।

তোমায় আপ্রাণ ভালবাসা।

কিছু বুঝতে পারছিলাম না কি হলো। চিন্তা করতে বারণ করলেও খুবই চিন্তায় ছিলাম। আর কোনো চিঠি পাইনি। এরপরে হঠাৎ অক্টোবর মাসেই চাকরী ছেড়ে শিলংএ এসে উপস্থিত।

কলকাতা যাবার টিকিট কাটা হয়ে গেছে। ঐ সময় একটানা ১৭ ঘণ্টা 'পণ্ডিতমশাই' গল্পটির স্ক্রিপট লিখতে লিখতে অজ্ঞান, হ্যালিউসিনেশন, ডেলিরিয়ম, সেই সময়কার অবস্থা অবর্ণনীয়। কি চিন্তায় যে দিন গেছে।

একটু সুস্থ হবার পর আমাদের কলকাতায় নিয়ে এসে অস্বাভাবিকতা আর স্বাভাবিক হল না। অনেক ভেবে আমার ভাইকে চিঠি লিখলাম। হাসপাতালে ভর্তি করা হল।……এমনিভাবেই শেষ হল।

৮.

অথচ এই বছরটাতেই লেখা হচ্ছিল এইসব প্রবন্ধ :

"বক্তব্য আমার কিছু নেই, কারণ আমার পক্ষে ব্যবহারিকভাবে ছবি করা সম্ভবপর হচ্ছে না। কিন্তু একজন সাধারণ ব্যক্তি হিসেবে বলবো,—মানবজীবন যেভাবে অগ্রসর হচ্ছে,—তাতে করে ভাবতে ভয় লাগে যে আজ থেকে পঁচিশ বছর পরে আমরা কোথায় থাকবো!

আপনারা মশাই ছবি করেন, দেখেন, ভালবাসেন। কাজেই আপনাদের কাছে আমার হয়তো কিছু বলবার অধিকার আছে। একটা কথা, যেটা আমার জীবন দিয়ে আমি বুঝেছি, সেটা বুঝতে গেলে আপনাদের খানিকটা পরিষ্কার হতে হবে। আপনারা সত্যিই ঘটনাটাকে ধরতে পারবেন না যখন আমি বলবো যে ছবি করতে হলে সর্বপ্রথমে ছবির জগতটাকেই বাদ দিতে হয়। ছবি করার প্রথম শর্ত হচ্ছে মানবিকবোধ এবং বাস্তবজগৎ সম্পর্কে সাধারণ জ্ঞান। জীবনকে উপলব্ধি করতে না পারলে শিল্পী হওয়া যায় না এবং শিল্পী না হলে, আপনার কোনো অধিকার নেই মানুষকে প্রবঞ্চিত করার।…

আমি এখন কলকাতা শহরে দেখছি যে মিথ্যাচরণ অপরিসীম ভাবে চলছে। আমার পক্ষে এগুলো সহ্য করা সম্ভব নয়। যতদিন আমি থাকবো পরিষ্কার একথা বলে যাব। ……আপনাদের ধন্যবাদ যে আপনারা আমার বক্তব্য শুনতে এসেছেন।…আমি তো মুছে গেছি। এইটুকুর জন্যে আপনাদের আমার মনে থাকবে।

প্রথম যে ছবি আমি আরম্ভ করি তার নাম হচ্ছে 'নাগরিক'। সেটা ছিল অন্য যুগ। তখন আপনাদের ছবি দেখার আন্দোলন কিছুই ছিল না। সেটা ছিল উনিশ শ বাহান্ন সাল, তখন লড়াই করা গিয়েছিল এবং মোটামুটি ছবিটা খুব খারাপ হয়নি।…আমার 'নাগরিক' ছবিতে একটা দৃশ্য ছিল যেখানে এক মা সমস্ত হারিয়ে কেবল এক শিশুপুত্রের

জন্যে চিন্তা করছে এবং সে নিজে ফিরে গেছে তার শৈশবে। সেইখানে আমি যখন খাদের কাছে গিয়ে প্রভাবতী দেবীকে এই দৃশ্যটি বুঝিয়ে দিলাম তখন ওঁর চোখ দিয়ে ঝর ঝর করে জল পড়তে লাগলো। এবং আমাকে একবারও সে দৃশ্যের সংলাপ পুনরাবৃত্তি করতে হয়নি। উনি যে কি মহৎ ছিলেন সেটা আমি বুঝি কারণ এইসব মানুষগুলোর সঙ্গে আমাকে কাজ করতে হয়েছে। আমি তো একথা স্বীকার করে যাবো যে এত বড় শিল্পী আমি আর দেখিনি। এমন প্রাণ বহু কষ্টে পাওয়া যায়,—তার গভীরতা, তার উত্তাপ যারা সহ্য করেছে, তারা বুঝবে আর কেউই বুঝবে না। 'নাগরিক' ছবি করার মধ্যে এইটাই আমার সবচেয়ে বড় অভিজ্ঞতা বা সঞ্চয় বা পরমার্থলাভ।"*

এই সময়েই 'যুগান্তর' পত্রিকায় বেরোয় এই সংবাদবিবরণী :

"বেঙ্গল ফিল্ম জার্ণালিস্ট অ্যাসোসিয়েশনের (বি. এফ. জে.-এর) সভাবৃন্দ কৃতী পরিচালক ও কলাকুশলীদের সর্বাধুনিক চিত্র এবং চলচ্চিত্রচিন্তা সম্পর্কে পরিচয়লাভের অভিপ্রায়ে যে আলোচনাচক্রের প্রবর্তন করেছেন, তার দ্বিতীয় অধিবেশনের আলোচনা আলোচনা-সভায় স্পষ্টবাদী শ্রীঋত্বিক ঘটক সাংবাদিকদের প্রতিটি প্রশ্নের উত্তরদানে যে অন্তরঙ্গ পরিবেশটি গড়ে তোলেন তা দীর্ঘদিন স্মরণে রাখার মতই।

জনৈক সাংবাদিকের প্রশ্ন : তাহলে তো আপনি নৈরাশ্যবাদী ? কেন, জীবনে কি আশার কোনো আলোকই দেখতে পান না আপনি ? এর উত্তরে শ্রীঘটক বলেন, না নৈরাশ্যবাদী আমি নই। আশার আলোক আমিও দেখতে চাই। কিন্তু পথ কোথায় ? সেই পথের সন্ধান করছি আমি। 'সুবর্ণরেখা'র মধ্যে ছেলেমেয়েদের দিয়ে দেখাতে চেয়েছি এই পৃথিবীর বাইরে একটি দিগন্ত আছে। সেইদিকেই চোখ ফেরাতে বলেছি আমি তাদের।......

......দর্শক আমার ছবি নেবেনা এমন কথাও কখনো মনে করি না। কিন্তু তা বলে বক্স অফিসের চাহিদায় সায় দিয়ে ছবি করা আমার

* দ্র. 'চলচ্চিত্রে পরিচালকের বক্তব্য'।

পক্ষে সম্ভব নয়। তবে আনন্দের কথা, আজ দর্শকদেরও রুচি বদলেছে। অথচ ১৯৫৫ সালের পূর্বে, এখন যা দেখছি, সেই চিত্রটি ছিল না। এটাই যা আশার কথা।"

'৬৫ সালেই 'সুবর্ণরেখা' মুক্তি পায়। ছবিটি বিদেশে পাঠাবার জন্য সাব-টাইটেল করবার জন্য ফরাসীভাষায় অনুবাদ করা হয়। সেই সাবটাইটেল-এর কপিটি আমার কাছে আছে।

কিন্তু ছবিটি শেষপর্যন্ত বিদেশে যায়নি। পুণা ফিল্ম ইনস্টিটিউটের প্রিন্সিপালকে লেখা তখনকার একটা চিঠি থেকে অবস্থাটা অনুমান করা যাবে:

The Principal,
Film Institute of India,
Poona 4.
Sir,

I am in receipt of the communication from Delhi about which you have kindly asked for my comments.

I request you to be a little patient and go through this note and then take any action that you may deem fit.

(1) Back in January 1965,—when the International Film Festival was held,—Mr. Georges Sadoul came to this country as a member of the Jury. He came to Calcutta also and saw my film "SUVARNA REKHA" and was completely overwhelmed with it. He invited the film from Paris for last Cannes Festival. I had shown this film to other eminent critics like Lindsay Anderson, Madame Kawakita, Guy Clover and others from all over the world. From their reactions and the praise that they expressed I could be quite sure that this film, if sent to any major festival of the world, will definitely bag one of the major awards and thereby bring prestige to our country.

(2) After the invitation from Mr. Georges Sadoul I asked my distributors to spend money for sub-titling and making new copies etc. For this work quite a few thousands of rupees we have spent already. Then came the release letter from the Ministry for necessary foreign exchange so that the film could be subtitled in Paris. I may point out here that there is no subtitling facilities in India. Unfortunately the Ministry saw fit to release foreign exchange on condition that the film will be shown in Non-Competitive Section. I and my distributors, both felt that such an entry is not worth spending so much money upon and taking so much trouble with. Here it may be pointed out that every Festival Authority has full rights to invite films from individual producers from any country. My film was being entered in Cannes not as my official entry for India but on the individual strength of the film itself so the question of sponsoring this film at Cannes did not arise.

(3) Anyway due to these reasons I could not send my film to Cannes in time. Then Mr. Sadoul sent invitations again for Venice Film Festival this year where also it was being accepted as individual entry.

But this time the Government did not find our case suitable for release of Foreign Exchange. They also pointed out that the film, to be eligible in a major festival, should be censored within 12 months prior to the holding of that festival. For this reason we again spent money, edited the film and censored it again, though the festival authorities have every right to invite any film of any period as I have told you earlier. Now after doing all

these expenditure the Government did not consider us fit for release of foreign exchange.

As you can understand, as an Artist I am attached emotionally with my work. And I fear the whole episode was very much frustrating to me. After all this I have become a Government servant now, and I regret to have written harshly to the Ministry of Information & Broadcasting out of all the frustrations for which I apologise. That letter was written not as Vice Principal of the Film Institute of India but in the capacity of Shri Ritwik Ghatak, Artist, Producer and Director of "SUVARNA REKHA."

Anyway, if any furthcr explanation is necessary I am ready to do so at your command.

Thanking you,

RITWIK GHATAK

Vice Principal

পুণাতে 'Fear' নামে একটি ছোট্ট তৈরী ফিল্ম বরা হয় অ্যাক্টিং কোর্স-এর ছাত্রদের নিয়ে। আর একটি ছোট্ট ছবি 'Rendezvous'ও এই সময়ই তৈরী করা হয়। আরও একটি উল্লেখযোগ্য কাজ এই সময় বরেছিলেন। পুণা ফিল্ম ইনষ্টিটিউটের সম্পূর্ণ ডিরেকশন-এর কোর্সটি তৈরী করা হয়েছিল।

পুণায় ছাত্ররা ভালবাসতো খুব। চাকরীটি ছেড়ে আসার সময় সবাই খুব দুঃখিত হয়েছিলেন। পুণার গল্প অনেক শুনেছি। বিরাট লাইব্রেরী ও ফিল্ম আর্কাইভ– Mr. Nair, প্রিন্সিপাল জগৎ মুরারী ও ছাত্রদের কথা বারবার বলতেন।

"পুণার চাকরীর যুগ আমার সবচেয়ে আনন্দময় যুগের মধ্যে একটা। সেখানে নতুন ছেলেমেয়েরা অনেক আশা নিয়ে, অনেক বাঁদরামি নিয়ে আসে, বাঁদরামি মানে ঐ নতুন মাস্টার এসেছে তার পেছনে লাগতে হবে। তাদের মধ্যে গিয়ে আমি ঝপাঙ করে পড়লাম। তাদের মন

জয় করা, তাদের বলা যে ছবি অন্য ধরণের হয় এর যা আনন্দ ঠিক বলে বোঝানো যাবে না, অন্য ধরণের আনন্দ যে অনেক ছেলেমেয়ে গড়লাম। আমার ছাত্রের দল সারা ভারতবর্ষে ছড়িয়ে গেছে, কেউ নাম করেছে, কেউ দাঁড়িয়েছে, কেউ ভেসে গেছে।

মণি-কাউল, কুমার সাহানী ও ঐ batchটা, K. T. John (কেরালাতে আছে), শত্রুঘ্ন সিন্‌হা, রেহানাস্থলতান, মহাজন, তারপর ধ্রুবজ্যোতি এরা সবাই আমার ছাত্র। দিল্লী গিয়ে দেখি Sound Engineer আর ক্যামেরাম্যানের মধ্যে ভর্তি আমার ছাত্র। ও সব দেখে একটা অদ্ভুত আনন্দ হয়, মাষ্টারদের আনন্দ, যাদের আমি পড়িয়েছি, লিখিয়েছি তারা প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে, নিজের নিজের Sphereয়ে তারা Successful*এর মধ্যে আমারো Contribution আছে বলে গর্বিত মনে করি, rightly or wrongly।

তারপর চাকরী ছেড়ে দিয়ে কলকাতায় ফিরে এলাম। লোকের কাছে ভিক্ষে করব না, মাথা নিচু করব না, এই ভাবেই চলছিল, এর মধ্যে drinkingটা ভয়ঙ্কর বেড়ে গেল, বারবার অসুখে পড়তে লাগলাম, আপনারা সবই জানেন, পাগলা গারদের কথাও জানেন। তা এরই ফাঁকে ফাঁকে ছবিগুলো করেছি প্রচণ্ড অসুবিধের মধ্যে, কেউ পয়সা দিতে চায়না, ডকুমেণ্টারীর কাজ পাওয়া যায় না। নানাধরণের ফ্যাকড়া। এর মধ্যে কোনটা একেবারে পয়সাবিহীন অবস্থায় করা, কোনটা একটু ভালভাবে করা। চেষ্টা করেছি ভালো-ভাবে করার।"*

এই উক্তি থেকে বোঝা যায় তখনকার অবস্থা। পুণার চাকরীর যুগটা খুবই উল্লেখযোগ্য জীবনে। ওখানে থেকে কাজ করতে পারলে একদিকে ভাল হতো। কিন্তু শিল্পীমন সরকারী নিয়মকানুনের মধ্যে থেকে বিদ্রোহী হয়ে উঠেছিল।

আর কলকাতায় এসে এতো আশার 'বগলার বঙ্গদর্শন'ই শেষ হল না। কুশারীবাবুরা তো চেষ্টা করেছিলেন।

তবে হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে সুস্থ থাকতে পারলে আবার কাজকর্মের

সুযোগ আসতো—আবার সব ঠিক হয়ে যেতো। লুম্বেনীর সুপারিনটেণ্ডেণ্টের চিকিৎসাও আর এগোলো না। আমি নিজে চেম্বারে গিয়ে ওষুধ নিয়ে আসতাম। এরপরে হেমাঙ্গদা একবার পাভলভ ইনস্টিটিউটের ধীরেন গাঙ্গুলীর কাছেও নিয়ে গিয়েছিলেন।

১৯৬৬ সালে কাজকর্মের সুযোগ এসেছিল, সুবর্ণরেখা ৮টা পুরস্কারও (B.F. J. A.র) পেয়েছিল। কিন্তু কিছু করা হলনা। '৬৩, '৬৪ ও '৬৫ সালের দুঃস্বপ্ন ও অনেক বিভীষিকাময় দিনগুলোর মধ্যেও একটা আশা ছিল সব ঠিক হয়ে যাবে। কিন্তু '৬৬ সালে সে আশা নির্মূল হল। আমি বুঝতে পারছিলাম ছেলেমেয়েদের রক্ষা করবার জন্য আমাকে একটা কিছু করতেই হবে। আমার মন দৃঢ় হয়। অসীম চেষ্টা সে জন্য আমাকে করতে হয়েছে। আমার দুঃসময়ে অনেক কথাই শুনেছি। সেগুলো অপ্রত্যাশিত, এবং আমার জীবনের সমস্যাকে কঠিন থেকে কঠিনতরই করেছে। আর একটা কথা আমাকে বারবারই বলা হয়েছে, 'শিলং চলে যাও, বাবার কাছে চলে যাও।'

নিরুপায় হলে বাবার কাছে নিশ্চয়ই যেতাম, গেলে আশ্রয়ও পেতাম। কিন্তু বাবার বয়স হয়েছে, সুতরাং তাঁর কাছে যাবার আগে, স্বাবলম্বী হবার জন্য একটা শেষ চেষ্টা আমাকে করতেই হবে।

তাছাড়া স্বর্গ তো আমার জন্য কোথাও তৈরী নেই, সুইট হোম কোথাও নেই। বাবার দুটো বাড়ী শিলং-এ, আত্মীয়স্বজনে ভর্তি। অনেক সমস্যা। আমার মা, বোন, দাদা-দিদি, কেউ নেই। একমাত্র ছোট ভাই বহুদূরে মাইশোরে থাকে।

স্বাবলম্বী হয়ে চলে আসতে আমার একটু সময় লেগেছে। এবং বাবা ভাই সাধ্যমতো আমার জন্য সব সময় করেছেন।

আর আমার ও বাবা ভাই—এই তিনজনের সবসময়ই চিন্তা ছিল অসুস্থ মানুষটি সম্বন্ধে। বাবা তাঁর জামাইকে স্নেহ করতেন সন্তানের মত। ভাই বারবার এসে সাধ্যমতো করেছে। শুভানুধ্যায়ীরাও সবসময়ই এগিয়ে এসেছেন। মনে পড়ে পরিচালক ও অভিনেতা দিলীপ মুখার্জী এসেছিলেন। অজিতেশ বন্দোপাধ্যায়, উত্তমকুমার, তরুণকুমার প্রভৃতি। সবাই চাইতেন তাদের ঋত্বিকদা যাতে সুস্থ হয়ে কাজ করেন।

৯.

লিখেছিলেন অনেক প্রবন্ধ। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য 'আমার ছবি' প্রবন্ধটিতে লিখেছিলেন :

"আমার শিল্পীজীবনের সক্রিয় ও নিষ্ক্রিয় এই দুই অবস্থাতেই বুঝেছি যে, সংগ্রামকে শিল্পীজীবনের নিত্যসঙ্গী করে তুলতে হয়। নানা প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে সংগ্রাম করে যেতে হবে। সাময়িকভাবে কোনো সংকট আচ্ছন্ন করে ফেললেও সামগ্রিকভাবে তা যেন আপোসের পথে টেনে না নিয়ে যায়, অর্থাৎ সংকটের কাছে আমরা যেন বিবেক-বুদ্ধি সবকিছু নিয়ে আত্মসমর্পণ না করি।"

এর পরের উল্লেখযোগ্য একটি প্রবন্ধ 'চলচিত্র চিন্তা'* থেকে :

"Comparative Mythology বা 'তুলনামূলক পুরাণতত্ত্ব' বলে বিজ্ঞানটি ক্রমশই একটি বিচিত্র ঘটনাকে উদ্‌ভাসিত করে তুলছে। বিশেষ করে C. G. Jung সাহেব যখন কতকগুলো সূত্র তুলে ধরলেন, এক নতুন আলোকপাত হলো মানুষের এবং প্রাণের ইতিহাস ও প্রাক্‌ইতিহাসের ওপর। Callective Unconscious, যৌথঅবচেতনা ব্যাপারটা প্রকাশ করলো এই কথা যে আমরা আমাদের মাথার মধ্যে বহন করে চলেছি বিচিত্র সব চিত্র যাদের জড় শুধু মানুষের মানুষ হবার পর থেকেই নয়, তারও আগেকার কালে বিবৃত। এই কথা জানা গেল যে, বিভিন্ন জাতির ইতিহাসে কতকগুলো মূলতম archetype পুনরাবৃত্তি করতে থাকে। বিভিন্ন মানবসভ্যতার বিবর্তনের মধ্যে দিয়ে আমরা দেখি সেই একই Complex। জীবনচিত্র, কিভাবে archetypal image বা মৌলপ্রতিমার মধ্যে দিয়ে Symbol অর্থাৎ প্রতীকে পরিণত হতে থাকে।...

Great Mother image 'মহীয়সী মাতা' প্রতিমার যে ব্যাপকতা তা আমরা এখন জানতে পারি Erich Neumann-এর মহামূল্যবান বইটি পড়ে। অথচ এই 'মহীয়সী মাতা', তার যে দুই রূপ, বরাভয়

এবং ভয়ংকরী (the benevolent and terrible aspects), এদের সঙ্গে আমাদের সভ্যতার নিবিড় ঘনিষ্ঠতা সেই আদিকাল থেকে। এবং আমাদের পুরাণ, আমাদের মহাকাব্য, আমাদের শাস্ত্র ও আমাদের লোককথা, তার প্রতি স্তরে স্তরে এই মৌলপ্রতীকটি আমাদের জড়িয়ে রেখেছে।···

আমার ছবিতে আমি বুঁদ হয়ে এ ধরণের ঐতিহ্যের মধ্যে হারিয়ে যেতে চেয়েছি।"

'পরীক্ষা-নিরীক্ষামূলক চিত্র এবং আমি' প্রবন্ধে আছে :

"ভারতে পরীক্ষামূলক চলচ্চিত্র অধিক নির্মিত হয়নি, যে কটিই বা হয়েছে, তার অধিকাংশই বাংলায়।

···আমরা সকলেই জানি যে পৃথিবীর প্রতিটি বস্তুই আপেক্ষিক, তা হলে চলচ্চিত্রের মধ্যে যে পরীক্ষা বা গবেষণা হয় তার সঙ্গে কিসের আপেক্ষিক সম্বন্ধ বিরাজমান ?

এই সম্পর্কটি হচ্ছে মানুষ ও তার সমাজের সঙ্গে। শূন্যে তো কোন পরীক্ষা চলতে পারে না। সুতরাং কারো না কারো সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হতে হবে, এবং এই সংশ্লিষ্টতা হচ্ছে মানুষের সঙ্গে।···

আমার ছবিগুলিতে আমি যতদূর পেরেছি চেষ্টা করেছি আমার দেশ ও আমার দেশের মানুষের দুঃখকষ্ট ও নির্যাতনকে চিত্রিত করতে। আমার সাফল্য যতদূরই হোক না কেন, আমার আন্তরিকতায় কোন অভাব এতটুকুও ছিলনা বলে মনে হয়।···

আমার 'কোমলগান্ধার' ছবিটি, আমার মনে হয়, এ দেশের চলচ্চিত্রে যে সমস্ত বাধাবিপত্তি আছে, সেগুলোকে ছিন্নভিন্ন করে দিতে পেরেছিল। এই ছবিটির যে মূল বক্তব্য এবং সেটিকে উপস্থাপন করা হয়েছে যে ভাবে, সেগুলি বিচার করলে এটিকে একটি পরীক্ষামূলক চলচ্চিত্রের আখ্যা দেওয়া যেতে পারে হয়তো।

'সুবর্ণরেখা'—এই চিত্রটির দ্বারা আমি প্রচলিত ধারার উপর সরাসরি আঘাত হানতে চেয়েছিলাম।

এই ছবিটিকে মেলোড্রামা বলা হয়েছে এবং তাতে কিছু ভুল হয়নি। সমালোচকদের স্মরণে থাকা উচিত ব্রেশ্‌টের কথা। তিনি কিন্তু বিচিত্র ঘটনা-পরম্পরার উপরে নির্ভর করেছেন, এবং 'বিচ্ছিন্ন

অনুভূতি'র একটা ব্যাপার তৈরী করেছিলেন, কথাটা মনে রাখা ভাল।

তাঁর দৃষ্টিভঙ্গির প্রসারতা আমাকে প্রভাবিত করেছে।···আজকে আমার এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধটিকে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের রচনা থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে শেষ করবো।—

প্রত্যেক শিল্প একমাত্র সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত হলেই সর্বাঙ্গসুন্দর হয়। শুধুমাত্র সত্য দ্বারা শিল্পসৃষ্টি সম্ভব নয় এ কথা সত্যি, কিন্তু সত্য ব্যতীত শিল্প সম্পূর্ণ হয়না। আমরা এটুকু মনে রাখলে ভাল করবো।"

'আজকের ছবির পরিণতি' প্রবন্ধের খানিকটা অংশ* :

"আজকের পৃথিবীতে ছবি সম্পর্কে পরীক্ষা-নিরীক্ষা নানারকম হচ্ছে। সেগুলো সম্পর্কে যদি আমরা অবহিত হতাম, তা হলে সত্যিই আনন্দ পেতাম।

প্রথমত গল্প ব্যাপারটাই মোটামুটি বাদ হয়ে গেছে। আজকে ছবির জন্য সারা পৃথিবীতে যে জোয়ার এসেছে, সেখানে গল্পের কোনো অবকাশ নেই। অতি সম্প্রতি মিৎসুগুচি মারা গেছেন। তাঁর কিছু কিছু কাজ দেখেছি। বা ধরুন আন্দ্রেই তারকুভসকির ছবি। অথবা ওজু এবং কুরোসাওয়ার ছবি। এগুলোর মধ্যে যে রসের সন্ধান পেয়েছি, তা সত্যিই অনবদ্য।

এদের সঙ্গে আমি বলব Fellini-র কথা। এই ভদ্রলোক অনেক গভীরে ঢুকেছেন। পোলাণ্ডে আঁদ্রেই ভাইদা (Wazda) কিছুকাল কাজ করেছিলেন।···

আমার সত্যিকারের শ্রদ্ধা যদি কারো ওপরে থাকে তিনি হচ্ছেন লুই বুনুয়েল। আমার ব্যক্তিগতভাবে মনে হয় যে, উনিই একমাত্র ব্যক্তি যিনি এখন পর্যন্ত নিজের বিবেক বিক্রি করেন নি।···

নাটক এবং ফিল্মের জগতে Bertolt Brecht-এর চিন্তাধারা প্রচণ্ডভাবে কাজ করছে এখন। ···মানুষজনকে গল্পে ভুলিয়ে কাঁদানো আর সাধারণ সস্তা দৈহিক ব্যাপার দেখানো, এসব দিয়ে কোনো সৎশিল্পী আর খুশি হতে পারছেন না।···

আমার ব্যক্তিগত ব্যাপারে বিশেষ কিছু বলার নেই। যদি কিছু করে থাকি, করেছি। ভবিষ্যতে কিছু করতে পারব কিনা তা ভবিষ্যতের মধ্যেই নিহিত আছে। তবে কিছু কথা বলে যেতে চাই। সেটা আমাদের দেশে ছবি করার ব্যবস্থা সম্পর্কে।

বাংলাদেশের ছবি আসলে পরিচালনা করেন প্রদর্শকরা। তাঁদের কথা ভেবেই ছবি হয় এবং তাঁদের হুকুমেই ছবি বন্ধ হয়। এঁরাই সর্বাগ্রে টাকা তোলেন। তারপরে এরা সুবিধামত পরিবেশকদের দেন। তারপরে পরিবেশক যখন ভাল বোঝেন তখন প্রযোজককে টাকা দেন। অথচ তাঁকেই অপরের মুখাপেক্ষী হয়ে থাকতে হয় শেষ পর্যন্ত। এই ঘটনাটা সমস্ত ছবির জগতকে গলাটিপে মারছে।

আর একটা ঘটনা আপনাদের শুনিয়ে দি। চিত্রপ্রদর্শকদের একটি খুব ভাল ব্যবস্থা আছে m. g. বলে, তার সাহায্যে একটা লাভের ব্যবস্থা থাকবেই।...'হাউসফুল' না হলেই ওঁরা মনে করেন আমাদের ক্ষতি হোল। এ সম্বন্ধে সকলেরই খানিকটা ভাবা দরকার। এর যে কি প্রতিকার সেটা বলাও আমার পক্ষে সম্ভব নয়। তবে এ সমস্যাগুলোর সমাধান না হলে ভারতবর্ষে ভাল ছবি হবার কোনো সম্ভাবনা আমি দেখতে পাচ্ছিনা। আমি নিজে কিছু করি বা না করি, ভবিষ্যত পুরুষ যাঁরা আসবেন, তাঁদের জন্যে কথাগুলো বলে রেখে গেলাম। বোধহয় বলার দরকার ছিল।"

এই প্রদর্শকরা ছবির জগৎকে গলাটিপে মারছে, বহুদিন শুনেছি। অনেক মিটিংএ বক্তৃতা দিতে শুনেছি, চলচ্চিত্র-ব্যবসাকে ন্যাশনালাইজ বা জাতীয়করণ করা হোক। মনে আছে একটি সভায় (ইন্দ্রপুরী স্টুডেয়োতে) এই জাতীয়করণ সম্বন্ধে দৃঢ়ভাবে বলেছিলেন। 'চিত্রশিল্পের ভবিষ্যৎ' নাম অসমাপ্ত প্রবন্ধেও জাতীয়করণ সম্বন্ধে লিখেছিলেন: 'সোজাসুজি সব কটা দেশের চিত্রগৃহকে রাতারাতি সরকারী সম্পত্তি করে ফেলা।"...

তারিখ লেখা 'চলচ্চিত্রের স্বরূপ কি?' প্রবন্ধটি সম্ভবত কোনো ভাষণের খসড়া। এর আগে কোথাও প্রকাশিত হয়নি।*

"নিরালম্ব বায়ুভূত শিল্প কখনো শিল্পের পর্যায়ে ওঠেনা। মানুষটিকে

কোথাও না কোথাও আত্মীকরণ করতে হয়। ভাল না বাসলে শিল্প জন্মায় না। এর প্রকাশভঙ্গী বিভিন্ন প্রকারের হতে পারে, শিল্পীর মেজাজের ওপর নির্ভর করে। কিন্তু মূল সূত্রটি সেই 'সত্যম, শিবম সুন্দরম।' ভাল করে তাকিয়ে দেখুন, প্রথমে সত্য। সত্যসিদ্ধ না হলে কোন শিল্পই শিল্পের পর্যায়ে ওঠে না। এটা প্রথম কথা। শিবম কথাটা বাংলায় খুব প্রচারিত নয়। কথাটার মানে হচ্ছে, যা কিছু শাশ্বত। এখানে প্রশ্ন আসে যে কি শাশ্বত?

সেইটাই শাশ্বত, যেটা আপনি দুঃখ দিয়ে অর্জন করেছেন। শাশ্বত হচ্ছে সেই জিনিসগুলো, যেগুলো আপনি আপনার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে খুঁজে পেয়েছেন।…

সুন্দর! এর কোন সংজ্ঞা নেই। এটা সম্পূর্ণ আপনার রুচির উপর নির্ভরশীল। সৌন্দর্যের কোন মান নেই। দেশে দেশে, কালে কালে, সৌন্দর্যের মান বিবর্তিত হয়েছে, কিন্তু সত্য এবং শিবকে অস্বীকার করে যে সুন্দর দাঁড়ায় তাকে ঘৃণা করা ছাড়া আর কিছু করার নেই।

এই কথাগুলো মনে রাখলে ছবি সম্পর্কিত খানিকটা ভাবনাচিন্তা করা চলে। কারণ, ছবিকেও আজকাল শিল্প বলে মনে করা হচ্ছে।

…আমি দুঃখিত যে ভাল কথা বেশী বলতে পারলাম না, তবে মানুষে বিশ্বাস হারানো পাপ, রবিবাবুর এই কথাটা আমি মনপ্রাণ দিয়ে বিশ্বাস করি। ভদ্রলোক কিছু ঠিকঠাক কথাবার্তা বলে গিয়েছিলেন। এবং সে কথাকে তিনি নিজের জীবনযন্ত্রণার মধ্য থেকে উৎসারিত করেছিলেন। সেইটাই আমাদেরকে এখানে খানিকটা পরিমাণে প্রেরণা দিচ্ছে।

মুখে বললে আমাদের মুখের ভাষাও হারিয়ে যাবে। বাংলাভাষার, যে ভাষায় আমরা এখন কথা বলি, সে ভাষার জন্ম দিয়েছেন তিনি।

ওঁকে প্রণাম।"

এই ১৯৬৭ সালেই 'সুবর্ণরেখা'র প্রযোজক রাধেশ্যাম ঝুনঝুনওয়ালা একবার এসেছিলেন। 'আরণ্যক' ছবিটি করবার খুবই ওঁর ইচ্ছা ছিল জেনে ব্যারাকপুরে শ্রীমতী রমা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে দুজনে কথা বলতে যান। ঐ সময়কার একটি চিঠি আছে এইরকম:

আরণ্যক

ব্যারাকপুর

সবিনয় নিবেদন,

ঋত্বিকভাই, আপনার চিঠি আমি পেয়েছি। সেই সুন্দর চিঠির জন্য আপনাকে অসংখ্য ধনবাদ জানাচ্ছি। আরণ্যক আপনার হাতে উঠেছে এ আমার এবং আমার ছেলের অনেক কামনার জিনিস। অর্থ দিয়ে সত্যি এর পরিমাপ হয়না।—কিন্তু তবুও প্রয়োজনের তাগিদে আপনাকে ব্যস্ত করতে হচ্ছে বলে আমি ভীষণ লজ্জিত হয়েও আপনার কাছে আবার লোক পাঠালাম।

আমার বাবা ভীষণ অসুস্থ।···

আপনার শরীর কেমন আছে? আপনার স্ত্রীর? ছেলেমেয়েরা ভাল আছে তো? এখানে সুবর্ণরেখা হল কাল চ্যারিটি শো। আমাদের বাড়ীর সবাই খুব উৎসাহ করে গেল দেখতে।—বাবুলকে জানেনতো আপনার মুগ্ধভক্ত। প্রীতি এবং শুভেচ্ছা গ্রহণ করবেন।

ইতি

আপনার দিদি

রমা বন্দ্যোপাধ্যায়

শরীরটা ভাল ছিল না এই সময়। রাধেশ্যামের সঙ্গে যোগাযোগ হারিয়ে গেল।······আমাদের দুর্ভাগ্য, 'আরণ্যক' হল না।···চেষ্টা চলছিল 'রঙের গোলাম' ছবিটি করবার। একদিন দুটি গান টেকিং করার সময় হঠাৎ ল্যাবরেটারীতে অজ্ঞান হয়ে পড়ে কদিন খুব অসুস্থতা চলল।

অনিয়মিত স্নানখাওয়া ও পরে হঠাৎ অজ্ঞান হওয়া আরম্ভ হয়। ভীষণ দুর্ভাবনায় দিন কেটেছে। ডাক্তাররা ছাড়াও মহেন্দ্র ঐ সময় খুব করেছে। বাবা শিলং থেকে অহোরাত্র স্বস্ত্যয়ন করে আশীর্বাদ পাঠান।···

আমি ইতিমধ্যে বুঝি যে যোগ্যতা না বাড়ালে চাকরী পাবার আশা নেই। [illegible] বিহারীলাল কলেজে ভর্তি হই। তিনটি ছেলেমেয়েকে রোজ স্কুলে পাঠিয়ে ক্লাশে যেতাম ও পড়াশোনাও করতে হতো। খুবই ব্যস্ত ছিলাম। ওরই মধ্যেই শুধু দেখতাম, বাইরের ঘরে অনেকে এসে লেখা নিয়ে

বিরাজ করে—যেখানে রয়েছে প্রগাঢ় শান্তি—আমি চাইব তাকে ছবিতে মূর্ত করতে।—

জানিনা ব্যাপারটা ধরতে পারব কিনা, তবু চেষ্টা করব।

আমার ছবি শেষ করব এইভাবে।

একটি গুলিবিদ্ধ তরুণ ছেলে। সে ছাত্র হতে পারে, কৃষক হতে পারে। তার আর্তনাদমিশ্রিত উল্লাসের চীৎকার ভেসে আসবে, আর ছেলেটি আছড়ে পড়বে জমির উপরে। মরণের মুখেও সে দুই হাত দিয়ে জমিকে আঁকড়ে আঁকড়ে ধরবে। হাত দুটো পেরিয়ে আমার ক্যামেরা চলে যাবে ওর চাপ চাপ রক্তের ওপরে—ধরণী যা শুষে নিচ্ছে।—

ওইখানে জন্মাচ্ছে আর একটা ভিয়েতনাম। যে ভিয়েতনাম অমর।"*

এই ছিল ওঁর ভিয়েতনাম নিয়ে ছবি করবার পরিকল্পনা।

এই লেখাটিরই ভূমিকায় লেখা ছিল:

"ভিয়েতনাম সম্পর্কে কোনো ছবি করার কথা ভাবা বর্তমান পৃথিবীতে যে কোন চলচ্চিত্রকারের পক্ষে চরম দুরূহ ও পরম পবিত্র একটি চিন্তা।...কোথায় যেন কিভাবে একটা আভাস পেয়ে গেছি যে, ঘটনাটা ইতিহাসের একটা পাতা ওল্টানোর ঘটনা।...ভিয়েতনাম পৃথিবীটাকে একটা মোড় ঘুরিয়ে দেবে।...ভিয়েতনামের লড়াই এখানকারও লড়াই।...আজকের জগতে যেখানে যত কিছু শোষণ, ভিয়েতনাম তারই বিরুদ্ধে প্রতিবাদের প্রতীক।"

'শিল্প, ছবি ও ভবিষ্যৎ' প্রবন্ধে আছে:

"লড়াইয়ের ক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে যোদ্ধা কাউকে ক্ষমা করে না। এখানেই তবে প্রশ্ন তুলছি: শিল্পী কমিটেড কিনা, শিল্পী কোথাও বাঁধা আছে কিনা?

কমিটমেণ্ট কথাটার মানে কি? নিজেকে কোথাও সংলগ্ন করে রাখা।...শিল্পীর জীবনেও তাই। তাকে কোথাও না কোথাও লাগতে হবে।...

যদি না পারেন, তবে বাইরের একটা বস্তু খুঁজতেই হবে, সেটা কি ?

মানুষ।

শিশু।

জীবন মৃত্যুকে অস্বীকার করে। সকল শিল্পকে তাই হতে হবে জীবন অনুগামী।

জন্মই জীবন।

শিল্পজন্ম।

এই কথাটা আমরা কখনো ভুলে না যাই। যুতো ক্লেদাক্ত, বিষাক্ত অভিশাপের ভেতর দিয়ে আমাদের বেরতে হবে, হবে। শিল্প আমাদের এই দায়িত্ব দিয়েছে।"*

* 'শিল্প, ছবি ও ভবিষ্যৎ', আনন্দবাজার পত্রিকা, সুবর্ণজয়ন্তী সংখ্যা।
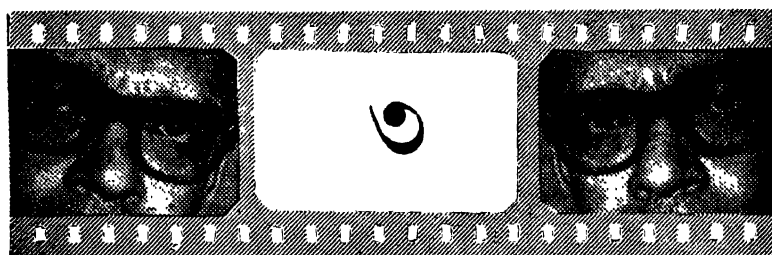
আবার টেস্ট পরীক্ষা দেবার পর সেদিন কলেজের শেষ ক্লাশ। আমার ছেলেটির জন্মদিন। পাঁচ বছর পূর্ণ হবে। হঠাৎ দুটি ছেলে এসে বলে—'রাস্তায় ঋত্বিকবাবু অজ্ঞান হয়ে গেছেন। মুখের ভেতরে একটা টাকার নোট।'···

সেদিন কলেজে গিয়ে বন্ধুদের কাছে ভেঙে পড়েছিলাম। এরপর মাথায় অসহ্য যন্ত্রণার জন্য পড়াশোনা করতে পারতাম না। বন্ধুরা আসতেন, আলোচনা করতাম। এইভাবেই পরীক্ষা কিভাবে শেষ করেছি জানিনা। মরণপণ চেষ্টা। শেষ আমাকে করতেই হবে।···পরীক্ষার শেষের দিন প্রিন্সিপালের সঙ্গে দেখা করে বলি 'মমতাদি! আমার একটি চাকরীর খুব দরকার।'···

মনে পড়েছে এই সময় যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে ঋত্বিক ঘটকের প্রথম চলচ্চিত্র উৎসব হয়েছিল। সেই সময় স্থভেনিরে লেখা নেবার জন্য সত্যেন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি কয়েকজন এসেছিলেন। দেশভাগ সম্বন্ধে বলতে গিয়েই তখন তীব্রতম ভাষায় বলা হয়, স্বয়ং গান্ধীজীও দেশভাগ সমর্থন করেন নি। ভাষাটা নিয়ে তখন এসেম্বলি ও পার্লামেন্টে আলোচনা ওঠে। এদিকে যাদবপুরে একটি সেমিনারে ঋত্বিক ঘটককে ডাকা হয় বক্তৃতা দেবার জন্য। সত্যেন বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে শুনেছি ঐ অ্যালকোহলিক অবস্থায় অনেকক্ষণ ধরে দাঁড়িয়ে গান্ধীজী সম্বন্ধে তাঁর বক্তব্য বিস্তৃতভাবে বলেন। এইটাই আশ্চর্য, কিছু বলবার সময় বা লিখবার সময় অন্য মানুষ। এইখানেই মানুষটির বৈশিষ্ট্য।

ওঁকে মেণ্টাল হসপিটালে ভর্তি করা হলো। কয়দিন নারায়ণ ও মহেন্দ্র আসতে পারেনি। তাই আমার বাড়ীওয়ালার ছেলে

বিবেককে নিয়ে হাসপাতালে যাই। কিছুদিন আগে থেকেই দাড়ি রাখতেন। জামাকাপড় আর চেহারার অবস্থা তখন শোচনীয়।

ডাক্তারবাবুর সামনে বসে চশমাটি কপালে তুলে: 'আপনি কোনটা follow করেন? ইয়ুং না এডলার? পাভলভ না ফ্রয়েড?'

ডাক্তারবাবু ধীরকণ্ঠে বলেন, 'আমি কিছুই করিনা।'

'না, একটা কিছুতো করেন।'

'আমি লণ্ডন স্কুল ফলো করি। ইংল্যাণ্ডে দশবছর কনসাল্টেট সাইকিয়াট্রিস্ট ছিলাম।'

'ডাক্তারবাবু! আমার একলাখ টাকার একটা কাজ পড়ে আছে। আমি কাজটা শেষ করে চারটার মধ্যেই ফিরবো। এক ফোঁটাও ড্রিঙ্ক করব না, সত্যি বলছি স্যার।'

ধীরকণ্ঠে উত্তর—

'একলাখ টাকা কেন? অনেক লাখ টাকা রোজগার করতে পারবেন, আমি আপনাকে নিয়ে যাব।'

'স্যার! একটু আমাকে খেতে দিতেই হবে।'

'এক ফোঁটাও না। শরীর খারাপ বোধ করলে দায়িত্ব আমার।'

আমার ও বিবেকের অবস্থা অবর্ণনীয়। কয়েক মিনিটের মধ্যেই ডাক্তারবাবু ওঁকে ভিতরে নিয়ে গিয়ে বন্ধ করেন। ভেতরে কারুর যাবার হুকুম নেই।

'এক সপ্তাহ পরে আসবেন' বলে ডাক্তারবাবু চলে যান।

এক সপ্তাহ পরে নারায়ণকে নিয়ে যাই। গেট থেকে ভেতর পর্যন্ত একটি কথাই সবার মুখে শুনি, দেখা হবে না। ডাক্তারবাবুর কোয়ার্টারে গিয়ে অনুমতি নিয়ে আসি। চেহারা দেখে চমকে উঠি। দাড়ি নেই, চুল ছোট ছোট করে ছাঁটা। অসম্ভব রোগা। প্রায় হাঁটবারই শক্তি নেই, এতো দুর্বল। শুনলাম সকালে একবার, দুপুরে একবার ও রাত্রে একবার ৮ সি. সি. করে ইনজেকশন চলছে।

আরো একমাস পরে চেহারা দেখে আবার চমকে উঠি। পরিষ্কার জামাকাপড় পরা, অপূর্ব চেহারা। হাসিখুশী।

ডাক্তারবাবু আমাকে রিপোর্ট লিখে দিতে বলেছেন। কিন্তু আমার মাথার যন্ত্রণার জন্য লেখাপড়া করতে পারতাম না। সুতরাং কি করে লিখবো?

ডাক্তারবাবু বলেন 'আমি আপনাকে ওষুধ দোবো। খাবেন?' আমি বলি, 'নিশ্চয়ই খাব।'

ডাক্তারবাবু আমাকে হাসপাতালের আউটডোর রোগী করে নেন।

ওষুধ খেয়ে দিনরাত্রি ঘুমিয়ে পড়তাম। চোখ খুলতে পারতাম না। তিনটি ছেলেমেয়েকে কোনরকমে স্কুলে পাঠিয়েই আবার ঘুমিয়ে পড়তাম। বুড়ি ঝি এসে ডাকলে ঘুম ভাঙতো।

সাতটি মাস তিনটি ছেলেমেয়েকে নিয়ে একা ঐ বাড়িতে ছিলাম। কেউ কোনদিন আসেননি, হাসপাতালেও না। নারায়ণ অফিস ফেরৎ আসতো, মহেন্দ্রও খোঁজ নিয়ে যেতো।

বাবা শিলংএ জণ্ডিসে অসুস্থ, ভাইটি অনেকদূরে মহীশূরে। সংসার চালাবার টাকা তাঁরা পাঠিয়ে দিতেন।

ডাক্তারবাবু যেখানে দরকার নিজে গাড়ী করে নিয়ে যান। রাইটার্স বিল্ডিং, ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল, ক্রিকেট খেলা দেখবার জন্য রেডিয়ো অফিসের ছাদে, এই সব। বাড়ীতেও নিয়ে আসতেন। ঐ সময়ই 'সেই মেয়ে' নাটক ও 'কুমারসম্ভব'এর 'অষ্টমসর্গ' লেখা হয়ে গেল।

একাও মাঝে মাঝে ছাড়তেন। কিন্তু বাড়ীতে এলেই তো 'লক্ষ্মী, পয়সা দাও, ড্রিঙ্ক করবো!'

ডাক্তারবাবুকে বলি, 'আমাকে আর অনুরোধ করবেন না। আমি চাকরী পেলে ছেলেমেয়েদের নিয়ে চলে যাবো।' ডাক্তারবাবু প্রথমে বলেন, 'কিন্তু ঋত্বিকবাবুর দেখাশুনা কে করবে?'

'ঋত্বিকবাবু মদটা একটু কমালেই সুস্থ হয়ে কাজ করতে পারবেন। কিন্তু আমার অবস্থা ভেবে দেখুন। আপনি কেন আমার চিকিৎসা করছেন?'

ডাক্তারবাবু তখন বলেন, 'আপনার মধ্যে আপনার মা, দিদিমার রক্ত ও ঐতিহ্য আছে, তাই আপনি পেরেছেন ও করেছেন, যে কোন বিদেশী মহিলা হলে অনেক আগে চলে যেতেন।'

মনে পড়ে '৬৫ সালে হাসপাতাল থেকে বেরোবার পর একদিন অজিত লাহিড়ী আমার ভাইকে বলেন, 'আসুন ক্ষীরুবাবু! সংসারটা আমরা তুলেদি।'

অজিত লাহিড়ী আমাদের বিশেষ বন্ধু ও শুভানুধ্যায়ী। তবু কথাটা শুনে আমি চমকে উঠি। আমি তখন পর্যন্ত ভাবতাম আমি থেকেই এই অবস্থা,

সুতরাং আমি চলে গেলে মানুষটির কি হবে? সুতরাং কোনরকমে যদি সংসারটা রক্ষা করা যায়। আমি এই চেষ্টাই করেছি। তারপর ধীরে ধীরে আমার মনকে প্রস্তুত করতে হয়েছে। আমি বিশ্বাস করি কোন মহিলাই একদিনে কোনো সিদ্ধান্ত নেননা। বহু চেষ্টা বহু প্রতীক্ষা বহু অপেক্ষা করার পরই বোধহয় একটি সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হন।...

তাই আমাকেও ধীরে ধীরে সিদ্ধান্ত নিতে হয়েছে। একজন সম্পূর্ণ অ্যালকোহলিক ও অসুস্থ মানুষের ওপর নির্ভর করে সংসার ছেলেমেয়ে রক্ষা করা যায় না। তাই শেষপর্যন্ত একটি চাকরী পেয়ে জীবনের একটি অধ্যায়ে যবনিকা ফেলে আমি চলে যাই।

১লা জানুয়ারীর উৎসবমুখর কলকাতাকে ও আমার সংসারটিকে চিরজীবনের জন্য পেছনে ফেলে যখন স্টেশনে এসে ট্রেনে উঠি ও ট্রেন ছাড়ার সময় হয়, তখন চোখে জল এসে যায়। কিন্তু কান্নার উপায় ছিলনা—বাবা সঙ্গে ছিলেন। দক্ষিণেশ্বরে নেমে যাবেন। নারায়ণ বলে, 'বৌদি তোমার ভাল হবে।' মহেন্দ্র বলে, 'বৌদি! আপনাকে আমি শান্তিনিকেতনে বাড়ী করে দেবো।' তপন আমার সঙ্গে ছিল।

আমি চলে আসবার আগে বাবা বড়দা ও সেজদাকে চিঠি লিখেছিলেন। তাছাড়া তাঁর সন্তানসম ঋত্বিককে বলেছিলেন, 'লক্ষ্মী চাকরী নিয়ে চলে যাচ্ছে। তুমি সুস্থ হও।'

'বাবা! আমার মদ খেয়েই জীবন কাটবে। লক্ষ্মী যাচ্ছে, খুব ভাল করছে।'

মাত্র বারো দিনের ছুটিতে বারো বছরের সংসার আমাকে তুলতে হয়েছে। বারবার জিজ্ঞেস করি, 'কোন জিনিসের দরকার আছে নাকি?'

'শুধু বই ও রেকর্ডগুলো থাক।'

'বই ও রেকর্ডগুলো রেখে গেলেই বিক্রী করে মদ খাওয়া হবে। তাই ওগুলো দেবনা। ছেলের জন্য যত্ন করে রাখবো। বড়ো হয়ে পড়বে ও শুনবে।'

'তাহলে শুধু পাখাগুলো থাক।'

আমি রাজী হই। যদিও জানতাম, চলে গেলেই বিক্রী করে মদের বোতল আসবে।...

আসবার আগের দিন সারারাত আমি ও তপন বসে জিনিস গুছোচ্ছি।

রাত বারোটায় ১লা জানুয়ারীর বাঁশী শুনতে পাই। আজও মনে পড়ে, প্রতি ১লা জানুয়ারীই মনে পড়ে।

চলে আসার সময় কি আকুল দৃষ্টি!

তবু এসে ট্যাক্সিতে উঠি।

কি করবো, আমি মা! তিনটি ছেলেমেয়েকে তো আমাকে রক্ষা করতেই হবে।

আর সাতদিন পরেই বাড়ী ছেড়ে দিতে হবে। বাবার মন বেদনায় ভারাক্রান্ত। বাবা দীর্ঘ কর্মময় জীবনের পর লেখাপড়া নিয়েই ব্যাপৃত থেকেছেন। বই ছাপা হবার সময়, প্রুফ দেখার জন্য মাঝে মাঝে কলকাতা আসতেন। বৈষ্ণব চৈতন্যচরিতামৃত গদ্যে অনুবাদ করার পর চারখণ্ড ছাপা হয়েছে। এইসময় 'সাহিত্যে ও সাংবাদিকতায় শ্রীহট্টের অবদান' ও 'শিলঙের বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ ও তৎকালীন সমাজব্যবস্থা' বই দুটির জন্য তিনি ব্যস্ত ছিলেন।

ঐ সাতদিন বাবা রোজ তাঁর সন্তানসম ঋত্বিককে দেখতে যেতেন। বাবার সম্বন্ধে অনেকদিনই বলতে শুনেছি, 'লক্ষ্মী! বাবা একজন God।'

বাড়ী ছেড়ে চলে যাবার দিন ওপর থেকে মাসীমা তাদের ঋত্বিকবাবুর জন্যে লালগোলাপের তোড়া পাঠিয়েছিলেন। মনে পড়ে মাসীমা আমাকে অনেকদিন বলেছেন, 'লক্ষ্মী! তোমার ও তোমার বাবার অনেক পুণ্যের ফলেই ঋত্বিকবাবু এখনো বেঁচে আছেন।'

ঐ মৃত্যুপুরীর জীবন ঐখানেই শেষ হলো।

(২)

সাঁইথিয়া সহরের নোংরা ও ধুলোর মধ্যে একটি ছোট্ট বাসা ভাড়া করে তিনটি ছেলেমেয়ে নিয়ে আছি। আমার বেতন খুবই সামান্য।

পাঁচমাস পরেই এল এই চিঠি:

বোম্বে

লক্ষ্মী,

আজ পঁচিশে বৈশাখ। বেশ ক'বছর গেল যাক। এখানে ছবিটা নিয়ে বড়ই বিব্রত আছি। যত তাড়াতাড়ি শেষ করতে পারব

ভেবেছিলাম, হচ্ছে না। Colour Film নিয়ে প্রচুর ঝামেলায় পড়েছি। ২০।২২ শে হয়তো শেষ হবে। তখন কিছু টাকা পাঠাতে পারব।

এ ছাড়াও অন্যান্য কিছু কাজের কথা চলছে। সেও আর এক-সপ্তাহের মধ্যেই বোঝা যাবে। এসব হলে এখানে একটা Flat নেব, একঘরের। হয়তো এমাসের শেষে দু'একদিনের জন্যে কলকাতা যাব, Film Finance Corporation-এর একটা প্রস্তাবের ব্যাপারে।

ও মাসের গোড়ায় যোধপুর যাচ্ছি, দিন দশেকের জন্যে, হলে একটা বড় ঘটনা হবে।

এখানের কাগজগুলোয় আমাকে নিয়ে খুব বড় বড় লেখা বেরোচ্ছে। বাংলাদেশের ওপর একটা বিরাট সভায় খুব জমানো গেছে।

টুনু-বুলু-বাবুকে ভালবাসা।

ঋত্বিক।

নয়াদিল্লী

ভালবাসি। টয়েনক্সকে, বাবুলালকে, বাবুইকে।

বোধহয় তোমাকেও।

আসছি।

চার পাঁচদিন জ্বালাব। না, শান্তিনিকেতনে থাকব। একবার করে দেখে যাব।

তারপর রামপালান পালাব।

চিরকালের মত।

দেখি, পারি কিনা।

Incidentally, P. C. Joshi আজকে আমাকে জড়িয়ে আদর করে চুমু খেয়ে বলেছে Ritwik, you are the only People's artist in India.

আর কিছু চাই না।

ঘৃণা—ঋত্বিক।

বোম্বে

ভালবাসা।

চিঠি পেয়ে প্রাণ ভরে গেল। এরকম গালাগালি আরো দিও। Separation is essential—খুব ভালো কথা। তবু মাঝে মাঝে দেখতে দিও।

আমার জীবন কেটে যাবে, যে করে হোক।

'আমার লেনিন'টা মস্কো Festivalএ গেছে। বোধহয় একটা Prize পাবে। 'দুর্বার গতি পদ্মা' Yogoslavia, GDR, Polandএ বিক্রি হবার একটা ব্যবস্থা করে এসেছি দিল্লীতে।

বাংলাদেশের refugeeদের ওপরে একটা ছবি বোধহয় আরম্ভ করব। টাকা পাঠাতে দুদিন দেরী হবে। তবে এমাসেই পাবে।

বাবুর অসুখ কেমন? বাবুলাল কেমন আছে? টুনির খবর কি? আমি এখন বৌদির কাছে আছি।

আবার ভালবাসা—

বোম্বে

ঘটনা ঘটেছে। Film Finance Corporation প্রায় পাঁচ লাখ টাকা দেবে বলে ব্যবস্থা করেছে। আমার নতুন গল্প 'যুক্তি-তক্কো আর গপ্পো', এটা করছি আগামী মাসের মাঝামাঝি থেকে।

তিন তারিখে সকালের Flightএ কলকাতা আসছি। চার তারিখে কয়েক ঘণ্টার জন্য তোমার কাছে যাব। শক্তি সামন্তর জন্যে 'মেঘে ঢাকা তারা' হিন্দী একটা বানাচ্ছি। ওটা নভেম্বরে আরম্ভ করব।

বৌদির জন্যে একটা হিন্দী ছবি করব। গল্পটা ভাবছি। ওটাও ডিসেম্বর নাগাদ চালু করব। রাজেশ খান্না আর শর্মিলা ঠাকুরকে নিয়ে।

বান্দ্রায় একটা ছোট বাড়ী নিয়েছি। এখন বোম্বাইতে বেশ কিছুদিন থাকতে হবে মনে হচ্ছে। 'মরিসাস'এ একটা ছবি করার

জন্য যেতে হবে। আমি আগামী ফেব্রুয়ারীতে যাব বলেছি। এক-বছর থাকতে হবে। কিছু পয়সা নিয়ে যেতে পারব বলে মনে হয়।

বাকী সাক্ষাতে হবে।

মুক্তি যুদ্ধ আরম্ভ হবার পর আমার এক ভাগ্নীকে নিয়ে সাঁইথিয়া আসেন। আমার ননদ ভবী (প্রতীতি) ওর ছেলেমেয়েদের নিয়ে থাকে ঢাকা কুমিল্লায়। ওরই মেয়ে ছিল সঙ্গে। মুক্তিযুদ্ধের ওপরে তোলা ছবিটি আমি দেখিনি।

আমার সমস্ত কাগজপত্র ও চিঠিপত্র রেখে দেওয়া অভ্যেস। তাই ঐ সময়ের চিঠিগুলোও রেখে দিয়েছিলাম। চিঠির মধ্যে যে বৌদির উল্লেখ আছে, সেই বৌদি হলেন শ্রদ্ধেয়া মনোবীণা রায়। বিমল রায়ের স্ত্রী। বৌদি তাঁর দেওরকে খুবই স্নেহ করতেন। 'যুক্তি তক্কো গপ্পো' লেখার সময় তাঁর বাড়ীতে থাকার ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন। খুব আদর যত্ন করতেন। গল্পটির স্ক্রিপট ফিল্ম ফিনান্স কর্পোরেশনে জমা দেবার সময় যে টাকা জমা দিতে হয়, সেই টাকাও দেওরকে দিয়েছিলেন।

এরপরেই স্ক্রিপটটি আমাকে সাঁইথিয়া এসে শোনালেন একদিন। টাকা পকেটে থাকলেই নবাব বাহাদুর। কলকাতা থেকে সাঁইথিয়া গাড়ী করে আসা হয়েছিল। সঙ্গে ছিল শুভেন্দু। আর শাড়ী ও জামাকাপড়।

সাঁইথিয়া এসে খুব মদ খেলে যদি আমি কিছু বলতাম, শুনতে হতো, "লক্ষ্মী! তুমি আমাকে divorce করবে? আমি তাহলে তোমার বারান্দায় এসে শুয়ে থাকবো।" ফলে আমি সব সময়ই চুপচাপ থাকা শ্রেয় মনে করেছি। মনে পড়ে সাঁইথিয়া এসে ২।১ দিন থাকলে 'সঞ্চয়িতা' পড়তেন। আশেপাশের সহশিক্ষয়িত্রীদের মেয়েরা এসে জ্যেঠাকে ঘিরে থাকতো। 'ছেলেটা' কবিতা খুব প্রিয় ছিল ওঁর। এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে, যে কোন নাটক বা স্ক্রিপট পড়ার সময় অভ্যেস ছিল প্রতিটি চরিত্রের অভিনয় করে পড়া। কোন ক্লান্তি ছিল না পড়ায়।

(৩)

এর পরে একটা চিঠি পাই শান্তিনিকেতনে যাবার জন্য। ওখানে ঢাকা থেকে হাবিবুর রহমানকে নিয়ে আসেন। 'তিতাস একটি নদীর নাম' বইটি ছবি করার জন্য স্ক্রিপট আকারে লেখা হয়েছে।

হাবিবুর রহমান বলেন, 'একটা চেষ্টা করবো।' কিছু টাকাও দেন।

আমি বলি, 'আমি দূর থেকেও আপনার সঙ্গে আছি। কারণ কাজ করলে আমার চাইতে বেশী খুশী কেউ হবে না। অন্য কোন কিছু আমি আর এখন ভাবিনা। শুধু এই একটি ইচ্ছার কেন্দ্রবিন্দুতে আমার সমস্ত চিন্তা আচ্ছন্ন ও পরিব্যাপ্ত।

'তিতাস একটি নদীর নাম' আগে পড়েছিলাম। একটি উপন্যাস লিখেই অদ্বৈত মল্লবর্মণ মারা গিয়েছিলেন। কিন্তু একটি বইয়ের জন্যই তিনি স্মরণীয় হয়ে আছেন। অদ্বৈত মল্লবর্মণ জাতিতে মালো। নিজের জীবনের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে তিতাসের পারের জেলেদের নিয়ে লিখেছেন বিখ্যাত উপন্যাসটি।

সুতরাং তিতাস স্ক্রিপটটি ছবি করার কথা শুনে খুবই খুশী হয়েছিলাম। স্ক্রিপটটি শুনে মুগ্ধ হই। আগেই লিখেছি কোনো কিছু পড়তে কোনো ক্লান্তি নেই। আর চরিত্রানুযায়ী অভিনয় করতে করতে পড়া। বিরাট পট-ভূমিকায় উপন্যাসটি লেখা। এপিক ধরণের।

নদীমাতৃক বাংলাদেশে ছবিটির সুটিং আরম্ভ হয়। আর্টিস্টদের মধ্যে সবচেয়ে বেশী শুনেছি রোজীর কথা।

একবার বাংলাদেশ থেকে গাড়ী করে বহরমপুর হয়ে সাঁইথিয়া এসেছিলেন। কাউসার ও সেবক গাড়ী চালিয়ে এসেছিল।

এদিকে কলকাতায় এসে 'যুক্তি তক্কো গপ্পে'রও সুটিং চলে। নানারকম অসুবিধার মধ্যে নিজে অনেক কিছুরই ব্যবস্থা করে, অসুস্থ অবস্থায় কাজ করতে হয়।

মনে পড়ে একদিন বাইরে রাত্রিতে সুটিং হয়েছিল। তপতীদির কাছ থেকে অনুমতি নিয়ে রাত্রিতে সুটিংয়ের জন্য নিজেই লাইটের বন্দোবস্ত করেন। প্রায় সারারাত সুটিং চলে।

গলায় টিউমার নিয়ে দেবব্রত বিশ্বাসের গাওয়া গানে লিপ দিতে দেখে স্তম্ভিত হই। এর পরে টিউমারটি ফাটে। সেই অবস্থাই শিলং গিয়ে চুলে কলপ লাগিয়ে রোমান্টিক দৃশ্যটি নেওয়া হয়।

কলকাতার কাজ শেষ হলো। বীরভূমের সুটিংটা তখনো বাকি। কিন্তু তক্ষুণি সবাই সহযোগিতা না করায় সুটিংটা শেষ করা সম্ভব হয়নি। কিছু রামপুরহাটের দিকে কাজ হয়। সেখানেও দুদিন সারারাত সুটিং চলে। পরদিন নক্সাল ছেলেদের সঙ্গে ফায়ারিং-এর দৃশ্যটি তোলা হয়। যে ছেলেটি

মেসিনগান চালাতে চালাতে মারা যায় সে বাংলাদেশের ছেলে। নিজের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থাকায় অভিনয় বাস্তব ও স্বাভাবিক হয়েছে।

আমি সাঁইথিয়া আসি। তারপরেই ঢাকা থেকে অজ্ঞান হবার চিঠি পাই।...এরপরে সাঁইথিয়া ঘুরে যাবার পর একটা চিঠি।

ঢাকা

গতকাল বিকেলে স্যুটিং শেষ করে ফিরেছি। কাজ প্রায় শেষের দিকে। তবু Editing ইত্যাদি করে ফিরতে ফিরতে আরো একমাস অন্তত লাগবে। আর একেবারে সব সমাপ্ত করে ফিরতে চাই, কারণ এখানে election মার্চের গোড়ায়। যত ঐ সময়টা এগোবে, ততই সাধারণভাবে কাজ করার অবকাশ কমতে থাকবে। বুঝতেই পারছো।

এখানে এসে খবর পেয়েছিলাম, কে যেন আমাকে বারবার Trunk-Call করার চেষ্টা করেছিল। মনে হয়েছিল, তোমরা। পীযূষকে phone করিয়ে, (অন্যের through দিয়ে) জানলাম, তোমরা ভালো আছ। যাই হোক, খবর জানিও।

আর একটি কাজ। তুমি অতি অবশ্য পত্রপাঠ তপনকে চিঠি লিখে রমেশকে যোগাযোগ করে Production এর বর্তমান অবস্থা detailএ আমাকে লিখে জানাতে বোল। তপন যেন পীযূষের সঙ্গে যোগাযোগ করে জানে, পীযূষ নিজের কাজে কত ব্যস্ত, মণিদি শাঁওলী angleটার আর কিছু development হয়ে গেছে কিনা আর বাবুলি জাতীয়রা কী করছে এখন।

দেবু বড়ুয়ার সঙ্গে দেখা করে যেন জানে, টাকা Bankএ পড়েছে কিনা। রমেশকে জিজ্ঞাসা করে, Editing আলমারীতে আমার Script টা ঠিকমত আছে কিনা। প্রত্যেকটি কথা আমাকে এ চিঠি থেকে quote করে লিখো তপনকে। ও যেন সোজা আমায় লেখে, তোমাকেও লেখে।

তুমি কি ৫০০০ টাকা পেয়েছ দেবুর কাছ থেকে ?

আমি বোধহয় ফেব্রুয়ারীর শেষ থেকে একমাস কাজ করে, যুক্তি তক্কো শেষ করতে পারব।

পরে আবার লিখব। উত্তর দিও। ভালবাসা—টুনু-বুলু-বাবুকে আদর।

বাংলাদেশ ও কলকাতায় ছুটি ছবি একসঙ্গে করতে গিয়ে অসম্ভব চাপ ও ড্রিঙ্কের স্বইংএ ভয়ানক অসুখ হলো।

ঢাকা থেকে নিয়ে আসার পর হাসপাতালে বসে 'যুক্তি তক্কো গপ্পো' কিভাবে শেষ করা হবে, সব সময় এই কথাই বলতেন। কলকাতার তখনকার রাজনৈতিক পটভূমিকায় গল্পটি লেখা। ছবিটি শেষ করতে দেরী হলে ঐ পটভূমিকা থাকবে না।

মেডিকেল কলেজে বসে এফ. এফ. সি-কে একটা চিঠি লেখা হয়েছিল। শিগ্‌গীরই একজন অফিসার পাঠিয়ে দিতে—একটা কালবৈশাখীর ঝড়ের দৃশ্য নেওয়া হবে। ঐ ভয়ানক অসুস্থ অবস্থায় চিঠিটি লিখে পাঠাবার জন্য অস্থির। শেষ পর্যন্ত পাঠিয়েছিলাম।

টি. আর. এ. চেস্ট হাসপাতালে বসেও ঐ একই কথা। ছবিটি শেষ করতে দেরী হলে কি হবে? প্রায় আট মাস হাসপাতালে থাকার পর হঠাৎ রিস্ক বণ্ড সই করে সাত দিনের জন্য বোম্বে গিয়ে, কাজকর্ম শেষ করে পুণা গিয়ে ভয়ানক ড্রিঙ্ক করে আবার অজ্ঞান। টেলিগ্রাম ও ট্রাংককল আসে।

হাসপাতালে আরো কিছুদিন থাকার কথা ছিল। চিকিৎসা শেষ হয়নি। কিন্তু তার আগেই বেরিয়ে আবার অসুস্থ। বারবার এই খবর ও অসুস্থতা আমাকে চিন্তায় মুহ্যমান ও দিশেহারা করে। নিরবচ্ছিন্ন শুধু একটি চিন্তা: সুস্থ বা অসুস্থ অবস্থায় কোথায় থাকবেন? কোথায় খাবেন? কি এর সমাধান? কোথায় এর শেষ?

কেউ কি আমাকে বলে দিতে পারে?

এই তীব্র সমস্যা সব সময় মনকে আচ্ছন্ন করে রাখতো।

আমার সামান্য চাকরী। তিনটি নাবালক ছেলেমেয়ে। বাবা বৃদ্ধ হয়েছেন। ভাইটি অনেক করেছে। ডাক্তাররাও করেছেন।

কিন্তু সমস্তই ব্যর্থ।

ছাত্রাবস্থায় একটি কবিতা পড়েছিলাম। একটানা সেলাই করে যাওয়ার একঘেয়ে বিরতিহীন ছন্দ—

Seam, Gusset and Bend,
Bend, Gusset and Seam:...

তোমার এই বিরতিহীন আবর্ত থেকে শেষ পর্যন্ত কেন বেরিয়ে আসা হলনা জানি না।...মাথা অবশ হয়ে যেতো। মনে হতো আমার মতো অভাগিনী পৃথিবীতে কেউ নেই। এ জীবনে এর আর অবসান নেই।...

মনে পড়ে কমরেড পি. সি. যোশী লিখেছিলেন আমাকে একটা চিঠিতে :

> I know your dedication to him & your sacrifice & suffering. Have patience & carly on. Yours is the silent and unsung heroism, the real stuff.

অন্য একটি চিঠিতে :

> ...I know you have the spiritual strength to carry on.

শ্রদ্ধেয় বিনয়দা (বিনয় রায়) লিখেছিলেন :

> এককালে শিখেছিলে জীবনটা সংগ্রাম, সংগ্রামেই শান্তি ও সুখ। কথাটার কত রকম অর্থ হয় ভেবে দেখেছ কি ?

আর বহু বহু আগে শ্রদ্ধেয় কাকাবাবু শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছিলেন :

> মানুষ কি নিয়ে বাঁচবে ? দৈনন্দিন খাওয়া পরার উর্ধ্বে একটি অম্লান, অস্খলিত সৃষ্টির ছন্দ চলেচে, যে মানুষ জীবনে সেই ছন্দের সন্ধান পেয়েছে, সে পেয়েছে জীবনের অমৃতপাত্রের সন্ধান। প্রাণসংগ্রামের অমোঘ অস্ত্রগুলির সন্ধান। প্রাচীনকালে তাই মৈত্রেয়ীর মুখ দিয়ে উচ্চারিত হয়েছিল যো বৈ ভূমা তৎ সুখং। নাল্পে সুখমস্তি। ভূমা কিনা বিরাট মরণহীন, ক্ষয়হীন বিরাট। এই ভূমার সাধনাই সবচেয়ে বড় সাধনা।
>
> এখানে সাহিত্যের প্রয়োজন। সাহিত্য দেয় সেই লোকের ইঙ্গিত, দৈনন্দিন প্রয়োজনের অতীতে দিগ্‌বলয়রেখার ওপারে যে লোক অস্পষ্ট। যে লোকের স্পষ্ট সন্ধান মেলে উপনিষদের কবিতায়, গীতার বাণীতে, রবীন্দ্রনাথের গানে। আমি আরণ্যক-এ মুক্তরূপা ধরিত্রীর যে চিত্র আঁকবার চেষ্টা করেছি, 'দেবযান'-এর শেষের পাতায় যে নিদ্রিত দেবতার কথা বলেছি, এদেরও মুলে সেই একই কথা—অঙ্গুলি সঙ্কেতে ভূমাকে দূর থেকে দেখানোর ক্ষীণ প্রচেষ্টা। ভগবানকে যে ভালবাসে, আমার মনে হয় ভূমার আস্বাদ সে সহজেই পায়।
>
> তোমার বয়স অল্প। এ বয়সে বিলাসী হয়ে যেওনা। ভূমার

সাধনে মন দাও, সাহিত্যের মধ্যে তার ঠিকানা মিলবে। জীবনে শান্তি পাবে।

বিশ্বের দেবতাও মস্ত বড় একজন কবি, অনাদ্যন্ত মহাযুগ ধরে এই রকম কত শিলাস্তৃত ঝরণার তটে, অনন্ত নীহারিকা ছড়ানো আকাশের পটে, বনকুসুমের পাপড়ির দলে, বনবিহঙ্গ কাকলীতে, জাতির ও দেশের ও মহাদেশের অবনমনে ও পুনরুত্থানে তিনি আপনমনে তাঁর বিরাট কাব্য লিখেই চলেচেন। কিন্তু অতবড় মহাকাব্য পাঠ করবার মত শক্তিধর পাঠক কোথায়? দুএকটা সর্গের একআধ পংক্তি কেউ পড়ে, কেউ বোঝে, কেউ বোঝেনা। গীতায় বলেছে, শ্রুত্বাপেণং বেদ ন চৈব কশ্চিৎ। "শ্রবণ করিয়াও ইহা অনেকে বুঝিতে পারেনা।" দুএক সর্গ যারা বোঝেন, তাঁরাই গেটে, কালিদাস, রবীন্দ্রনাথ, শেলি হন।

আশা করি লক্ষ্মীমা তুমি এই কাব্য পড়বার চেষ্টা করবে। সাধনা চাই এ জন্যে। খাটুনি আছে। শাস্ত্রে বলে, ন পচ্ছতি বিনা পানং ব্যাধিরৌষধ শব্দতঃ, বিনাহপরোক্ষানুভবং ব্রহ্ম শব্দেন মুচ্যতে।

"ঔষধ ঔষধ বলিয়া চীৎকার করিলে রোগ সারেনা যেমন, তেমনি অপরোক্ষানুভব (realisation) ব্যতিরেকে ব্রহ্ম ব্রহ্ম বলিয়া চীৎকার করিলেই কাজ হইবে না। অল্পবয়স থেকেই এর জন্যে চেষ্টা কর। জীবনে অমৃতত্ত্বকে লাভ করতে পারো।

আশীর্বাদ নাও।···

আর একটা চিঠি:

···দেশে ফিরে এসেছি, ঘেঁটুফুল আর নেই, তবে পানকলম শেওলার সুগন্ধি কুচো কুচো সাফা ফুল ফুটেচে নদীজলে আর শিরীষ ফুল ফুটেচে আমাদের আমবাগানের পেছনে—নক্ষত্রমালা ও জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর পুঞ্জে পুঞ্জে নব নবরূপে যিনি বিদ্যমান, তিনিই কখনো ঘেঁটুফুলের শুভ্রদলে, কখনো কুঁচকাঁটার সোণালিফুলে আমাদের ঘরের পেছনে এসে ধরা দেন, নিতে পারলেই হোল।

তমেব ভান্ত মনুভাতি সর্ব্বং

তস্য ভাষা সর্ব্বমিদং বিভাতিঃ

তিনি আছেন, তাই সব কিছুই আছে। তাঁর আলোতেই জগৎ আলো।

লক্ষ্মী, সেই দৃষ্টিকে লাভ করবার চেষ্টা কর, যে দৃষ্টি অমৃতত্বকে মর্ত্যে বহন করে আনে। আর সব দুদিনের। আমার মনে হয় তার অঙ্কুর তোমার মধ্যে আছে। আশীর্বাদ করি সেই অঙ্কুর মহীরুহে পরিণত হয়ে তোমার জীবনকে ফুলেফলে সার্থক করে তুলুক।

এই চিঠি ঐ বয়সে আমাকে অভিভূত করেছিল। তখন জীবন ছিল সুন্দর। সামনে ছিল অনেক স্বপ্ন, আশা ও ভবিষ্যৎ। অনেক পড়াশোনা করবো, একটা কিছু করবো ইত্যাদি। তাছাড়া আমি প্রকৃতিপ্রেমিকও ছিলাম।

তাই বিভূতিভূষণের রচনা ও চিঠি আমার জীবনে ছিল অমূল্য সম্পদ।

...তারপর বহুবছর পেরিয়ে এসেছি। কিন্তু ঐ স্বপ্ন, আশা ও ভবিষ্যৎ অনেক দূরে পেছনে ফেলে এসেছি। বাস্তব জীবনের রূঢ় আঘাতে সবকিছু ছিন্নভিন্ন হয়ে গেছে। সুবর্ণরেখার ছোট্ট সীতা কি জানতো তার সামনে কি আসবে? কিন্তু এটাই সত্যি, এটাই বাস্তব।...

তাই আজ আছে শুধু জীবনে কিছু কঠিন কর্তব্য। ছোট্টবেলার শিলং, মামার বাড়ী ও দেশের বাড়ীর কথা মনে পড়ে। আর মার কথা কখনোই ভুলতে পারি না। মা থাকলে জীবনটা হতো অন্য-রকম, আমার জীবনের সব সমস্যারই সমাধান হতো।...

মনে পড়ে পার্টির কথা। কিন্তু ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি টুকরো টুকরো হয়ে গেছে।

আর যে মানুষটি অ্যালকোহল স্পর্শ করতেন না, তিনি সম্পূর্ণ অ্যালকোহ-লিক ও অসুস্থ এবং চির অসুস্থ হয়েছেন।

কিন্তু আমাকে জীবনে একটা জায়গায় গিয়ে পৌছতেই হবে। আমি চেষ্টার ত্রুটি করিনি। আর একমাত্র বিশ্বাস করি সংগ্রামে। সংগ্রাম ছাড়া কোন সমাধান নেই। সংগ্রামই জীবন। জীবনই সংগ্রাম।

আমি সাঁইথিয়ার নোংরা ও ধুলোর মধ্যে আছি। আমার কাছে এহো বাহ্য।

কলকাতায় ছুটির সময় ছেলেমেয়েদের নিয়ে গেলে মহেন্দ্র থাকবার ব্যবস্থা করে দেয়, আমার নিজস্ব কোন জায়গা নেই। আমার কাছে এহো বাহ্য।

আমার একমাত্র স্বপ্ন, আশা ও আকাঙ্ক্ষা, যাঁর মনন ও দার্শনিক গভীরতা দেখে আমি অভিভূত ও মুগ্ধ হয়েছিলাম, তিনি এই অসুস্থ অবস্থায়ও কি সৃষ্টি করছেন, কি কাজ করছেন।

আগেই লিখেছি, আমার জীবনের সার্থকতা এইখানেই।

(৪)

পুণা থেকে সাঁইথিয়া আসেন। এরপরে মহেন্দ্র নিজের কাছে রেখে সুস্থ করে। 'যুক্তি তক্কো গপ্পো'র সুটিং শেষ হয়।

'৭৪ সালের গ্রীষ্মের ছুটির সময় গিয়ে আমি 'যুক্তি তক্কো গপ্পো' ও 'তিতাস একটি নদীর নাম' ছবি দুটি দেখি।

'তিতাস একটি নদীর নাম'-এর সুটিং একটানা অনেকদিন জলে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে, বৃষ্টিতে ভিজে ভিজে করতে হলো। পরে ভয়ানক অসুখ হয়। ১০৩° ডিগ্রী জ্বর নিয়ে অসুস্থ অবস্থায় ছবিটি শেষ করলেন। ছবির শেষদৃশ্য সুটিং করার দিন জ্বর নিয়ে লঞ্চে নদী পেরিয়ে তপ্ত বালুর চরের ওপর দিয়ে অনেক দূর হেঁটে গিয়ে বাসন্তী মারা যাবার শেষ দৃশ্য তোলা হলো। তারপরেই অজ্ঞান। এরপর ঢাকার হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।

কলকাতায় এসে হাসপাতালে থাকতেই বাংলাদেশে ছবিটি দেখানো শুরু হলো। হাবিবুর রহমান আমার সামনেই লিখিয়ে নিয়েছিলেন ছবিটির এডিটিং (তাদের ঋত্বিকদার নির্দেশ অনুযায়ী) শেষ করে ছবিটা রিলিজ করবেন।

অনেক চেষ্টা হয়েছে ছবিটি এদেশে আনবার জন্য। সফল হয় নি। এটা যে কি মর্মান্তিক এবং দুর্ভাগ্যজনক! আমাদের বাংলাদেশ ভাগ হয়ে গেছে। সুতরাং সাংস্কৃতিক আদানপ্রদানও আর সম্ভব নয়।

ঋত্বিক ঘটকের প্রতিটি ছবিতে তারই মর্মবেদনা উদ্ঘাটিত। এবং তাঁর প্রিয় বাংলাদেশে, মরণপণ করে শেষ করা ছবিটি এদেশের দর্শকরা দেখতে পেলেন না।

এ ট্র্যাজেডি ও পরিহাস কি কেউ সহ্য করতে পারে?

'তিতাস একটি নদীর নাম' ছবিটির কথা ভাবলে আবার বিস্ময়ে মন স্তব্ধ হয়ে যায়। লালন ফকিরের গান দিয়ে ছবি শুরু হচ্ছে।...নদীর সীমাহীন জলরেখা দিগন্তে মিলিয়ে যাচ্ছে, সেই জলে মাঘমণ্ডল ব্রতের ভেলা ভাসিয়ে ছবির প্রথম দৃশ্যের আরম্ভ।

দোলের দিন অন্য গ্রামে গিয়ে ঘটনাক্রমে যে মেয়েটির সঙ্গে কিশোরের মালাবদল হয়, তার আগে মেয়েদের নাচ ও গানের দৃশ্যটি অপূর্ব। নৌকো করে ফেরার সময় পালতোলা নৌকোর সারি ও বাঁশীর স্বর ভোলা যায় না। নৌকোয় ডাকাতি হয়, মেয়েটির মুখটাও ভাল করে দেখেনি, কিশোর পাগল হয়ে যায়। এই দৃশ্যও মর্মস্পর্শী।

দশ বছর পরে অনন্তর মা অনন্তকে নিয়ে ফেরে কিশোরের গ্রামে।... আর এক দোলের দিনে কিশোরের পূর্বস্মৃতি ফিরে আসে। অনন্ত বয়াকে 'বউ' বলে চেনার মুহূর্তেই মৃত্যুর মুখে ঢলে পড়ে। অনন্তের মারও শেষ নিঃশ্বাস পড়ে তিতাসের জলে। কবরী চৌধুরীর অভিনয় খুবই সহজ সুন্দর। বহু মেয়েকে দিয়েই এই ছবিতে অভিনয় করানো হয়েছে। আর সংলাপ সবই পূর্ব বাঙলার।

ঋত্বিক ঘটক মনে প্রাণে বাঙালী : কথাটি বহুবার শুনেছি। এই ছবির ভাষা, সঙ্গীত, দৃশ্য ঐ মরমিয়া বাংলাদেশের। যা এদেশে খুঁজে পাওয়া যায় না, যা মর্মান্তিক ভাবে হারিয়ে গেছে। পূর্ব বাঙলার সংস্কৃতি ও প্রকৃতিকে উজাড় করে দেখানো হয়েছে এই ছবিতে। বাংলা দেশের মানুষটির শেষ শ্রদ্ধাঞ্জলি ঐ দেশের প্রতি, সংস্কৃতির প্রতি। এ এক মহাকাব্য।

প্রতিটি ছবিতেই প্রতিটি সট্ নিজে কম্পোজ করেন, প্রতিটি অভিনেতা-অভিনেত্রীকে সমস্ত অভিনয় বারবার করে দেখিয়ে দেন। সুতরাং কিছুটা অনুমান করতে পারি, কি পরিশ্রমই না এ ছবিতে করা হয়েছে।

ছবির দ্বিতীয় ভাগের আগে অনন্ত চলে যায় নয়নতারার সঙ্গে। এর পরে বাসন্তীই প্রধান চরিত্র। বাসন্তীর ভূমিকায় রোজী সামাদের অভিনয় অতুলনীয়।

দ্বিতীয় ভাগে তিতাসের জল শুকিয়ে যাচ্ছে, চর দেখা দিয়েছে। সুতরাং এই জেলে সম্প্রদায়ের জীবন ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু উপন্যাসটি যেভাবে শেষ হয়েছে, ছবিটি সেভাবে শেষ হয় নি। নতুন জীবনের ইঙ্গিতে ছবি শেষ হয়েছে—যেমন শেষ হয়েছিল 'সুবর্ণরেখা' ও 'অযান্ত্রিক'।

"সভ্যতার মৃত্যু নেই, সভ্যতা পরিবর্তিত হয় কিন্তু সভ্যতা চিরদিনের। সেখানে তিতাসে ধানের ক্ষেত জন্মেছে, সেখানে আর একটা সভ্যতার আরম্ভ। সভ্যতার মৃত্যু নেই। মানুষ অমর, individual মানুষ মরণশীল, কিন্তু মানুষ অমর। সে একটা থেকে আর একটা ধাপে গিয়ে পৌছয়, সেই কথাটাই আমি ছবিতে বলার চেষ্টা করেছি। I cannot end in a pessimistic mood, সেটা তাহলে মিথ্যা বলা হবে।"*

ছবির শেষ দৃশ্যে বাসন্তী মারা যাবার আগে তিতাসের চরে বালি খুঁড়ে ঘটিতে জল তুলবার চেষ্টা করছে, কিন্তু অতিকষ্টে তোলা জলটুকু পড়ে যায়। কানে আসে বাঁশীর শব্দ—একটা ছোট্ট ছেলে সবুজ ধানের ক্ষেতে বাঁশী বাজাতে বাজাতে দৌড়চ্ছে ও হাসছে।

'তিতাস একটি নদীর নাম' ছবি করা সম্বন্ধে নিজের উক্তি :

"বাংলা দেশ বলতে আমার যা ধারণা ছিল, ঐ দুই বাংলা মিলিয়ে সেটা যে তিরিশ বছরের পুরোনো সেটা আমি জানতাম না। আমার কৈশোর এবং প্রথম যৌবন পূর্ব বাঙলায় কেটেছে। সেই জীবন, সেই স্মৃতি, সেই nostalgia আমাকে উন্মাদের মত টেনে নিয়ে যায় তিতাসে, তিতাস নিয়ে ছবি করতে।—তিতাস উপন্যাসের সেই periodটা হচ্ছে চল্লিশ পঞ্চাশ বছর আগেকার, যা আমার চেনা, ভীষণভাবে চেনা। তিতাস উপন্যাসের অন্য সব মহত্ত্ব ছেড়ে দিয়েও এই ব্যাপারটা আমাকে প্রচণ্ডভাবে টেনেছে। ফলে তিতাস একটা শ্রদ্ধাঞ্জলি গোছের সেই ফেলে আসা জীবনস্মৃতির উদ্দেশ্যে। এ ছবিতে কোন রাজনীতির কচকচি নেই, উপন্যাসটা আমার নিজের ধারণায় এপিকধর্মী। এ ছবিতে আমি প্রথম এই ঢঙটা ধরবার চেষ্টা করেছি। আমার শৈশবের সঙ্গে তিতাসের বহু ঘটনা জড়িয়ে আছে, অনেক কিছু আমি নিজের চোখে দেখেছি, ঐ যে বললাম এই তিরিশ বছর মাঝখানে blank. আমি যেন সেই তিরিশ বছর আগেকার পূর্ব বাংলায় ফিরে যাচ্ছি।

একুশে ফেব্রুয়ারী ওরা আমাকে, সত্যজিৎবাবুকে এবং আরো কয়েকজনকে state guest করে নিয়ে গিয়েছিল ঢাকায়। প্লেনে

* 'চিত্রবীক্ষণে'র প্রতিনিধির সঙ্গে সাক্ষাৎকার।

করে যাচ্ছিলাম, পাশে সত্যজিৎবাবু বসে, যখন পদ্মা cross করছি, তখন আমি হাউ হাউ করে কেঁদে ফেললাম। সে বাংলাদেশ আপনারা দেখেননি, সেই প্রাচুর্যময় জীবন, সেই সুন্দর জীবন······আমি যেন সেই জীবনের পথে চলে গেছি, সেই জীবনের মাঝখানে······ এখনো যেন সব সেরকম আছে, ঘড়ির কাঁটা যেন এর মাঝে আর চলেনি। এই বোকামি নিয়ে, এই শিশুসুলভ মন নিয়ে তিতাস আরম্ভ।

ছবি করতে করতে বুঝলাম সেই অতীতের ছিঁটেফোটা আজ আর নেই, থাকতে পারে না। ইতিহাস ভয়ঙ্কর নিষ্ঠুর, ও হয়না, কিসৃসু নেই, সব হারিয়ে গেছে। এ ছবির Script লেখা থেকে স্যুটিংয়ের অর্দ্ধেক পর্যন্ত আমি মানুষের সংস্পর্শে প্রায় আসিনি। এখান থেকে ঢাকায় touch করে চলে যেতাম ব্রাহ্মণবাড়িয়া, নইলে কুমিল্লা, নইলে আরিচাঘাট, পাবনা, নারায়ণগঞ্জ, বৈদ্যরবাজার এইসব, মানে গ্রামে গঞ্জে, ছবিটা তো গ্রাম-গঞ্জ-নদী নিয়েই। কাজেই সমস্ত সময়েই গ্রামে থেকেছি······কাজেই ছবি করার first half পর্যন্ত এখনকার বাংলা দেশের যা চেহারা তার থেকে completely বিচ্ছিন্ন ছিলাম···তারপর ঢাকায় গিয়ে কয়দিন থাকতে হল, ছবির এটা ওটা সেটার জন্য। তখন ক্রমশ দেখলাম সমস্ত জিনিষটা ফুরিয়ে গেছে মানে একেবারেই গেছে, আর কোনদিন ফিরবে না, এটা খুবই দুঃখজনক আমার কাছে, কিন্তু দুঃখ পেলে কি হবে, ছেলে মারা গেলে লোকে শোক করে কিন্তু it is inevitable.

মানুষের চিন্তাধারা পালটে গেছে, মানুষের মন গেছে পালটে। টাকাকড়ির সমস্যা, খাওয়াদাওয়ার সমস্যা, দারিদ্র্য ওখানেও আছে। ···কিন্তু সমস্যাটা একই, মানুষের সাংস্কৃতিক মন পচে গেছে, অবশ্য আশার কথা কিছু young ছেলে সবে Universityতে ঢুকেছে, বেরিয়েছে বা বেরোচ্ছে, এমন সব ছেলে তাদের মধ্যে একটা প্রচণ্ড বোধ এবং অত্যন্ত সচেতনতা এসেছে। এরাই ভরসা, ওখানকার ভালো যা কিছু সবই এদের contribution।"

ঢাকা থেকে আসার পরে মুখেও অনেক কথা শুনেছিলাম। তিতাস আরম্ভ করার আগের মন তখন একেবারেই ছিল না।

এবারে সুস্থ হবার পর, ছবিটি এডিটিং করে আসার পর, ইচ্ছে ছিল ছবিটি এদেশে এলে আবার রি-রেকর্ডিং করা হবে।

আমরা শুধু অপেক্ষা করছিলাম পরে এডিটিং করা ছবিটা কবে আসবে? আসেনি। চেষ্টার ত্রুটি হয়নি।

(৫)

'যুক্তি তক্কো গপ্পো' রাজনৈতিক ছবি।

"ছবির নাম হচ্ছে, 'যুক্তি তক্কো ও গপ্পো', 'Arguments and a story'। তোমাদের গল্প না হলে ভালো লাগে না, তাই একটা গপ্পো দিচ্ছি, আসলে এটা যুক্তি তর্ক, it is completely a political film...

ঐ সময় আমার জীবনে যা ঘটে গেছে, ঐ একাত্তরে, সেখান থেকেই ছবির starting point. আর, ঐ মাতাল অবস্থায় একাত্তরের গোড়ার কলকাতার বুকে বসে কলকাতাটাকে খুব ওতপ্রোতভাবে দেখা গিয়েছিল।...তাই আমি সমাজের প্রতিটি স্তরকে কেটে দেখা এবং দেখানোর চেষ্টা করেছি, সমস্ত মানুষ কিভাবে react করেছিল সে-সময়, সালতামামি গোছের আর কি! Starting of Point, আরম্ভটা শুধু আমার জীবনের কিছু ঘটনা নিয়ে।...মোদ্দা কথা হচ্ছে রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক পটভূমি তখন যা ছিল, তা যেভাবে আঘাত করেছিল শহরের মানুষকে, শহরের মানুষ শুধু না, এ ছবিতে আমি গ্রামবাংলাতেও গেছি, তা বেশীর ভাগই আমার অভিজ্ঞতা থেকে দেখা। এদিক থেকে এ ছবিকে কিছুটা ব্যক্তিগত, আত্মচরিতমূলক বলা যায়, তবে আত্মচরিতমূলক বলতে যা বোঝায়, এ ছবি সে ধরণের নয়। যা দেখেছি, যা বুঝেছি, যা পেরেছি ছবিতে তা বলার চেষ্টা করেছি। যুক্তি-তক্কো নিয়ে বেশী প্রশ্ন করবেন না। ছবি শেষ হোক, ছবি চলুক, তারপর তর্কাতর্কি করা যাবে।"*

দ্বিতীয় সাক্ষাৎকারটি নেওয়া হয় সেপ্টেম্বর মাসে:

"...এটা আমার সম্পূর্ণ অভিপ্রেত ব্যাপার। কারণ আমি মনে করি যে আমাদের দেশের যে বিরাট Store house আছে, যে ভাণ্ডার আছে,

* চিত্রবীক্ষণের প্রতিনিধিদের সঙ্গে সাক্ষাৎকার থেকে অংশবিশেষ।

myth, পুরাণ ইত্যাদি—তার মধ্যে যে wisdom আছে যে জ্ঞান আছে সেগুলো আজকালকার আমরা প্রায় ভুলে যাচ্ছি। আমরা সেগুলোকে আর পাত্তা দিইনা অথচ তার মধ্যে প্রচুর সত্য আছে।...

আমাকে সবচেয়ে বেশী আকর্ষণ করে ভারতীয় প্রাচীন ঐতিহ্য, তার মধ্যে ঋগ্বেদ থেকে আরম্ভ করে সংহিতা, ব্রাহ্মণ, আরণ্যক, শ্রুতির সমস্ত অংশ, উপনিষদ, স্মৃতি, পুরাণ এবং মহাকাব্য। এগুলো নিয়ে পড়াশুনা করলে দেখা যায় যে আমাদের দেশের প্রাচীন ঋষিই বল আর যাই বল ঐ লোকজন যাঁরা ছিলেন তাঁরা human psychology কত গভীরভাবে অনুধাবন করেছিলেন।

...কাজেই সেটাকে টেনে বের করার একটা প্রয়োজন আছে—টেনে বার করে সেটাকে আজকের জগতের সঙ্গে দাঁড় করাতে হবে...আর আমি যদি সোজাসুজি একটা বক্তব্য place করতে যাই তাহলে সেটা alien হয়ে যায়।...আমার দেশের সঙ্গে নাড়ীর যোগ রাখাটা ভীষণ প্রয়োজন—আমার দেশের মানুষকে তাতে অনেক তাড়াতাড়ি convince করা যায়, অনেক তাড়াতাড়ি জয় করা যায়—এগুলো রক্তের মধ্যে রয়েছে আমাদের।...

শুধু acceptable করানোই নয়। At the same time it contains a very big amount of truth, as far as human psychology is concerned...

Ideological baseটা basically fundamental Marxism. Marxism not in the sense of this party or that party. Marxism philosophically, psychologically—Marx, Engels, Lenin—এঁদের লেখার অনেক ছোঁয়া আছে বিভিন্ন দ্বন্দ্ব ও সংঘাতে—এ ছবিতেও আছে—যুক্তি তক্কোতে অ্যান্টি ডুয়েরিংয়ের প্রচুর touch আছে, আলোচনা করলে আমি করতে প্রস্তুত। এটা completely philosophical লেখা। এই আমার basis...

আমি মনে করি film-form or any other art-form primarily একটা make-belief। যারা ছবি দেখতে হলে ঢোকে তারা কেউই বাস্তব দেখতে যায় না। তারা সাধারণভাবে যায় entertained হতে। তা entertain করার চেষ্টা ফেষ্টা খানিকটা করা যেতে পারে।

কিন্তু আসল আসল কথাটা হচ্ছে আমি তাদের educate করতে চাই। এবং এটা করার জন্য আমাকে যদি lots of co-incidence use করতে হয় আমি তা করবো। লোকে জানে যে সে একটা 'গল্প' দেখছে, লোকে জানে এটা বাস্তব নয়।···Melodrama হচ্ছে একটা birth-right। এটা একটা form···বক্তব্যকে প্রকাশ করার জন্য আমি যে কোনো form, সে lyric থেকে আরম্ভ করে সমস্ত কিছু ব্যবহার করতে প্রস্তুত।

আমার ছবিতে গানের ছড়াছড়ি থাকে। আমি করি এবং গান দিয়ে যদি আমার বক্তব্যকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যায় তো ব্যবহার করবো। সোজাকথা আমার হাতে যা অস্ত্র আছে আমি তাই ব্যবহার করবো।

ইয়ুংয়ের তত্ত্ব যদি তোমরা পড়াশোনা করে থাকো, I hope you have read, তাহলে দেখবে ইয়ুংয়ের তত্ত্বের সঙ্গে মার্কসবাদের কোনো গণ্ডগোল নেই। মার্কস একটা জগৎ নিয়ে নাড়াচাড়া করেছেন, ইয়ুং অন্য একটা জগৎ নিয়ে। দুটোর মধ্যে কোনো inner contradiction নেই। Collective unconscious মানুষের unconscious behaviour-কে ভীষণভাবে প্রভাবিত করে। আর entire class-structure conscious behaviour-কে determine করে। কিন্তু unconscious যেমন dream world, তুমি আমি স্বপ্ন দেখি, মার্কসবাদ দিয়ে তাকে analyse করে কি কোনো লাভ হবে? সেখানে ইয়ুং, this is what I feel। ইয়ুংয়ের সঙ্গে মার্কসের কোনো বিরোধ নেই, দুজনে দুই জগত নিয়ে কারবার করেছেন। দুটো প্রচণ্ডভাবে পরস্পরের পরিপূরক।

আমার ছবিতে ইয়ুংয়ের যে ব্যাপারটা প্রচণ্ডভাবে আসে সেটা হল ঐ mother complex। আমাকে আমার এক বন্ধু বলেছিল তোকে মায়ে খেয়েছে। আমার সমস্ত ছবিতে ঐ মা এসে পড়ে—তা মায়ে খেয়েছে কেন? এই যুক্তি গপ্পোর ছবির entire ছৌ নাচটার raison d'etre হচ্ছে মা—mother complex, এখানে ঐ মেয়েটাকে শাঁওলিকে তার সঙ্গে equate কর, জ্ঞানেশ বলছে, নাচো তোমরা নাচো, তোমরা না নাচলে কিছু হবে না। এটা

সম্পূর্ণ ইয়ুংয়িয়ান, তিতাসে ছেলেটি স্বপ্ন দেখে মা-কে ভগবতীরূপে, এই mother complex একটা basic point।

"...basic primordial force হচ্ছে mother-complex—মা—"

এবারে যুক্তি তক্কো নিয়ে প্রশ্ন :

"কোনটা সমাধান ? সমাজ অত্যন্ত জটিল বস্তু। এর মধ্যে বহু ধারা-উপধারা প্রবাহিত। কোন ধারাকে ধরে কি ভাবে এগোব এটাই প্রাথমিক প্রশ্ন। এখন এদেশের যা অবস্থা যে অব্যবস্থা সমস্তই হচ্ছে ঐ great betrayal—সেই সাতচল্লিশের তথাকথিত 'স্বাধীনতা'র result. এটা আমি ছবিতে বলেছি। এখন আমরা কিসের মধ্যে দিয়ে pass করছি—neo-colonialism, absolutely neo-colonialism, এটা আমি ছবিতে বলিনি, ঐ কথাগুলো বলতে গেলে আমার ছবি রাজনীতি হয়ে দাঁড়াত, ছবি হত না।...

বড় বড় বাতেলা করে সমাধান দেখিয়ে দেওয়া আমার কাজ নয়। আমাকে নিজের ধারণা এদেশে কেউ সেভাবে সমস্যাগুলোকে ধরার চেষ্টা করেনি। আমি যদি সেটা করতে পারি, লোকের সামনে ছুঁড়ে ফেলতে পারি যে এই হল তোমাদের সমস্যা, এখন ভাবো—What is to be done ? তাহলেই যথেষ্ট। আমার মনে হয় এটাই আমার কাজ।

সমস্যাটা কোথায় everybody knows। সমাজের সেই উচ্চতম স্তর থেকে নিম্নতম পর্যন্ত আমি মিশি, আমি মিশেছি প্রত্যেকে জানে। একদল আছে যারা এই অবস্থা থেকে ক্ষীর লুটছে, ননি লুটছে, সব লুটছে। কাজেই এই অবস্থাটা তারা perpetuate করতে চায়। আর একদল দিশেহারা হয়ে ঘুরছে কতগুলো নেতার পেছনে যেগুলো প্রত্যেকটা চোর, প্রত্যেকে তাদের নাম বজায় রাখা, পয়সা করা ইত্যাদিতে ব্যস্ত। এরা এই সব লোকের দ্বারা বিভ্রান্ত। ...এই যে ছেলেপিলেগুলো বখে যাচ্ছে, রাস্তায় বেরোলে দেখি আজকালকার ছেলেপিলেরা যে ধরণের behaviour করে তা বলা যায় না, এ সমস্তই হচ্ছে frustration-এর ফলে।

এবং এখন আমার নিজের ধারণা দুটো রাস্তা পরিষ্কার : straight fascism আর নইলে Leninist পথে কোন কিছু। ...ছবিতে এ

বলার অবকাশ নেই, কেননা আমি জানি এ দেশে leadership বলে কোন পদার্থ নেই।

…আমি বাপু বলতে চেয়েছি ভূতের নৃত্য চলছে গোটা বাংলাদেশে। …হ্যাঁ ঠিকই ধরেছো, [ঐ স্থবির ভদ্রলোক] অপেক্ষা করছে, তোমরা নাচন-কোঁদন-কীর্তন করে যাচ্ছো, যে যার কোলে ঝোল টানার চেষ্টা করছে, all political leaders. এবং এই ভূতের নৃত্যের জন্য তুমি এবং তোমরা দায়ী এটা বারবার বলা হয়েছে। Dancing figureগুলোর আঙ্গুল তোমাকে সব সময়ব point out করছে—You are responsible."

এই হলো যুক্তি তক্কো সম্বন্ধে দৃষ্টিভঙ্গী।

'৭৪ ইংরেজীর গ্রীষ্মের ছুটিতে ছবিটি দেখেছিলাম। পূজোর ছুটিতে ডিস্ট্রিবিউশনের চেষ্টা হয়। এফ. এফ. সি. Mr. Dave-এর জন্য টেলিগ্রাম করেছিলেন। কিন্তু কেন হল না জানি না।

এই ডিস্ট্রিবিউশনের ব্যাপারে সই-এর জন্য ডিসেম্বর মাসে ট্রাংককল করে আমাকে যেতে বলা হয়। কলকাতায় গিয়ে সোজা ল্যাবরেটরীতে চলে যাই। …ছবিটির সংলাপে সব জায়গায় ঠোঁট মেলেনি। তাই আবার ডাবিং হচ্ছিল। গিয়ে দেখলাম শরীর খুব সুস্থ নয়। এই অবস্থায় মদও চলছে, ডাবিংও চলছে। এবং সমস্ত রাজনৈতিক বক্তব্যগুলোই তখন বলা হচ্ছিল। কিন্তু ঐ অবস্থায় কি কথাগুলো স্পষ্ট হতে পারে? তাই সংলাপ সব জায়গায় স্পষ্ট হয়নি। কিন্তু কথাগুলো খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

যেমন—শালবনের দিকে আসতে আসতে নীলকণ্ঠের সংলাপ :

"সমাধান একটা বের করতেই হবে। এ চলতে পারে না। আমাদের সমস্ত generation টার কোন ভবিষ্যৎ নেই। Way out টা কি? পথটা কি? থাকতেই হবে—একটা কিছু থাকতেই হবে। অনেক ভাবলাম—আমাদের বাংলাটার historic conditionটাকে কেউ scientifically analysis করে না। বিজ্ঞানের সূত্রে ইতিহাসকে গাঁথেনি। এবং economic ক্লাসগুলো গত দুশো বছরে—উত্থান পতন বিশেষ করে—যাক্‌গে কেউ—এই যে ৪৭ সালের বিশাল বিশ্বাস-ঘাতকতা, জাতীয় মুক্তি আন্দোলন, National liberation move-

ment এর পিঠে ছুরি মেরে বুর্জোয়াদের ১৫ই অগাষ্টের বিরাট Great Betrayal—স্বাধীনতা—Independence—ফুঃ…

কিন্তু আমি যে থাকতে চাই। আমার বাংলায় তোমরাই তো সব—আর তো কিছু নেই। তোমরা ভবিষ্যতকে ছিনিয়ে আনবে। সে যে করেই হোক। তাই তোমরা কি ভাবছ আমি বুঝতে চাই।…

আমাদের generation টা বাস্তবের সঙ্গে নাড়ীর যোগ হারিয়েছে—হয় আমরা চোর, নয় বিভ্রান্ত—আর নয়তো কাপুরুষ হয়ে পালিয়ে যাবার মিছিল। খাটি কোন বেটা না। এক শালাও না। তোমরা হচ্ছ cream of Bengal. আমাদের সম্পূর্ণ পুঁজি তোমরা—আর যাই হও স্বার্থের লোভে প্রাণ দিচ্ছ না—হীরের টুকরো সব।

তোমাদের sincerity তোমাদের বীরত্ব তোমাদের আত্মত্যাগের প্রতিজ্ঞা—এসবে আমার কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু তোমরা সম্পূর্ণ misguided. তোমরা অগ্নিযুগের ছেলেদের মতই সফল এবং নিস্ফল। তোমরা একদিকে শহীদ আর একদিকে গোঁয়ার এবং অন্ধ।

Marxismও Dialectics-এর বশীভূত। It is guided by Dialectical and Historical Materialism. গোটা দাগে তার ক্রমবিবর্তনও দেখা যাক। Marx-Engels-এর বৈজ্ঞানিক সমাজবাদ, Com. Lenin টেনে নিয়ে গেলেন এবং apply কোরলেন পুঁজিবাদের আর একটা বিকাশের স্তরে। তিনি বোললেন যে Imperialism is the moribund state of Capitalism.

তারপর এলেন Com. Stalin—আমার মতে Bureaucratic Socialism-এর জন্ম হল। এরপর এলেন Com. Mao—যিনি কৃষক শ্রেণীকে সংগঠিত কোরে বিপ্লবের পথে এগিয়ে এলেন। ব্যাপারটা কিন্তু সেখানেই থামল না—এলেন গুয়েভারা, এলেন কাস্ট্রো—তাঁরা নির্ভর করলেন বুদ্ধিজীবী এবং ছাত্র-সম্প্রদায়ের ওপর। তারপর এদের সবার নাম করে কি যে সব হতে আরম্ভ করলো আমার তো সব গুলিয়ে গেছে, কেমন যেন নিহিলিজম টেররিজম্ এ্যাডভেনচারিজম লেনিনের ভাষায় Infantile Disorder বালখিল্যসুলভ বদহজম এইসব কথাই মনে হতে আরম্ভ করলো।…

দক্ষিণ আমেরিকার দেশগুলো যেমন কিউবা বা বলিভিয়া এদের

আজকের সভ্যতার গোড়াপত্তন মাত্র তিনচারশো বছরের পুরনো। ইতিহাস এবং ভূগোলের দিক থেকে এরা নিতান্তই অর্বাচীন অর্থাৎ ছোটমাপের।…

কিন্তু ভাব দেখিনি এই ভারতবর্ষ, এই বাংলা, এই ভারতবর্ষের ইতিহাস চার হাজার বছরের। এবং যত গাল দি এদেশে সবচাইতে উজ্জ্বল দার্শনিক চিন্তা জন্মগ্রহণ কোরেছে, কাজেই সবচেয়ে বড় ফিচেল বদমাইশদের হাতে এদেশ প্রচুর হাতিয়ার তুলে দিয়েছে।

এগুলো বদমাইশির অস্ত্র। কিন্তু সেগুলোকে বুঝে ঝাপটে ধরে উপড়ে ফেলতে হবে। ওরা নেই বললেই চলে যাবে না। ওদের শেকড় ওপড়াতে হলে ওদের শক্তি এবং ওদের দুর্বলতা ভাল করে জানতে হবে।…

আজকে কোন্ সিদ্ধান্ত Indian Conditionকে অথবা বাংলার conditionকে সঠিক পথে নিয়ে যাবে সেটা আমার জানা নেই। আমি confused, fully confused, দিশেহারা হয়ে হাতড়ে বেড়াচ্ছি। হয়তো আমরা সবাই confused.”

এই হলো পুরো রাজনৈতিক বক্তব্য। কিন্তু এখানেই শেষ হয়ে যায়নি সমস্ত কথা। …‘সাঁকো’ নাটক থেকে আরম্ভ করে যে কথাগুলো বার বার শুনেছি সেই জীবনের কথা দিয়েই শেষ হয়েছে: “Law of life জীবন… জীবিতের—জীবিতের ধর্ম। বহতা অমোঘ, দুর্নিবার…।”

এই কথাগুলো শুনে মনে দৃঢ় আশা ও বিশ্বাস জাগে, অমোঘ এবং দুর্নিবার জীবনের গতি একদিন ভবিষ্যৎ ও নতুন দিনকে ছিনিয়ে আনবেই।

ছবি শেষ হবার আগে মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথা দিয়ে নিজের বক্তব্য শেষ হয়। নীলকণ্ঠের শেষ বক্তব্য দুর্গাকে—

“মাণিকবাবুর সেই মদনতাঁতীর কথা মনে আছে তোমার? সেই যে বলেছিল, ভুবনমহাজনের টাকায় সুতো কিনে তাঁত চালাবো? তোদের সঙ্গে বেইমানী করবো? তাঁত না চালিয়ে পায়ের গাঁটে বাত ধরে গেছে তাই খালি তাঁত চালালুম একটু।”

এরপর মৃত্যুর মুখে ঢলে পড়বার আগে: ‘একটা কিছু করতে হবে তো? একটা কিছু করতে হবে তো?’

ছবিটির সুটিং শেষ হবার আগে ও পরে অনেকদিন, অনেকবার, বার বার

মাণিকবাবুর এই কথাগুলো বলতে শুনেছি ও দেখেছি কথাগুলো বলতে বলতে চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ছে। এই কথাগুলো বোধহয় মাণিকবাবুর 'শিল্পী' বইতে আছে। কথাগুলোর কি এই মানে? আমি কম্প্রোমাইজ করবো না—তাই ড্রিঙ্ক করে করে জীবন শেষ করছি?

জানি না।

(৬)

ছবিটা মুক্তিলাভ করে না। সালের এপ্রিল মাসে আমরা বোম্বে যাই। আমি সঙ্গে যাওয়ায় খুব খুশী। মহেন্দ্র ছিল বলে মদ্যপান নিয়ন্ত্রিত ছিল। এবং বোম্বে গিয়ে পাজামা, পাঞ্জাবি, চটি ইত্যাদি কেনা হয়। প্রতিদিন স্নান করে ও পরিষ্কার জামাকাপড় পরে এফ. এফ. সি ও ফিল্ম ডিভিশনের অফিসে যাওয়ায় প্রত্যেকেই দেখে আশ্চর্যান্বিত ও খুশী।

আমাকে পুণা নিয়ে যাওয়ার খুব ইচ্ছে ছিল। কিন্তু সময়াভাবে যাওয়া হয়নি। পুণা আমি দেখিনি। একদিন দূর থেকে ডেকান কুইন এক্সপ্রেস দেখে খুবই যেতে ইচ্ছে হয়েছিল। কিন্তু খুবই দুঃখের বিষয় চলে আসতে হলো।

বোম্বেতে 'সেই বিষ্ণুপ্রিয়া'র সিনোপসিস এফ. এফ. সি-তে জমা দেওয়া হয়েছিল।

'সেই বিষ্ণুপ্রিয়া' সম্বন্ধে নিজের বক্তব্য :

> "বছর খানেক আগের একটা সত্য ঘটনা—নবদ্বীপের একটি মেয়ে, বিষ্ণুপ্রিয়া, দারুণ contrast ঐ নবদ্বীপেই, সেই নিমাই-বিষ্ণুপ্রিয়া, তার অপরাধ সে রূপসী এবং গরীব ঘরের মেয়ে। কয়েক জন মস্তান তার পেছনে লাগে এবং সে আত্মত্যাগ করে। এটুকুই কাগজে বেরিয়েছিল, কিন্তু যেটা বেরোয় নি সেটা আমি একজন সাংবাদিকের কাছে জেনেছি, সে ওখানেই থাকে, মেয়েটি মোটেই আত্মহত্যা করেনি, she was raped and burnt to death. এই আমার গল্প, এই আমার ছবি।"

দিল্লীতে চিলড্রেন্স ফিল্ম সোসাইটি থেকে করবার জন্য ঠাকুমার ঝুলি-র 'Princess Kalavati' নামে বুদ্ধু ভূতুমএর রূপকথা নিয়ে একটি সিনোপসিস লিখে পাঠানো হয়েছিল। দিল্লীতে পাঠাবার সময় Mr. Kidwai-কে এই চিঠিটি পাঠানো হয়েছিল :

To

Calcutta

Sree Kidwai,

Secretary,

Information & Broadcasting Ministry.

Govt of India.

Shastri Bhavan.

New Delhi—1.

Dear Kidwai,

I am sending you, as promised, the story material for the Children's Film. Along with, I am sending you the budget. Please be kind enough and process the whole rigmarole out. I depend on you and expect to hear an answer at your earliest convenience.

I hope you are well and probably things will look up in the near future, I am working, so, do not lose faith in me.

Love,

Yours

Ritwik Ghatak.

এই রূপকথার গল্পটি ছবি করলে কি আশ্চর্য সৃষ্টি হতো ভাবা যায় না। বোম্বেতে গিয়েও ফোন করানো হয়েছিল। এই ছবির সিনোপসিস ও বাজেট যদি মঞ্জুর হতো—'সেই বিষ্ণুপ্রিয়া'র সিনোপসিস ও বাজেট যদি এফ এফ সি মঞ্জুর করতো—'যুক্তি তক্কো গপ্পো' যদি মুক্তি লাভ করতো—

'তিতাস একটি নদীর নাম' যদি এই দেশে আসতো—

তবে জীবন অন্যরকম হতো—

কিন্তু কিচ্ছু হলো না। এই মানসিক অবস্থায় 'জ্বলন্ত' নাটকটি লিখে রিহার্সাল আরম্ভ হয়। গান টেকিং-এর রাত্রে অলক দে প্রভৃতি টাকাপয়সার ব্যাপারে কাজ শেষ হবার আগেই চলে যান। পরে অন্যান্য ছেলেমেয়েদের নিয়ে গানগুলো করানো হয়। টেকিং-এর দিন আমি পাশে বসে ছিলাম।

ঐ নাটকটি ষ্টার-এ করার কথা ছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত না হওয়ায় একাডেমীতে একটি শো হয়। তখন শরীর আবার অসুস্থ—জণ্ডিস আরম্ভ হয়েছে।

সেই অবস্থায় শান্তিনিকেতনে এসে রামকিংকর বেজ-এর ওপর কালারে ডকুমেণ্টারির সুটিংটা করা হয়। প্রযোজক মোহন বিশ্বাস ও শিখা বিশ্বাস তখন খুবই দেখাশোনা করেছেন। এই কাজটি করার সময় আমি সঙ্গে থাকতে পারি নি। সুটিং শেষ করার পর, কলকাতায় ফিরে আসার পরই, শরীরের ভয়াবহ অবস্থা শুনে ও দেখে বরুণ বক্সী হাসপাতালে ভর্তি করেন। খুব খারাপ ধরণের জণ্ডিস হয়েছিল। আমার মেয়ে দুবেলা যেতো। প্রতিদিনের ওষুধ, ইনজেকশন, অ্যাটেনডেণ্ট ইত্যাদির খরচ নিজেকেই চালাতে হতো।

আমি পুজার ছুটির সময় গিয়েঁ দেখলাম অনেকটা ভাল। জণ্ডিসও তখন ভাল হয়েছে। কিন্তু বিকেলের দিকে প্রচণ্ড কাশি ও জ্বর আসতো। টাকা-পয়সার ব্যবস্থার জন্যও খুব কষ্ট করতে হতো। আমার নিজেকে খুব অসহায় মনে হতো। আমার সামান্য চাকরী। কোন কাজকর্মেরই কোন সুরাহা হয়নি। তখন আমি ও মহেন্দ্র উকীল শংকর লাহিড়ীকে ঠিক করলাম, যাতে কাজকর্মগুলোর সুরাহা করতে পারি, এফ. এফ. সি-র চেয়ারম্যান মিঃ করঞ্জিয়া-কে আবার ছবিটি রিলিজ করবার জন্য চিঠি দিলাম।

'মেঘে ঢাকা তারা' ও 'কোমলগান্ধার'-এর স্বত্ব ফিরে পাবার সময় আমাকে লিখে দিয়েছিলেন। কিন্তু আগেই লিখেছি, শ্রীবীণা ফিল্মস্ মদ্যপান করিয়ে অত্যন্ত খারাপ শর্তে অনেক কিছু লিখিয়ে নিয়েছিলেন।

শংকরদা বলেছিলেন, "ঋত্বিক ওদের সঙ্গে negotiation আরম্ভ করলে, সুরমা ও তার ছেলেমেয়েরা যাতে ছবিদুটো থেকে ঠিকমতো টাকা পয়সা পায়, আমি সেই মতো ব্যবস্থা করে দেবো।"

কিন্তু ঐ জ্বর ও কাশির জন্য নেগোসিয়েশন আরম্ভ করা সম্ভব হয় নি। মেয়ে দুবেলা যেতো, আমি রোজ বিকেলে যেতাম [illegible] রোজ কাজকর্মের ব্যাপারে পয়েণ্টস্ লিখে রাখা হতো। কারণ বিকেলে রোজ জ্বর আসতো। বিকেলে বসবার জায়গাটিতে আমরা সবাই অনেকক্ষণ বসতাম। একটি চাদর গায়ে দিয়ে বসবার ভঙ্গীটি এখনো মনে পড়ে।

'লজ্জা'র স্ক্রিপট ঐ সময়েই লেখা হয়। স্ক্রিপটটির শেষ অংশ নিজে হাতে লিখে শেষ করেছেন। ঐ অসুস্থ অবস্থায়ও এখন ভাবি কি

কষ্টটাই করেছিলেন। এখানে উদ্ধৃত করছি আমার কাছে লেখা একটা চিঠির অংশ:

লক্ষ্মী,

কয়েকটি কথা মন দিয়ে ভেবে দেখে তবে এগিয়ো। প্রথমতঃ এতসব করার চেষ্টা হচ্ছে কেন? কিছু টাকা সংগ্রহের প্রাথমিক কারণ, আমরা দুজনেই চাই, বাচ্চাদের একটা provision হয়।

শান্তভাবে আমি আমাদের ব্যবস্থাগত সমস্যাগুলো নিয়ে ভেবেছি, আশাকরি তুমিও সেইভাবেই নেবে। একটা পাপচক্রের মধ্যে আমরা ফেঁসে গেছি। চারপাশ থেকে নানা স্বার্থ কাজ করছে, তার কোনটাই আমাদের পক্ষ ভেবে কাজ করছে না। এসবের দায়িত্ব কার, এ নিয়ে তর্কের পিঠে তর্ক উঠবে। তাই লিখিত আকারেই জিনিষটা তুলে ধরছি।

ঘুণাক্ষরেও আমার এই পরামর্শ যদি তোমার আশেপাশের কেউ জানতে পারে, তাতে কারো লাভ হবে না, কিন্তু আমার ক্ষতি করার জন্যে মুখিয়ে ওঠার লোকের অভাব হবে না। আমি যা লিখছি, তা নিতান্তই পরামর্শ হিসেবে। শেষ সিদ্ধান্ত তোমার।...যদি কোন আইনজ্ঞের পরামর্শ নিয়ে চলতে পার, সবচাইতে ভাল হয়। এবং একটা কথা। কোন কারণেই, কারো কাছে কারো কথা শুনে কোনরকম সই কোথাও তুমি দেবে না।

আর কিছু কথা এই সঙ্গে পরিষ্কার থাকা ভাল। এখানে যা কিছু লিখছি, সবই অতীতের তিনটি ছবি সম্পর্কে। এ তিনটি থেকে, আমার পরামর্শ মত চলে বা অন্য কোন আইনজানা ভদ্রলোকের মত নিয়ে, যদি কোন টাকা তুমি হাতে পাও, আমি কোনদিন তার ভাগ চাইতে আসব না। আমার তরফ থেকে এ তিনটি ছবি মৃত। এ তোমার সম্পত্তি সম্পূর্ণ।

সৃষ্টিশীল এবারে আমি যা করব, তা হবে সম্পূর্ণ আমার, সেখানে তোমাকে কোনভাবে টেনে আনব না—ব্যবসার ব্যাপারে তো নয়ই। ভবিষ্যতে কাজ করার চেষ্টা করব, হলে নিজের দায়িত্বে করব। আশাকরি, তুমিও সেটা বুঝবে, এবং বুঝে চলবে।...

ব্যবসাগত ও দরকারী কথায় দীর্ঘপত্র। যে ভাবে যা করতে বলেছিলেন সেই ভাবেই সব করেছিলাম। শিল্পীমন সবসময়ই শিল্পসৃষ্টি করতে চেয়েছিল। কিন্তু ব্যবসাগত ব্যাপার সবসময়ই সে পথে বাঁধা সৃষ্টি করেছে।

এদিকে ঐ অসুস্থতার মধ্যেও প্রতিদিন সকালে বসে 'লজ্জা'র স্ক্রিপট লেখা চলছিল। কিছু অংশ উদ্ধৃত করছি:

MONTAGE of Eyes of all characters. Culminating in Renu's eyes and accusing finger. —We build up a STACCATTO montage which becomes progressively fast. Like a coward, stoned dog Anim es starts running away, always looking back again and again. He goes to long cut to

The dug area in the compound, full of mud. Morning. Animesh comes in the same way, looking back and back.

—He slips.

He falls with a loud noise in the mud.

—His head comes up. His hands fly to catch the slippery, muddy earth. His hands cannot hold a grip, only the signs of claws on the muddy wall.

His face comes up.

He spits muds. He tries to speak, but only some animals' growls come out with uncanny sound.

We INTERCUT, this activity from many angles.

Suddenly camera goes to extreme vista top shot. In the middle of the frame He goes on doing the same activity.

Camera suddenly holds the sky.

Birds circling. Their charns mingles with the noise of Renu's banging and shouts, at the same time Animesh's animal growls. Again that vista shot. Shadow of the birds circling.

Camera goes to LMS

Animesh's head bobs up and down the mud while his hands go on clawing.

—A red lotus with dew tingling on petals. Slowly magnifies in the centre of the frame and stops at B. C. S. position.

···No Animesh. He is covered by the lotus. A border area on all four sides of the frame remain B. W.

···In the lower border comes the wriggling—

The End. Cut.

(৭)

৪ঠা নভেম্বর সকালে হাসপাতালে গিয়েছিলাম দেখা করতে। সেদিন পঞ্চাশ বছর পূর্ণ হলো। তখনো জানতাম না এ দিনটি আর ফিরে আসবে না। বিকেলে দিদি এসেছিলেন খাবার নিয়ে। পরে ডলিদিরাও এসেছিলেন। কিছুদিন আগেই ছোড়দা (শ্রীলোকেশচন্দ্র ঘটক) মারা গেছেন। ছোট ভাইটিকে তখনো জানানো হয়নি। সকলের মন ভারাক্রান্ত।

এর আগে মেজ ও সেজ ভাসুর মারা গিয়েছিলেন। তারপরে আমার একজন ব্রিলিয়াণ্ট ভাগ্নী শ্রীমতি চিত্রপর্ণা নিয়োগী, বড়দার মেজ ছেলে —আমাদের পুত্রসম শ্রীমান অবু ঘটক, আর একজন ব্রিলিয়াণ্ট ভাগ্নীর স্বামী, একজন জা ও মেজো জামাইবাবু মারা গেছেন। সুতরাং সবারই কামনা, ছোট ভাইটি যেন অচিরেই সুস্থ হন।···আমার ছুটি শেষ হয়, চলে আসি।···

মেয়ের চিঠি পাই, জ্বরটা টাইফয়েডের দিকে মোড় নিয়েছিল। এখন ভালর দিকে। ডিসেম্বর মাসে হাসপাতাল থেকে বেরোবার পর বড়দিনের ছুটিতে আমি দেখা করতে যাই। গঙ্গার ধারে তপন সাহার বাড়ীতে তখন বিশ্রামে ছিলেন।

নতুন দিনটিতে মেয়ে আসতে দেয়নি।

প্রতিবারই ১লা জানুয়ারী চলে এসে ২ তারিখে কাজে যোগদান করি। ঐ ১লা জানুয়ারী অনেক রাত অবধি নির্মলবাবু ও নারায়ণ সহ আমরা সবাই একসঙ্গে ছিলাম। তারপরেই 'আরো ড্রিঙ্ক করবো, কিছু হয়নি'—তখনো

হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে দুর্বল শরীর। কালো কোট পরা চেহারাটি মনে পড়ে। একটিবারও হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে মদ্যপান ত্যাগ বা নিয়ন্ত্রণ করা হয়নি। এটা যে কি মর্মান্তিক···কিন্তু কি করতে পারি? নিতান্ত অসহায়···

আমার স্মৃতিচারণে লিখেছি ১১ই জানুয়ারী সকালে সাঁইথিয়া এসে ছেলের গান শোনা হয়। ১২ই জানুয়ারী সকালে বারবার বলা হয়: 'ফেব্রুয়ারী মাসেই নতুন কাজ আরম্ভ করবো। পুরনো ছবির সমস্ত ব্যবস্থা তোমাকে করে দেবো' ইত্যাদি।

অন্যবারের তুলনায় এইবার একটু উদাসীন লাগছিল। আমি একবার বলি—'বাবাতো প্রতি চিঠিতেই লেখেন, ঋত্বিক কেমন আছে? বাবাকে কি লিখবো?'

ঐ কালো কোটটিকে পরে একটু মাথা নীচু করে বলেন, 'বাবাকে বলো—এবারতো হাসপাতাল থেকে ফিরেছি, এর পরে যখন হাসপাতালে যাব, আর ফিরবো না। একটি বড়ো পটলের ক্ষেত দেখে একটি বড়ো পটল pluck করবো।"

বহুদিন বহুবার শুনেছি, 'আমি মারা যাব। মাইকেল মধুসূদন, প্রমথেশ বড়ুয়া, মাণিক বন্দোপাধ্যায় যেভাবে মারা গেছেন, সেইভাবেই মারা যাব।'

চুপ করে শুনি। একটি কথাও বলিনি। কিন্তু খুব খারাপ লাগে। আবার এই মৃত্যুর কথা কেন? এই মৃত্যুর কামনা কেন?

আস্তে আস্তে কালো কোটপরা চেহারাটি গলির মোড়ে অদৃশ্য হয়ে যায়--আমি দাঁড়িয়ে থাকি।

আর তো আমি দেখিনি—

দেখেছি ৭ই ফেব্রুয়ারী প্রথম টেকনিসিয়ান স্টুডিয়োতে আনার পর।

৬ই ফেব্রুয়ারী সরস্বতী পুজোর পরদিন সকালে শান্তিনিকেতন গিয়েছিলাম ছেলেকে দেখতে। যাবার পর অধ্যক্ষ বললেন, খেলার মাঠে ছেলের মুখে আঘাত লেগে ছেলে হাসপাতালে ছিল। ওর বাবার কাছে চিঠি গিয়েছিল। মহেন্দ্র এসে ছেলেকে কলকাতায় নিয়ে গেছে।

ফিরে এসেই শুনলাম স্কুলে ট্রাংককল এসেছে: Ritwik Ghatak in serious condition। ঐ সময়ই আমার বাবারও চিঠি পেলাম, বাবা খুব

অসুস্থ। চিকিৎসা চলছে। আমি দিশেহারা হয়ে পড়ি। কার কথা চিন্তা করব?

ছেলে, ছেলের বাবা? না আমার বাবা?

তবু ঐ সময় ছেলের বাবার কথাই কম চিন্তা করেছি। কারণ যতোই সিরিয়স কণ্ডিশন হোক, হাসপাতালে দিলেই তো শরীর সুস্থ হয়।

সন্ধ্যার সময় মেয়ের সঙ্গে পরামর্শ করি। ফেব্রুয়ারীর মাঝামাঝি আমার একটা ট্রেনিংএ যাবার কথা আছে। মেয়ের সামনে হায়ার সেকেণ্ডারী পরীক্ষা। তাই ঠিক করি মেয়েটির থাকার ব্যবস্থা করে কলকাতায় যাব। আমি ক্লাসও করতে পারবো, হাসপাতালেও দেখাশোনা করতে পারবো।

সরস্বতী পুজোর পরদিন এখানে খুব সুন্দর রঙীন আলপনা আঁকা হয়। সবাই দেখতে বেরিয়ে গেছে। একা ঘরে রাত এগারোটা পর্যন্ত একটা বোনা নিয়ে বসেছিলাম। আবার রাত দুটো থেকে সকাল পর্যন্ত সমানে চিন্তা করেছি—ঠিক করেছি—সকালে সবাইকে একটা করে চিঠি লিখবো—এখন সবাই মিলে চিন্তা করতে হবে। এই অল্প কয়দিনেই যখন সিরিয়স কণ্ডিশন হলো—আমার আর শক্তি নেই একা কিছু করবার, আর বারবার এই খবরও আর শুনতে পারছি না।

কিন্তু সকালে কোন চিঠি আমি লিখতে পারিনি। একটা বিষাদে মনটা ছেয়েছিল। কি এর সমাধান? কোথায় এর শেষ? মনের এই অবস্থার মধ্যে মৃণাল সেনের পাঠানো খবরের অক্ষরগুলো আমার চোখের সামনে অবলুপ্ত হয়ে গেল। শুধু মনে হয় আমি কি অপরাধ করেছি?···

আমার হেডমিসট্রেস শ্রীমতী মায়া ঘোষ ও সহকর্মীরা একটি ছেলেকে সঙ্গে দিয়ে আমাকে রওয়ানা করে দেন। বর্ধমানে ছেলেটি একটি খবরের কাগজ নিয়ে আসে। চলমান দুনিয়ার দিকে তাকিয়ে দেখছিলাম সোনালী আলোয় উদ্ভাসিত দিনটিতে সবই চলছে।···মৃণাল সেন লিখেছিলেন সুরমা ঘটকের জন্য অপেক্ষা করা হচ্ছে। কথাটা মাথায় ঢুকেছিল। অর্জুনের লক্ষ্যভেদের মতো মনটা স্থির হয়েছিল—কাজটা আমাকে করতে হবে। ছেলেকে যেন কিছু না করতে হয়।

হাওড়া স্টেশনে বেলা ও নৃপেন বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন। হাসপাতালে অগণিত লোকের ভীড়ে আমাকে রাখা হয় নি। সেদিন গীতা ও মৃণাল সেন,

'বেলা ও নৃপেন বন্দ্যোপাধ্যায়, অনুপকুমার ও দীনেন গুপ্ত প্রভৃতিরা না থাকলে আমার কি অবস্থা হতো ভাবতে পারিনা।

শেষপর্যন্ত আমার হাত ধরে ছিল আমার মামীমণি ও বোনপো শ্রীমান বাবুল। আমার তুলুমাসী প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত ছিল।

টেকনিসিয়ান স্টুডিয়োতে আনার পর আমাকে নিয়ে আসা হয়। নিস্তব্ধ স্টুডিয়োতে সবাই-প্রতীক্ষা করছিলেন তাদের ঋত্বিকবাবুকে শেষ বিদায় জানাবার জন্য ফুল ও মালা নিয়ে। এই স্টুডিয়োর কলাকুশলীদের জন্য ইউনিয়ন তৈরী করা হয়েছিল। সবাই প্রাণ দিয়ে ভালবাসেন তাদের ঋত্বিকবাবুকে। আর ভালবাসেন ও শ্রদ্ধা করেন তাঁর সামগ্রিক শিল্পকর্ম ও দরদী দৃষ্টিভঙ্গীকে।

আমি তো তখনো জানিনা—১২ই জানুয়ারী সাঁইথিয়া থেকে আসার পর এই কয়দিনের মধ্যে কি হযেছিল। কিন্তু খোলা আকাশের নীচে শায়িত মানুষটির দিকে তাকিযে আশ্চর্য হই। মুখে অপূর্ব হাসি, কোন রোগ-বিকৃতি নেই। দেখে কিছুতেই মনে হয়না প্রাণ নেই।

এ চেহারা যতোদিন বেঁচে থাকবো মনে থাকবে। পরে শুনেছি অনেক গণ্ডগোলের পর জনতার দাবীর ফলে তথ্যমন্ত্রী সুব্রত মুখার্জী খোলাগাড়ীতে আনার ব্যবস্থা করেছিলেন। মনে পড়ে—অজিত লাহিড়ী পরে বলেছিলেন—ঋত্বিক রাজার মতোই গেছে।

অগণিত আত্মীয়, বন্ধু ও শুভানুধ্যাযীরা শেষ পর্যন্ত ছিলেন। রাত্রে মৃণাল সেনের বাড়ীতে এসে একটা কথাই বারবার বলেছি: 'মৃণালবাবু! আমি সবায়ের কাছে কৃতজ্ঞ। বহুবছর ধরেই সবাই বারবার এগিয়ে এসেছেন যাতে তাদের ঋত্বিকবাবু সুস্থ হয়ে কাজ করেন—আমি সবাইকেই বলতে চাই।'

মৃণালবাবু বলেন, 'আমার বাড়ীর ছাদেই ব্যবস্থা করবো, কোন চিন্তা করবেন না।'

সেই অনুযায়ী মৃণালবাবু, অনুপকুমার, নৃপেন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি ব্যবস্থা করেছিলেন। সবাই এসেছিলেন। হেমাঙ্গদা, জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র প্রভৃতি গান করেছিলেন। ছেলেও গান করেছিল। প্রথমেই—

'যে রাতে মোর দুয়ারগুলি ভাঙলো ঝড়ে'

গান দিয়ে শুরু করায় সকলেরই মন ব্যথিত হয়ে ওঠে।

সকালবেলা শ্রদ্ধেয় দাদা সুনীল চ্যাটার্জী ও অমিয় চ্যাটার্জী কাজ করার ব্যবস্থা করায় আমি খুবই কৃতজ্ঞ। আমার ভাইটিও এসেছিল। ...মনে পড়ে অনেকদিন আগে মধু বাতা ঋতায়তে, মধু ক্ষরন্তি সিন্ধবঃ... কথাগুলোর মানে আমাকে বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছিল।

(৮)

এরপরে একটি বছর শেষ হয়েছে। একটি বছরের প্রতিটি মুহূর্ত একটি চিন্তাই মনকে আচ্ছন্ন করে আছে। কোন সময় ভুলতে পারি না।

হাসপাতালে আমি দেখিনি। মেয়ে ও বাবলুদার মুখে পরে সব শুনেছি। শ্রীবীণা ফিল্মসের চ্যাটার্জী ও রায়চৌধুরী নিয়ে গিয়েছিলেন আমাদের উকীল শংকর লাহিড়ীর কাছে। শংকরদা পরিষ্কার বলেন, 'আমি তো সুরমার উকীল।' ওরা আরও অনেক সই-টই করিয়েছিল।

৩রা ফেব্রুয়ারী মেয়ের হোস্টেলে গিয়ে 'টুনুমা! তোমার বাবাতো আর বাঁচবে না, কান্নাকাটি করিস না মা।' মেয়ে বলে ডাক্তার দেখাতে, ওষুধ কিনতে। ওখান থেকে এসে একটু মদ্যপান করার পর শরীরটা খারাপ বোধ হয়। বাবলুদা বলেন একবার ডাক্তার দেখাতে। সন্ধ্যার সময় সেক্সপীয়ার থেকে অনেক আবৃত্তি করা হযেছে, অনেক গান করা হয়েছে। পরে সমীরের মুখে শুনেছি, কয়দিন ধরেই খুব গান করা হচ্ছিল, ছেলেমেয়েদের কথা বলা হচ্ছিল। ওরা সুকান্ত ও চার্লস ডিকেন্সের বই চেয়েছিল। তাও কিনে রাখা হযেছিল। ৪ঠা ফেব্রুয়ারী সকালে রক্তবমি হয। বাবলুদা বসেছিলেন। সন্ধ্যায় সমীর এসে দেখেই মেয়ের হোস্টেলে আসে। সুপারিনটেনডেণ্ট নিয়ে আসতে বলেন। তক্ষুনি নিয়ে এসে হাসপাতালে এমার্জেন্সি ওয়ার্ডে ভর্তি করা হয়। সমীর ও মেয়ে রাত্রেই মেডিকেল কলেজে যায় রক্ত আনতে। প্রচণ্ড ঝড়বৃষ্টির মধ্যে কোন যানবাহন না পেয়ে দুজনে হেঁটে আসে এস্‌প্লানেড অবধি। সকালেই ভালদিদের খবর দেয়। পরদিন মৃণাল সেনকে ফোন করে। ডাক্তাররা আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন। বারবার তাঁরা মেয়েকে বলেছেন, 'খুব খারাপ অবস্থা! তুমি বারবার আসছো, আর কি কেউ নেই?' প্রথমে প্রি-হেপাটিক কোমা ও পরে কোমা-র দিকে চলে যায়—কিছু করার ছিলনা।...এতো অল্প সময়ের মধ্যে এমনিভাবে জীবন শেষ হবে কখনো ভাবিনি।

দীর্ঘ দশ বছর সুস্থ করবার আপ্রাণ চেষ্টা করা হয়েছে। কিন্তু কিছুতেই

জীবনের ঐ আবর্ত থেকে বেরিয়ে আসা হয়নি। বহু ভেবেছি কি এর সমাধান? কোথায় এর শেষ?

একটা বিশ্বাস ছিল ছেলে বড়ো হয়ে গেলে সব ঠিক হয়ে যাবে।...বহু আগেই 'যুক্তি-তক্কো-গপ্পো'তে নিজের চরিত্র অভিনয় করে নিজের মৃত্যু দেখানো হয়েছে। অনেক সময়ই ভেবেছি কেন এই মৃত্যু দেখানো হলো? প্রতিদিনের উর্ধ্বে যে শিল্পী ও দার্শনিক মন ছিল তার ধরাছোঁয়া ও নাগাল আমরা পাইনি।

সেই মন কি ভেবেছিল, কি বুঝেছিল, কোন চিন্তাধারায় বয়ে চলেছিল জানিনা। তবে খুব ইচ্ছে ছিল নতুন করে কাজ আরম্ভ করবার। শুধু তাই নয়, নতুন করে জীবন আরম্ভ করবারও তুরন্ত ইচ্ছা ছিল মনে।

সমীর আমাকে এসে সব জিনিষপত্র দিয়ে যায়। একটি নতুন স্যুটকেসে সমস্ত জামাকাপড় গোছানো ছিল। সব ওপরে ছিল একটি কালো জহর কোট। ঐ জহর কোটটি গায়ে দিয়ে যুক্তিতক্কোতে স্যুটিং করা হয়েছিল। আমি বারবার বলতাম ঐ কোটটি আর না পরতে। মনে পড়ে—কি প্রচণ্ড অট্টহাসি—'লক্ষ্মীতো আমার মারা যাওয়া সহ্য করতে পারে না, তাই জহর কোটটি দেখতে পারে না।'

জহর কোটটি প্রথমেই দেখে স্তম্ভিত হই। নতুন সাবান, তোয়ালে, শেভিং সেট। একটি ব্যাগে একটি স্টোভ, এ্যাটাচিতে সমস্ত কাগজপত্র গোছানো। নতুন বিছানা তৈরী করা হয়েছিল, ফার্নিচারের অর্ডার দিয়ে টাকা অ্যাডভান্স দেওয়া হয়েছিল। আরও ছিল স্যুটকেশে কয়েক হাজার টাকার গিফ্‌ট্‌ কুপন। যুক্তিতক্কোগপ্পোর বেস্ট স্টোরির জন্য প্রাইজের গিফ্‌ট্‌ কুপন।

বিস্ময়ে অবাক হয়ে যাই। মন চলে যায় অনেক দূরে—একজন বাংলাদেশের ছেলে একদিন গেরুয়া পাঞ্জাবি গায়ে, কাঁধে একটি ঝোলা নিয়ে রওয়ানা হয়েছিলেন জীবনের পথে...। গৈরিক পদ্মার ধারে রূপকথার দেশের স্বপ্ন দেখে যে জীবনের শুরু—যুদ্ধ, মন্বন্তর, দাঙ্গা, দেশভাগ পেরিয়ে দুই বাংলার ক্ষতবিক্ষত রাজপথে সে জীবনের সমাপ্তি।

বহুদিন শুনেছি—'লক্ষ্মী! টাকাটা তো থাকবে না, কাজটা থাকবে, তুমি দেখে নিও, আমি মারা যাবার পর সবাই আমাকে বুঝবে।' মানুষটি কি ভবিষ্যৎদ্রষ্টা ছিলেন?

উপসংহার

নাগরিক থেকে যুক্তি তক্কো পর্যন্ত জীবনকে বারবার হতাশায় আচ্ছন্ন করেছে। কোন ছবি ফ্লপ, কোন ছবি সুপার-ফ্লপ, কোন ছবি অসমাপ্ত, কোন ছবি রিলিজ হয়নি—এই তো দীর্ঘ ইতিহাস। কিন্তু মৃত্যুর পরে একে একে সব ছবিই মুক্তিলাভ করবে, দর্শকরা দেখতে পাবেন। তার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করা হচ্ছে।

আশ্চর্যভাবে মৃত্যুর এক বছরের মধ্যেই সুদীর্ঘ ২৫ বছর আগের 'নাগরিক' ছবিটির একটি প্রিন্ট পাওয়া গেছে। শ্রীব্রহ্মা সিং ও শ্রীরমেশ যোশী বেঙ্গল ফিল্ম ল্যাবরেটারী থেকে এই ফিল্মটি উদ্ধার করেছেন। আমি তাঁদের কাছে কৃতজ্ঞ। মনে পড়ে '৫৪ সালে প্রথম আলাপ-পরিচয়ের পর বহুদিন শুনেছি: 'নাগরিক মুক্তি পায়নি, আমি সুইসাইড করবো।' তখন ছবিটি মুক্তিলাভ করলে যে সম্মান, স্বীকৃতি পেতেন, তাতে পথিকৃৎ হিসাবে জীবনটা অন্যরকম হতো। রিহার্সাল থেকে ফিরবার পথে অনেকদিন হাঁটতে হাঁটতে ম্যাডক্সস্কোয়ারে বসে বলা ঐ কথাগুলো মনে পড়ছে। ছবিটি রিলিজ করবার আপ্রাণ চেষ্টা করা হয়েছিল।

'নাগরিক' সম্বন্ধে নিজের উক্তি:

"নাগরিক-য়ের কথা তুলে লাভ নেই। 'নাগরিক' মোটামুটি একটা co-operative venture ছিল। কেউ পয়সাকড়ি নেয়নি, laboratary নেয়নি, studio নেয়নি, এমনকি raw film stock যেটা পাওয়া যায়না সেটাও আমি বিনে পয়সায় পেয়েছিলাম। এসব ছাড়া যে সামান্য পয়সা লাগে তা আমরা নিজের ট্যাঁক থেকে জড় করে করেছিলাম ছবিটা। কিন্তু আমরা এমন বোকা ছিলাম যে ছবির শেষ পর্যায়ে গিয়ে ব্যবসাগত ব্যাপারে একটা বাজে লোকের পাল্লায় পড়লাম আর সমস্ত জিনিষটাই নষ্ট হয়ে গেল। আমাদের মন ভেঙ্গে

গেল, বুক ভেঙে গেল। ও ছবি কোনদিন release হবার সম্ভাবনা নেই দেখে আমরা ধরেই নিলাম যে লোকে আর ও ছবি দেখতে পাবে না।…

ছবি complete, censored, এ একটা ট্র্যাজেডি, এ এক ইতিহাস, এর স্তরে স্তরে বহু অধ্যায় আছে। ওসব কথা থাক, মোটামুটি কথা হচ্ছে বেশ ভালো মতো জুতো খাওয়া দিয়ে আরম্ভ হল আমার careerটা, পেটে ভালো পড়েছিল, পিঠেও পড়েছিল, বাবা মারা যাওয়ার পর যা কিছু সামান্য খুঁদকুড়ো পড়েছিল সব চলে গেল এ ছবি করে।

তাছাড়া এ ছবিতে আমাদের একটা প্রাণপণ চেষ্টা ছিল রাজনৈতিকভাবে কিছু করার, কিছু বলার। আমার একজন বন্ধু, যিনি এদেশের একজন খুব বড় পরিচালক এ ছবি দেখে আমায় বলেছিলেন, আপনার এ ছবি ভয়ঙ্কর রাজনীতি-ঘেঁষা। আমারও তাই ধারণা। তখন আমাদের বি টি আর-য়ের যুগ, বি টি রণদিভে, অর্থাৎ leftisim-য়ের মধ্যে কমিউনিস্ট পার্টি ঢুকে গিয়েছিল, অনেকটা এখনকার Naxalite রাজনীতির মত।

তেলেঙ্গানা অভ্যুত্থানের সমসাময়িক। একান্ন সালে লেখা, একান্ন সাল পুরো লাগে, একটু একটু করে পয়সা আসে একটু করে কাজ হয়। বাহান্ন সালে ছবি শেষ হয়, censoredও হয়। আমার ঐ বন্ধু ঠিকই বলেছিলেন, ছবিটি রাজনৈতিক ছিল।…ও ছবিটি দেখলে লোকে ভাবত ঋত্বিক ঘটক রাজনীতির জন্য ছবি করে। ও ছবিতে রাজনীতি ছিল সোচ্চার ভাবে, বেশীরকম ভাবে। ছেলেমানুষি উচ্ছ্বাসও ছিল। তবু হয়তো কিছু ছিল, জানি না। যাকগে। সে ছবি recover করার কোন উপায় নেই এখন। তখন ছবির print গুলো ছিল nitrate based, ভালো ভাবে না রাখলে কিছুদিন vault-এ থাকলেই sticky হয়ে যায়। এখন film গুলো একেবারে তাল পাকিয়ে গেছে।”

ছবিটা উদ্ধার হওয়ার পর দুটো রিল sticky ছিল। কোন নেগেটিভ ছিল না। পুণা ফিল্ম ইনস্টিটিউটের আর্কাইভসের কিউরেটর Mr. P. K. Nair-কে একটি চিঠি লিখি। Mr. Nair-এর উত্তর আসে। তিনি তাঁদের অধিকদার every inch of work preserve করতে চান। তাই পুরোনো

প্রিন্টটা মিউজিয়াম অব আর্কাইভসে রেখে দিয়েছেন। আর এই প্রিন্টটির একটি ডুপলিকেট নেগেটিভ করিয়ে নতুন প্রিন্ট পাঠিয়ে দেন।

'নাগরিক'-এর প্রডিউসার শ্রীভূপতি নন্দী ছবিটি আমার নামে লিখে দিয়েছেন। ভূপতিদা আমাদের খুবই স্নেহ করতেন। ছবিটি মুক্তিলাভ করার পর যদি কোন টাকা লাভ হয়, তাঁকে টাকা নিশ্চয়ই দেবো, কিন্তু তাঁর অসীম স্নেহের অবদানের কথা জীবনেও ভুলবো না।

যে ফিল্মগিল্ডের ব্যানারে ছবিটি তৈরী হয়েছিল, সেই ফিল্মগিল্ডের অংশীদার ঋত্বিক ঘটকও ছিলেন।

মৃত্যুর দুমাস পরেই শ্রীবীণা ফিল্মস 'মেঘে ঢাকা তারা' ও 'কোমল গান্ধার'-এর জন্য আমার ওপরে ইনজাংশন দেন। অ্যাডভোকেট শান্তি সিংহ ও দ্বিজেন বাগচী এবং মহেন্দ্রর অক্লান্ত চেষ্টায় গত ডিসেম্বর মাসে সিভিল কোর্টে কেস ডিসমিস হয়েছে। কিন্তু ছবি দুটির ডিষ্ট্রিবিউটর আবার ই. আই. এম. পি. এ-তে আমার বিরুদ্ধে অবজেকশন দেন। আমি উত্তর দিয়েছিলাম। ছবি দুটি দশ বছর পরে রি-সেন্সর করানো হয়নি। সেইজন্য তাঁরা গত পাঁচবছর ব্যবসা করতে পারেননি। এই ছিল আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ। ই. আই. এম. পি. এ-তে কয়েকটি মিটিংয়ের পর শেষ পর্যন্ত বিচারকমণ্ডলী আমার পক্ষেই রায় দিয়েছেন।

'যুক্তি তক্কো গপ্পো' রিলিজের জন্য অনেক চিঠিপত্র এফ. এফ. সি.-কে লিখেছিলাম। হঠাৎ চিঠি পাই ঐ শ্রীবীণা ফিল্মস-ই ছবিটির ডিষ্ট্রিবিউশন নেবার চেষ্টা করায় এফ. এফ. সি. রাজী হয়েছে। আমার কাছে এগ্রিমেণ্ট সই করবার জন্য কাগজপত্র আসে। সই করিনি। এবং অনেক কষ্টে শ্রীবীণা ফিল্মসকে বাতিল করিয়ে স্টার-এর মালিক শ্রীরঞ্জিৎমল কাংকরিয়ার সঙ্গে ডিষ্ট্রিবিউশন সই হয়েছে।

'বগলার বঙ্গদর্শন'-এর প্রযোজক হঠাৎ ছবিটি শেষ করবার জন্য যে শর্তাদি নিয়ে আসেন, তাতে দেখলাম তাঁরা হিন্দী বাংলা সব স্বত্বই নিতে চান এবং অত্যান্ত আক্রমণাত্মক ভঙ্গী। সই করিনি। দীর্ঘ বারো বছর পর গল্পের স্বত্ব আমার নামে রেজিষ্ট্রি করিয়ে নিয়েছি। ই. আই. এম. পি. এ-তে বুলেটিন বেরিয়ে গেছে।

এইভাবেই গত একটি বছর আক্রমণের পর আক্রমণ গেছে। রামকিংকর

বেজের ওপর কালারে তোলা ডকুমেণ্টারিটির ডুপলিকেট নেগেটিভ হয়েছে।
ছবিটির এডিটিং ও শেষকাজ এইবার রমেশ যোশী করবেন।

এরপরে 'তিতাস একটি নদীর নাম'ও এই দেশে আনার চেষ্টা করা হবে। 'সুবর্ণরেখা-র' ব্যাপারেও প্রযোজক এবং ডিস্ট্রিবিউটরের মধ্যে কি গোলমাল আছে জানি না, খোঁজখবর নিয়ে সমস্ত গোলমাল যাতে মিটে যায় ও ছবিটি সবাই দেখতে পান, তার জন্যও চেষ্টা করা হবে।

বহু পরিকল্পনাই কার্যকরী হয়নি, মনটা ভারী হয়ে আসে। '৭৫ সালে যখন বোম্বে গিয়েছিলাম তখন একদিন বসে ঠিক হয়েছিল—মণি কাউল, কুমার সাহানী ও ঋত্বিক ঘটক তিনটি আলাদা গল্পের ভিত্তিতে একটি ছবি তৈরী করবেন। গল্প প্রত্যেকের নিজস্ব। সিরাজ প্রযোজনা করবে এই কথাও হয়েছিল।

গল্পটির আইডিয়াও একদিন বলেছিলেন। সমুদ্রের ধারে একটা জেলেদের বস্তি। সমুদ্রে মাছ ধরতে যায়। সেখানে একটি ছোট বোবা মেয়েকে নিয়ে গল্প। বান্দ্রার সমুদ্রতীরে একটা জায়গায় ছবিটি তোলা হবে ঠিকঠাক হয়েছিল। জায়গাটি দেখেওছিলাম।......

তারপরে এতো তাড়াতাড়ি জীবন শেষ হবে কি ভেবেছিলাম? গত একটি বছর শুধু এই একটি কথাই ভেবেছি। সমস্ত স্মৃতি যেন আছড়ে পড়ছে।......গত তিনটি মাস ধরে শুধু ভেবেছি লেখাটি তো আমাকে শেষ করতেই হবে।

প্রথম যেদিন দেখেছিলাম বারবার মনে হয়েছিল একটি ঋজু চেহারা, ঋজু চরিত্র, নিজের বক্তব্যে সোচ্চার! আশ্চর্যভাবে আশা-নিরাশায়, সুখে-দুঃখে, সুস্থ ও অসুস্থ অবস্থায় ঐ ঋজু মানুষটির বক্তব্য সোচ্চারই থেকেছে। এইখানেই মানুষটির বৈশিষ্ট্য, এইখানেই তিনি ঋত্বিক। পুরোহিত।

একদিন যাকে দেখে মনে হয়েছিল, বাংলাদেশের এক ছেলে মার্কসবাদে বিশ্বাস করে এগিয়ে নিয়ে যাবেন সাংস্কৃতিক আন্দোলনকে, ভারতীয় ঐতিহ্যকে—আজ তাঁর সৃষ্টি আলিঙ্গন করছে দেশ-বিদেশ ও মহাদেশকে! জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত নিজের বক্তব্যে সোচ্চার!

এই আপোষহীন শিল্পী ও শহীদ!

এবং নিজের শিল্পসৃষ্টিতে অনন্য এই ঋত্বিককে আমার প্রণাম!

সুখে-দুঃখে
একুশ বছর

১০
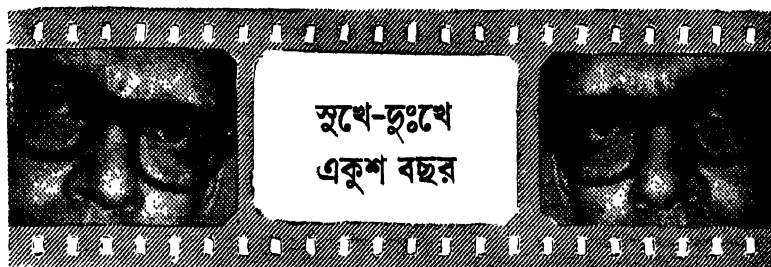
আপনারা আমাকে লিখতে অনুরোধ করেছেন। একজন পরিচালকের স্ত্রী হিসেবে কয়েকটি শব্দ অনেকবার শুনেছি। যেমন 'মন্তাজ' শব্দটি। 'অযান্ত্রিক'-এর বিমল গাড়ীর স্টিয়ারিং ধরে চোখ বন্ধ করে বসেছিল—জগদ্দলের স্মৃতি ভেসে উঠেছিল মনের আয়নায়। আমার জীবনের স্টিয়ারিং ধরেও আজ বিমলেরই মতো বসে আছি। ২১টি বছরের স্মৃতি পরপর মনে হচ্ছে গভীর বেদনায়।

আমার বাবা শিলং-এ কাজ করতেন। ছোটবেলা মা মারা যাবার পর বাবার কাছে থেকেই কলেজে পড়াশোনা করেছি। পার্টির কাজও ওখানেই। জেল থেকে ছাড়া পাবার পর শিলং-এর বাড়ীর অনেক সমস্যা, নিজের জীবনেও অনেক সমস্যা, পার্টিও তখন সঠিক পথে চলছিল না।

চলে আসি কলকাতায় এম. এ. ক্লাসে সিট পেয়ে। '৫২ সালের নির্বাচনে কাজ করি। প্রচণ্ড সাইনাসাইটিস, চোখেও পাওয়ার বৃদ্ধি, ক্লাস করা বন্ধ করি। মামা ও মামীমণির (ক্ষিতীন রায়চৌধুরী ও সাধনা রায়চৌধুরী) বাসায় এসে মামীমণির সঙ্গে আই. পি. টি.-এর সাউথ স্কোয়াডে অভিনয় শুরু করি।

ঋত্বিক ঘটক নামটি শুনেছিলাম। ভীষণ ইনটেলেকচুয়াল কিন্তু ভীষণ ট্রটস্কাইট। 'নাগরিক' নামে একটি ছবি করেছেন। একদিন ভূপতি নন্দী আমাকে ছবিটি দেখতে নিয়ে যান। মানুষটিকে তখনও দেখিনি। কাগজে কাগজে ছবিটির খুব বিজ্ঞাপন বেরোত।......একটি বেকার যুবক চাকরী ও ঘর বাঁধার স্বপ্ন দেখে। রোজ ঘরের একটি ক্যালেণ্ডারের ছবির দিকে তাকিয়ে দেখে, রাত্রে দূরের রাস্তায় এক বেহালাবাদকের সুরের মূর্ছনা শুনে শুনে ঘুমিয়ে পড়ে। যুবকটির চাকরী হয় না, অবস্থা খারাপ থেকে খারাপের দিকে

যায়। বোনটিরও বিয়ে হয় না। ভদ্রলোক বেকার। ছবির শেষে ভেসে আসে ইণ্টারন্যাশনাল সঙ্গীতের সুর। অর্থাৎ সংগ্রাম ছাড়া কোন সমাধান নেই।

প্রথম দেখি ও বক্তৃতা শুনি প্রথম আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবের পর যেদিন রাশিয়ান ডেলিগেশনদের সংবর্ধনা জানানো হয় টেকনিসিয়ান স্টুডিয়োতে। রোগা ও লম্বা চেহারা।

মনে পড়ে 'বিসর্জন' নাটকটিও দেখেছিলাম। কলকাতায় তখন আই. পি. টি. এ.-র সেণ্ট্রাল স্কোয়াডের খুব নাম। 'বিসর্জন' নাটকে উৎপল দত্ত, কালী ব্যানার্জী ও ঋত্বিক ঘটকের একত্র অভিনয় খুবই উল্লেখযোগ্য। জয়সিংহের ভূমিকায় কালী ব্যানার্জীর ও রঘুপতির চরিত্রে ঋত্বিক ঘটকের অভিনয় চির-স্মরণীয় হয়ে আছে।

'৫৩ সালে গণনাট্য সংঘের সর্বভারতীয় বোম্বে সম্মেলনে 'দলিল' নাটকটি প্রথম পুরস্কার পায়। ঋত্বিক ঘটকের নাটক। পরিচালনা এবং প্রধান অভিনেতাও নিজে। একটা ভীড়ের দৃশ্যে সমীরণ দত্তের অনুরোধে একটুখানি অভিনয় করে দিয়ে আসি। রোগা, লম্বা চেহারার মানুষটি আমাকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করতে আসেন।

সর্বভারতীয় সম্মেলনে যে প্রস্তাব নেওয়া হয়, তার ভাষাটা আমার ভাল লেগেছিল। এই নদীমাতৃক বাংলাদেশের সংস্কৃতি কিভাবে গড়ে উঠেছে, কিভাবে একে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে ইত্যাদি। সম্মেলন থেকে ফেরার পর প্রত্যেক স্কোয়াডে ঐ প্রস্তাবের বিষয় আলোচনা করতে আসেন ঐ মানুষটি। প্রস্তাবের বক্তব্য ও ভাষা আগেই আকৃষ্ট করেছিল। এবার প্রত্যক্ষ শুনে মানুষটির প্রতি একটু আকৃষ্ট হই।

'৫৪ সালের প্রথমে বাবার কাছে কিছুদিন থেকে এসে দেখি মামীমণিদের বাসায় রোজই এসে নাটক নিয়ে আলোচনা করছেন। অবাক হই, কারণ, মামীমণিরাই বলেছিলেন—ঋত্বিক ঘটক, উৎপল দত্ত, সলিল চৌধুরী এরা ইনটেলেকচুয়াল হলেও ট্রটস্কাইট। একেবারে মিশবে না।

উমানাথদা (উমানাথ ভট্টাচার্য) গোর্কীর 'লোয়ার ডেপথ'-এর অনুবাদ করেছিলেন 'নীচের মহল' নাম দিয়ে। আই. পি. টি.-এর তিনটি শাখার বাছাই করা ছেলেমেয়েদের নিয়ে একটি করলে আই. পি. টি. এ-র খুব

নাম হবে। এই দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে 'নীচের মহল' নাটকটির রিহার্সাল আরম্ভ করেন।

কাজপাগল মানুষটির পরিচয় তখনই পাই। আমাকেও একটি পার্ট দেন। সমাজের নীচুতলার মানুষদের নিয়ে লেখা নাটকটি সম্বন্ধে আমাকে একটি ভূমিকা লিখে দিতে বলেন। লিখে দিই। পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে সত্য ও বড় হল মানুষ। 'সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই।' প্রথম প্রথম মামীমণিকে বলতেন, 'সাধনাদি! আপনাদের বাসায় এই Das Kapital মেয়েটি কে?' আমার লেখাটা দেবার পর একটু আলাপ-পরিচয় আরম্ভ হয়।

ইতিমধ্যে মামীমণি ও নিবুমাসীকে (নিবেদিতা দাস) 'বিসর্জন' নাটকের জন্য শিখিয়ে কলকাতার বাইরে সবাই একদিন অভিনয় করতে যান। রিহার্সালে দেখতাম ক্লান্তি নেই কোনো। অপর্ণার কথা 'বসে আছি ভরা মনে, দিতে চাই—নিতে কেহ নাই।'—জয়সিংহের উত্তর 'তাই বটে, তাই বটে! সৃজনের আগে দেবতা যেমন একা'...ইত্যাদি। কতবার দেখানো ও শেখানো—বুঝতাম কত গভীর মানুষটি! মানুষটির প্রতি আর একটু আকৃষ্ট হই।

আমার পড়াশোনার ও জানবার আগ্রহ বুঝে আমাকে স্টানিস্লাভস্কি ও গর্ডন চাইল্ডের বই কিনে (আর্কিওলজির ওপর) পড়াতে শুরু করেন। মামীমণিরাও শুনতেন।

একদিন মনটা খুব খারাপ ছিল। পড়ানোর পর আমার মার সম্বন্ধে একটু বলি। মা ছোটবেলা মারা গেছেন, অনেক কষ্টে পড়াশোনা করেছি। জেলে ছিলাম প্রায় দুই বছর। মা থাকলে জীবনটা অন্যরকম হতো। আমরা দুই ভাইবোন হলেও মার অনেক ছেলে ছিল। খুব অল্প বয়সে মা মারা যান, কিন্তু মার ব্যক্তিত্ব ও স্নেহভালবাসায় মুগ্ধ হয়ে অনেকে মাকে মা ডাকতো। আর মা ছিলেন খুব তেজস্বিনী। মায়ের লেখা ডায়রীটি পড়তে পড়তে দেখি চেহারাটা অন্যরকম হয়ে গেছে, চোখটা ছলছল। সেদিনের দুটি কথা আমার সম্বন্ধে—'সেতারের একটি রাগিণী শুনছি', মার সম্বন্ধে—'এই মা থাকলে আমাকে মানুষ করতে পারতেন।' আর 'লক্ষী! আমি তোমার জন্য সব করবো।' সেদিন মনে হয়েছিল, 'এ আমার মার ছেলে।'...সন্ধ্যে হয়ে যায়। রিহার্সালে যেতে একটু দেরী হয়। একটি

ছেলে ও মেয়ের একটু ঘনিষ্ট হওয়া সহজভাবে সাধারণত কেউ দেখে না। মৃদু গুঞ্জন শুনি।

'নাগরিক' ছবিটি মুক্তিলাভ করেনি। মনে প্রচণ্ড হতাশা, বাড়ীতে প্রচণ্ড অর্থাভাব। কিন্তু সব সময় পড়াশুনা করতে দেখতাম। পার্টিতে কালচারাল লাইন সম্বন্ধে কেউ চিন্তা করতো না। পার্টি-সম্পাদক অজয় ঘোষ একদিন আমাদের বাড়ীতে (অজয় দাসের বাড়ী) আসেন। অজয়-মামার বাড়িতেই নীচে মামামামীমার কাছে আমি থাকতাম।

কালাচারাল লাইন সম্পর্কে সেদিন অজয় ঘোষের সঙ্গে আলোচনা করেন। অজয় ঘোষ সমর্থন করেন। এ ছাড়া কমিউনিস্ট পার্টি ভারতের অবস্থা বুঝে মার্কসবাদকে প্রয়োগ করে কোন তত্ত্ব বের করেনি। আমাদের দেশের সমস্যা চীন ও রাশিয়ার মতো নয়। অভিজ্ঞতা আমরা গ্রহণ করতে পারি। রাশিয়ায় লেনিন বিপ্লবের প্রতিটি পদক্ষেপে নতুন নতুন বই লিখে গেছেন : 'What is to be done ?' 'One step forward, two steps back' ইত্যাদি। চীনে মাও সে-তুং লিখেছিলেন 'New Democracy বা 'নয়া গণতন্ত্র'। আমাদের দেশে কি লেখা হয়েছে ? কিছু না।

ভারতের বেদ-বেদান্ত, দর্শন ও ঐতিহ্যকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। দেশের সমস্যা-অনুযায়ী তত্ত্ব লিখে বিপ্লব সমাধান করে দেশকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে সাংস্কৃতিক উন্নতির পথে। এইভাবেই ঐসময় আমরা চিন্তা করতাম। কিন্তু আমরা সাধারণ কর্মী। নেতারা নির্দেশ দিলে কাজ করবো। তত্ত্ব আবিষ্কার করা বা নেতৃত্ব দেবার ক্ষমতা তো আমাদের নেই। তাই পার্টিসভ্য হলেও তখন কাজে খুব উৎসাহ ছিল না।

একদিন বই সম্বন্ধে আলাপ করতে করতে দেখি খুবই চিন্তান্বিত। পরদিন হাতে একগাদা বই। প্লেখানভ ও লেনিনের ওয়ার্কস। লেনিন শেষ বয়সে শুধু কালচারাল বা সাংস্কৃতিক উন্নতির সম্বন্ধেই বলে গেছেন। বইয়ের লেখাগুলো আজও মনে পড়ছে। তিনদিনের মধ্যে পড়াশুনা করে কাল-চারাল লাইনের ওপরে একটি থিসিস লেখেন। পার্টির উচ্চতম থেকে স্থানীয় কমিটি পর্যন্ত সব জায়গায় থিসিসের কপি পেশ করা হয়। শেষ কপিটি দেওয়া হয়েছিল হেমাঙ্গদাকে। দিল্লী থেকে নিখিল চক্রবর্তী সেন্ট্রাল কমিটিকে

পাঠানো। থিসিসের প্রাপ্তিসংবাদ জানান। কিন্তু কোনো কমিটি এই সম্বন্ধে কিছু করেননি। জানি না থিসিসটি কোথাও আছে কিনা।

ঐ সময় পার্টির প্রচণ্ড বিরূপতার কথাও মনে পড়ে। 'নীচের মহল'-এর রিহার্সাল চলছে। হঠাৎ মামীমণি একদিন বললো, 'ঋত্বিকের সঙ্গে একদম মিশোনা—ও শিগগিরই পার্টি থেকে expelled হয়ে যাবে।' খোঁজ নিয়ে জানা গেল একটি ওয়ান-ম্যান-কমিশন বসেছে। প্রমোদ দাশগুপ্ত মেম্বার। যতোগুলো চার্জ ছিল, প্রতিটির উত্তর দেবার পর পার্টি কিছু করতে পারেনা।

এরপরে আমাদের বাড়ীর ছাদে, পার্টির সেল মিটিংয়ে বহু কমরেডের সামনে আমার সম্বন্ধে agenda রেখে বলা হয়, 'ঋত্বিকের সঙ্গে মিশলে সর্বনাশ হয়ে যাবে।' আমার বক্তব্য ছিল, 'আদর্শ থেকে ব্যক্তি বড় নয়, কিন্তু চার্জ প্রমাণিত না হওয়া পর্যন্ত আমি কাজ করে যাব।' জ্যোতি বসু চিঠি পাঠান নাটকের রিহার্সাল চালিয়ে যেতে। কিন্তু চিঠিটি চেপে দেওয়া হয়। নাটকের রিহার্সাল বন্ধ হয়।

নাটকটি মঞ্চস্থ হলে গণনাট্য সংঘের ইতিহাসে নামটি উজ্জ্বল হয়ে থাকতো। কালী ব্যানার্জী, উমানাথদা, মমতাজ আহমেদ, অমল কর, জ্ঞানেশ মুখার্জী প্রভৃতি অনেকেই অভিনয় করেছিলেন। আমি মানুষটির সঙ্গে সরল মনে মিশতাম, পড়াশোনা করতাম। পরদিন সমস্ত শুনে পরিষ্কার বক্তব্য: "তোমাকে আমার মা ও দিদির সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেবো। আমাদের বাড়ীর পরিবেশ একেবারে অন্যরকম।" আমি সেদিন মামীমণির আপত্তি সত্ত্বেও ওঁর সঙ্গে যাই। মা ও দিদির সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেবার পর রোজ বালীগঞ্জ প্লেসের বাড়ীতে গিয়ে পড়াশোনা করতাম। উমানাথদাও আসতেন। মার সঙ্গেও প্রায় রোজই কিছুক্ষণ বসে কথাবার্তা বলতাম। এবং সাউথ স্কোয়াড থেকে ট্র্যান্সফার নিয়ে সেন্ট্রাল স্কোয়াড বা অনুশীলন সম্প্রদায়ে চলে এলাম।

মমতাজ আহমেদ একটি ছেলের লেখা নাটক নিয়ে এসে বলেন রি-রাইট করে দিতে। তিনটি দৃশ্য রি-রাইট করে শেষ তিনটি দৃশ্য নিজেই লেখেন। এবং নাটকটির নাম দেন 'ইস্পাত'। 'ইস্পাত' নাটকের রিহার্সাল আরম্ভ হয়। রিহার্সাল থেকে বাড়ী ফেরার পথে হাঁটতে হাঁটতে অনেক কথা শুনতাম।

এম. এ. পরীক্ষা না দিয়ে বিমল রায়-এর 'তথাপি-তে প্রথম অ্যাসিসট্যান্ট

হিসেবে কাজ করার পর তারাশঙ্করের লেখা 'বেদেনী' বইটির স্যুটিং আরম্ভ করেন ঘাটশিলায়। টাকার অভাবে ছবিটি শেষ হয়নি। আর যতটুকু স্যুটিং হয়েছে বোধহয় লাইট বেশী এক্সপোজ করায় একেবারে ডার্ক হয়ে গেছে। একটি ছবিও বোঝা যায়নি। প্রভা দেবী, কালী ব্যানার্জী প্রভৃতি অভিনয় করেছিলেন। এবারে 'নাগরিক' করার সমস্ত ইতিহাস শুনি। কিন্তু ছবিটি মুক্তি পায়নি। আর শুনি 'জীয়নকন্যা'র কথা। বোধহয় বিজনবাবু নাটক করবার কথা ভেবেছিলেন। শুনতে শুনতে রোজ বাড়ী পৌঁছতাম।

ইতিমধ্যে মমতাজও একদিন ঋত্বিক ঘটকের বিরুদ্ধে চার্জ আনেন—অনেকেই সমর্থন করেন। মিটিং থেকে বেরিয়ে হাজরা পার্কে সেদিন আমাকে জিজ্ঞেস করেন, 'লক্ষ্মী! তুমি কি আসবে?' আমি 'আসবো' বলে চলে আসি। এবং সেদিনই প্রস্তাব করি—এই পার্টি ও আই. পি. টি. এ-র চার্জ কোনো কাজ করতে দেবেনা—সুতরাং সমস্ত ছেড়ে 'গ্রুপ থিয়েটার' নাম দিয়ে গ্রুপ গঠন করে নাটক করতে। ইতিমধ্যে স্টানিস্লাভস্কির গ্রুপ এ্যাক্টিংই যে ওঁর আদর্শ সেটা বুঝতে পেরেছিলাম।

২.

'সাঁকো' নাটকটি লেখা আরম্ভ করেছিলেন, কয়েকদিনের মধ্যেই শেষ হয়। এক দাঙ্গার সময় এক সাগর মহসীনকে বাঁচিয়েছিল। পরবর্তী দাঙ্গায় আর এক সাগর মহসীনকে না বুঝে ধরিয়ে দেয়। সাগর পূর্ববাংলা দেখেনি। ভাটিয়ালী গান শোনেনি।...ছোট বোন থাকতো ঢাকায়। হঠাৎ লেটার বক্সে একটা চিঠি দেখে মাথাটা কি রকম হয়ে যায়। মহসীনের কাছে ভাটিয়ালী গান শুনে নিজেও গাইছিল। সুরটা চড়িয়ে দেয়—গুণ্ডারা সার্চ করতে এসে মহসীনকে ধরে নিয়ে যায়।

নাটকের প্রথম অঙ্ক শেষ হয়। সাগর মাথায় হাত দিয়ে বসে আছে। ভাই শঙ্কর বলছে, 'সিংহাসন গ্রাম—এর পরের বাঁকে কি?' দ্বিতীয় অঙ্কের প্রথম দৃশ্যে সাগর গেছে সিংহাসন গ্রামে মহসীনের মা-বাবার কাছে ক্ষমা চাইতে। সেদিন ছিল ঈদের দিন। মহসীনের মা-বাবা অপেক্ষা করছেন ওদের একমাত্র মেয়ে জবার (গুলসান বিবি) জন্য। এমন সময় সাগরদের আবির্ভাব।

সাগর নাম শুনেই তাঁরা ধরে নেন এ ঐ সাগর যে মহসীনকে বাঁচিয়েছিল। সাগর কিছুতেই বলবার সুযোগ পায়না।...আর রোজ মার কাছে শুনতো—

'নানান বরণ গাভীরে ভাই, নানান বরণ দুধ ;
ভুবন ভরমিয়া দেখলাম একই মায়ের পুত।'

নাটকটি আমাকে মুগ্ধ করে। রিহার্সাল আরম্ভ হয়। গ্রুপ থিয়েটারকে পার্টি স্বীকার করে। সেল গঠন করা হয়। আমি সেল সেক্রেটারী হই। বালীগঞ্জ লোকাল কমিটির সেক্রেটারী শচীন সেন ও জ্যোতি বসুর কথা খুব মনে পড়ে। খুব চাইতেন ঋত্বিক ঘটক কাজ করুক। গ্রুপ থিয়েটারে সাউথ স্কোয়াড থেকে এসেছিল উমাপ্রসাদ মৈত্র, ওর নিজের স্কোয়াড থেকে শৈলেন ঘোষ। বাইরে থেকে বুলবুল (সতীন্দ্র ভট্টাচার্য), সনৎ ও কেষ্ট মুখার্জী।

আমার পারিবারিক ও ব্যক্তিগত সমস্যা বৃদ্ধি পায়। মামা ও মামীমণির তখন খুব আর্থিক সংকট। মামার ব্যবসা ভাল চলছিল না। আমার মেশোমশাই খুব অসুস্থ। আমাদের ছোটবেলা 'মাসপয়লা' কাগজের সম্পাদক ছিলেন। একমাত্র ছোট ভাই বায়ো-কেমিষ্ট্রিতে রিসার্চ করতে করতে অসুস্থ হয়ে পড়ে শিলং গিয়েছিল বিশ্রাম নিতে। বাবা অবসর নিয়েছেন। আমিও টাইপ-শর্টহ্যাণ্ড শিখতে শিখতে চাকরীর চেষ্টা করছিলাম। মনটা ভাল ছিলনা।

রিহার্সাল এগিয়ে চলে। জবার অভিনয় করেছিলাম। নাটকের কয়েকটি কথা—'জীবনটা বহতা নদী, পলি পড়ে বহুকাল ধরে, চর জাগে বহুকাল পরে।' ঐ সময় বিহার সরকারের কয়েকটি ডকুমেণ্টারির কাজ পেয়ে বিহার চলে যান। বুলবুল রিহার্সাল পরিচালনা করতো। রাজগীর থেকে চিঠি আসে।...ঐ সময় থেকে শেষ পর্যন্ত সব চিঠিই গুছিয়ে রেখেছি। মনে পড়িয়ে দেয় ২১ বছরের জীবনকে যে জীবনে ভালবাসা, আনন্দ, দুঃখ, বেদনা যেন একই সঙ্গে বাজছে।

প্রথম আলাপ-পরিচয়ের পর আমার শিলং জেলে বসে লেখা তিনটি খাতা (পাগলী, গণিকা, চোর, খুনী মেয়েদের সম্বন্ধে) পড়ে আমাকে একটা চিঠি লিখেছিলেন। সে চিঠি এখনো আছে। আর বারবার একটা কথা : 'খাতাগুলো গুছিয়ে লিখে ফেল, ছাপাবার বন্দোবস্ত করবো।' আমার প্রতি সে

সময়কার অসীম স্নেহ-ভালবাসার কথা ভুলবোনা। আর একটা অসহায় ও আঁকড়ে ধরার ভাব: 'লক্ষী! তোমাকে পেলে জীবনটা গুছিয়ে আরম্ভ করবো।' আমি কোন সময়ই কিছু বলতাম না, চুপচাপ থাকতাম।

আমি সাধারণ মেয়ে! বিরাট অভিনেত্রী নই। শুধুমাত্র অভিনেত্রী হবার কোনো ইচ্ছেও ছিলনা। সাইড লাইন হিসাবে অভিনয় করতাম। শোভাদি (শোভা সেন), গীতা (মৃণাল সেনের স্ত্রী), কেতকী (প্রভা দেবীর মেয়ে) এবং প্রভা দেবীর কথা ওঁর মুখেই শুনেছি।

কিন্তু মানুষটির অসাধারণ ব্রেন ও দার্শনিক গভীরতা আমি বুঝতাম। জীবনের হতাশা (প্রায়ই শুনতাম, আমি সুইসাইড করবো, কারণ 'নাগরিক' মুক্তিলাভ করেনি), অর্থাভাব, ছন্নছাড়া বোহেমিয়ানিজম ছিল। ভাবতাম সব ঠিক হয়ে যাবে। আমরা একাত্ম হয়ে পড়ি। এই সময় একদিন মৃণাল সেন ও গীতার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেন।

বিহার থেকে ফেরার পর নাটকটি রংমহলে অভিনীত হয়। বাবাকে চিঠি লিখেছিলাম। নাটক শেষ হবার পরই বাবার সঙ্গে আলাপ-পরিচয় করবার জন্য আমাকে নিয়ে শিলং যান। মার্চ-এর শিলং-এর ঝরাপাতার দিনে একদিন তরুণীমনে যে বিষণ্ণ বেদনা জেগেছিল, বাবার কাছে কিছুদিন ঐ সময় থেকে এতো বছর পর সে বিষণ্ণতার অবসান হয়। বাবা '৫৫ ইংরাজীর ৮ই মে (২৪শে বৈশাখ) শিলং-এ আমাদের বিয়ে দেন।

বিয়ের পর মার (শ্বাশুড়ী) স্নেহভালবাসার কথা জীবনে ভুলবো না। কিন্তু বিয়ের আট মাস পরেই তিনি মারা যান। শ্বশুরমশাইকে দেখিনি, আমার বাবার কাছে শুনেছিলাম তিনি খুব সুপুরুষ, বিদ্বান, সুবক্তা ও ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন। বহরমপুরে বড ভাসুর শ্রীমণীশচন্দ্র ঘটকের বাড়ীতে আমাদের বৌভাত হয়। বডদা ও বডদি বহরমপুরে বাড়ী করে এখনো ওখানেই আছেন। বড়দা 'কল্লোল' যুগের লেখক। 'যুবনাশ্ব' নামে লিখতেন। শৌখীন ও রাবীন্দ্রিক চেহারা। দিদি, ডলিদি, মিলিদি ও ভবীর (তপতী, সম্প্রীতি, ব্রততী, প্রতীতি) এবং আমার জা-দের স্নেহ ভালবাসায় আমার জীবন পূর্ণ হয়।

বিয়ের তারিখ ঠিক হবার পরই বোম্বে থেকে সলিলদার টেলিগ্রাম এসেছিল ফিল্মিস্তান স্টুডিওতে চাকরীর ইন্টারভিউর জন্য। বিয়ের পরই

বোম্বে চলে যান। ইণ্টারভিউ ও চাকরী হয়। মার বয়স হলেও তিনি ছেলের সঙ্গে আমাকে বোম্বে পাঠিয়ে দেন।

বোম্বেতে ফিল্মিস্থান স্টুডিয়োতে গল্প ও চিত্রনাট্যকার হিসেবে কয়মাস চাকরী করার পরই চাকরী ছেড়ে দেন। চাকরীর মাইনে সামান্য ছিল। শশধর মুখার্জী স্নেহ করতেন।

বোম্বে যাবার পর কলকাতা-জেলা-সম্পাদকের কাছ থেকে চিঠি আসে : পার্টি মেম্বারশিপ্ রোলে ঋত্বিক ঘটকের নামটা ভুল করে ঢুকে পড়েছিল, ওটা ড্রপ করা হলো। বিমল রায়ের জন্য 'মধুমতী'র চিত্রনাট্য ও পরে ঋষিদার (ঋষিকেশ মুখার্জি) প্রথম বই 'মুসাফির'-এর চিত্রনাট্য লেখা শুরু করেন।

বোম্বেতে প্রথম নাটক করেছিলেন 'বিসর্জন'। নিজে রঘুপতি, অনীশ ও গীতা (অনীশ ও গীতা ঘটক) এবং সীতাদিও (সীতা মুখার্জী) অভিনয় করেছিলেন। নাটকটির বলিষ্ঠ পরিচালনা নাটকের বক্তব্যকে একটা গভীর ও উচ্চ মানবিক পর্যায়ে নিয়ে গিয়েছিল। রঘুপতির 'এ মন্দিরে দেবী নাই', এবং অপর্ণার 'পিতা চলে এসো, পিতা চলে এসো' অনুরণন তুলেছিল দর্শকদের মনে। সেটে একটি কালীমূর্তি ও বলির কাঠগড়া ছিল। এরপর আই. পি. টি. এ থেকে 'মুসাফিরো কে লিয়ে'। অনেকগুলো গল্প ও চিত্রনাট্য ঐ সময়কার লেখা।

আমাদের বড়ো মেয়েটির জন্ম হয়। ছোট ভাসুর (শ্রীলোকেশচন্দ্র ঘটক) ভীষণ ড্রিঙ্ক করতেন। জাহাজে চীফ অফিসার ছিলেন। ভাল লিখতেন ও আঁকতেন।

মেজো ভাসুর শ্রীসুধীশচন্দ্র ঘটকেরও ফিল্ম ডিভিশনের চাকরী (প্রথমে আসাম ও পরে নাগপুরে ইনচার্জ ছিলেন) তখন শেষ হয় এবং বোম্বে আসেন। তিনি দেবতুল্য লোক ছিলেন। ক্যামেরাম্যান হিসেবে খুবই নাম ছিল। কয়েকটি বই পরিচালনা করেছিলেন। বিলেত থেকে ক্যামেরা ও প্রথম টেলিভিশনের কাজ শিখে এসেছিলেন।

কলকাতায় সেজদার চাকরীর অবস্থাও তখন ভাল ছিল না। আমরা বড় মেয়েটিকে নিয়ে '৫৭ সালে কলকাতা চলে আসি।

৩.

আসার পর প্রথমে বি. এন. সরকারের 'নতুন ফসল' বইটি করবার কথা ছিল। কিন্তু তখন টাকা ছিল না। শিবশঙ্কর মিত্রের 'আর্জান সর্দার' বইটি করবারও আলোচনা হচ্ছিল। এই সময় 'অমৃতকুম্ভের সন্ধানে' বইটির চিত্রনাট্য বিমল রায়ের জন্য লেখেন।

পরে প্রমোদদা (শ্রীপ্রমোদ লাহিড়ী) 'অযান্ত্রিক' আরম্ভ করান। রাঁচীতে স্যুটিং আরম্ভ হয়। আমাদের ছোট মেয়েটির জন্ম হয়। একমাস পরে দুই মেয়ে সহ আমাকে নিয়ে যান।

অনেক দূরে দূরে লোকেশন। সারাদিন কাজ করার পর সবাই ক্লান্ত। একটু করে বিয়ার খাওয়া তখন শুরু হয়। একটু খেলে কিছু হবে না—এই ভাবেই শুরু।

একটানা স্যুটিংয়ের পর প্রশান্তদা (শ্রীপ্রশান্ত লাহিড়ী) এসে সমস্ত ধার-দেনা শোধ করে নেতারহাট বেড়াতে নিয়ে যান। ফিরে আসার পর এডিটিং চলছে। হঠাৎ রিলিজের তারিখ ঠিক হয়ে যায়। একটানা ১৮ দিন রাতদিন জেগে বই শেষ হয়। পরিশ্রম করবার অসাধারণ ক্ষমতা ছিল।

'নাগরিক' দেখে সত্যজিত রায় অনেক পরে একদিন বলেছিলেন: 'ঋত্বিকবাবু! বইটা সময়মতো রিলিজ হলে আপনিই পথিকৃৎ হতেন।' সত্যজিৎ রায়ের 'পথের পাঁচালী' ফিল্মের জগতে যে নতুন যাত্রাপথের শুরু করে সেখানে এসে হাত মেলায় 'অযান্ত্রিক'। দুজন পরিচালক ফিল্মের জগতে আলোড়ন সৃষ্টি করেন। পথিকৃৎ না হলেও ঋত্বিক ঘটকের নাম '৫৮ সালে ফিল্মের জগতে প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়। কিন্তু ছবি ব্যবসায়িক দিক থেকে সফল হয়নি। প্রচণ্ড হতাশা! ড্রিঙ্ক বাড়ে।

সেই সময় প্রমোদদার ও প্রশান্তদার বাড়ীতে একটা ফ্ল্যাট পেয়ে আমরা ২/৩ মাস ছিলাম। প্রমোদদা ও প্রশান্তদা এবং তাঁদের স্ত্রীরা (দুই বোন) দেবী ও দিদিভাই (নিজের ভাই না থাকায়) তাদের ঋত্বিককে নিজেদের ভাইয়ের মত স্নেহ করতেন।

কোন কাজ হয় না। আমি দুই মেয়েকে নিয়ে বাবার কাছে যাই।

কিছুদিন পর 'বাড়ী থেকে পালিয়ে' ও 'কত অজানারে' এই দুটি ছবির কণ্ট্রাক্ট হয়। ভবানীপুরে বাসা ভাড়া করেন। কলকাতায় এসে একবার 'সাঁকো' করেছিলেন। এরপরে বনফুলের লেখা 'বিদ্যাসাগরে'র রিহার্সাল শুরু হয়। দিনের বেলা সুটিং, সন্ধ্যার সময় রিহার্সাল। বোম্বেতেও এই ছিল নেশা। গীতাদি (গীতা বন্দ্যোপাধ্যায়) 'স্ত্রীর পত্র'র নাট্যরূপ লিখে একদিন দেখাতে নিয়ে আসেন। পরে বলেন—'ঋত্বিক! তুমিই পরিচালনা কর।' 'বিদ্যাসাগর'-এর রিহার্সাল বন্ধ হয়। 'স্ত্রীর পত্র'র রিহার্সাল আরম্ভ হয়। গীতাদির গ্রুপ ও আমাদের 'গ্রুপ থিয়েটার' এক হয়ে 'গ্রুপ থিয়েটার' নামই ধারণ করে। 'স্ত্রীর পত্র' মঞ্চস্থ হয়। দীর্ঘদিনের মতো নাটক করা এখানেই শেষ। গীতাদি 'গ্রুপ থিয়েটারে'র ব্যানারে নাটক এখনো করে যাচ্ছেন।

'বাড়ী থেকে পালিয়ে'র সুটিং শেষ হয়েছে। 'কত অজানারে'র সুটিং চলছে। 'কত অজানারে' বইটি শংকর-এর লেখা। কালী ব্যানার্জী 'বারওয়েল' সাহেবের পার্টে, অনিল চ্যাটার্জী শংকর-এর, ছবি বিশ্বাস আর একজন ব্যারিস্টারের এবং অসীমকুমার, গীতা দে, করুণাদি (করুণা বন্দ্যোপাধ্যায়) প্রভৃতি অভিনয় করেছিলেন। সমস্ত সুটিং শেষ, শুধু কোর্টের দৃশ্যটা বাকি ছিল। প্রডিউসার মিহির লাহা ছবিটার কাজ বন্ধ করে দেন। এটা একটা বজ্রাঘাত! অনেক স্টীল আমার কাছে আছে। 'বাড়ী থেকে পালিয়ে'-ও '৫৯ সালে ব্যবসায়িক দিক থেকে সাফল্য লাভ করেনি।

ডিঙ্কের মাত্রা বাড়ে।

অনেক চেষ্টার পর নিজে প্রযোজক হিসেবে 'মেঘে ঢাকা তারা' বইটির সুটিং আরম্ভ করেন প্রথমে শিলং-এ। আমি ঐ বছরই যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে এম. এ. ক্লাসে ভর্তি হই। দুটি মেয়ে সহ শিলং যাই। সুপ্রিয়া, বিশুবাবু ও মহেন্দ্র গুপ্ত (ডিস্ট্রিবিউটর) ছাড়া সবাই আমার বাবার বাড়ীতেই ছিলেন।

ফিরে আসার পর গীতা (ঘটক) আসে অভিনয়ের জন্য ওর মেয়েকে নিয়ে। সুটিংয়ের তিনমাস ও আমাদের বাসায়ই ছিল। ইউনিটের ছেলেরাও ভোরে সুটিং থাকলে আমাদের বাসায়ই শুয়ে থাকত। শেষরাত্রে সবাই বেরিয়ে যেতাম একসঙ্গে। স্টুডিয়োতেও সুটিং চলতো একটানা—সবাই

মিলে ছিলে যেন একটি পরিবার। বেণু (সুপ্রিয়া) খুব খেটেছিল। আমাদের ছোট বোনের মতো ছিল।

'মেঘে ঢাকা তারা' '৬০ সালে মুক্তি পায়। ভীষণভাবে সকলের মনে দাগ কাটে। আমি তখন ৫ম বর্ষ থেকে ৬ষ্ঠ বর্ষে উঠেছি। ক্লাসের বন্ধুরা এসে জড়িয়ে ধরে। শ্রদ্ধেয় বিষ্ণু দে, প্রণতিদি, বৌধায়নবাবু ও অশোক সেন-এর সঙ্গে এই সময়ই ঘনিষ্ঠতা হয়। নৃপেন বন্দ্যোপাধ্যায় শান্তিনিকেতনে চলে যাবার পর কলকাতা এলেই দেখা করতে আসতেন। বিশেষ বন্ধুদের মধ্যে খালেদ চৌধুরী, কবি শুদ্ধসত্ত্ব বসু প্রভৃতির কথা মনে পড়ে।

'স্বরলিপি' বইটির গল্প ও চিত্রনাট্য এই বছরেই লেখেন। ছোট দুই মেয়েকে নিয়ে আমরা পুরী ও কোণারকের মন্দির, ভুবনেশ্বরে উদয়গিরি খণ্ড-গিরি বেড়াতে যাই। ভুবনেশ্বরে একটি মন্দিরের চত্বরে বসে অনেক কথা হয়েছিল।...

'কোমল গান্ধার' নিজে প্রডিউসার হিসাবে স্যুটিং আরম্ভ করেন। বোলপুরে খোয়াই-এর দৃশ্য ('আজি জ্যোৎস্না রাতে সবাই গেছে বনে'), লালগোলায় পদ্মার দৃশ্য (নদীর ঐ পার দেখিয়ে নায়কের অঙ্গুলী নির্দেশ—'ওটা অন্য দেশ'), কার্শিয়াং ও দার্জিলিং-এ পাহাড়ের দৃশ্য ('আকাশভরা সূর্য তারা' গান) ভীষণ মনে পড়ে। বইটিতে ছিল আমার বাপের বাড়ীর দেশের (সিলেটের) লোকসঙ্গীত ও আই পি টি এ-র 'নবজীবনের গান'।

তখনও সবাই মিলে একই পরিবার। স্যুটিং করতে করতে শেষের দিকে ড্রিঙ্কের মাত্রা বাড়ে। আমি পড়াশোনা নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ি। বইটি মুক্তি পায় সালে। ক্লাসের বন্ধুরা এসে বলে : 'ছবিটা কিছু হয়নি।' 'স্বাধীনতা'য় বিরূপ সমালোচনা বেরোয়। হলের মধ্যে 'বোরিং' এই শব্দ শোনা যায়। ছবিটি সুপার-ফ্লপ হয়।

অসাধারণ খাটনী ও মানসিক চিন্তার এই ফল। ছবিটি বোধহয় এপিক ধরণেরও। অজিত লাহিড়ী ও পীযুষ গাঙ্গুলী প্রভৃতি এই সময় ইউনিট পরিত্যাগ করে চলে যান। বাংলা মদ খেয়ে পড়ে থাকা আরম্ভ হয়। এই চেহারা কোনদিন দেখিনি। পরীক্ষা সামনে। গাড়ী বিক্রি করে ড্রাইভারকে ছাড়িয়ে দি। লোকটি ভাল ছিল। আমাকে মা ডাকতো। এইবারও এসে দেখা করেছে। কাজের লোক একজন দেশে ও একজন কাজ ছেড়ে চলে যায়। তবু

চেষ্টা করি। ৪টি পেপার দিয়ে, ফিফথ পেপারের দিন দুটি মেয়ের অসুখ এবং কোনো নোট বা বই ছিল না। ১০টা পর্যন্ত পড়ে জিজ্ঞেস করি, কি করবো ? বলেন : ড্রপ করো। নির্বোধের মতো পরীক্ষা ড্রপ করি।

……বছরের শেষে বোম্বেতে একটি কাজ ঠিক হয়। একটি ইনস্টলমেণ্ট দেবার পর হঠাৎ রজনী প্যাটেল বোম্বেতে বলেন বইটি করবেন না। রাতদিন ড্রিঙ্ক। এই সময় রাধেশ্যাম ঝুনঝুনওয়ালা দেখা করে কথাবার্তা বলে 'সুবর্ণরেখা' আরম্ভ করান।

সালে আমরা চাকুলিয়া যাই। একটানা এক মাস সুটিং করে প্রায় বই শেষ হয়। ফিরে এসে বিশ্ববিদ্যালয়ে খোঁজ করি। পরীক্ষা দেবার অনুমতি পাই। কিন্তু পরীক্ষা দেবার মতো কোনো অবস্থা ছিল না। আমার জীবনে এম. এ. ডিগ্রীটা লাভ করা হয়নি। এই বছরটিই শেষ। এর পরে অন্য জীবনের শুরু।…

…'সুবর্ণরেখা'র কাজ অল্প বাকি ছিল। প্রডিউসার চলে গেছেন। তখন 'সিজার' নামে একটি পাবলিসিটি শর্ট করে ঐ টাকা দিয়ে ছবিটি শেষ করেন। কিছুদিন পরে জানা যায় ছবিটা রাজশ্রী পিকচার্সে বাঁধা দিয়ে প্রডিউসার টাকা নিয়ে চলে গেছেন। ছবিটি মুক্তিলাভ করে না।

৪.

ড্রিঙ্ক, ড্রিঙ্ক এবং ড্রিঙ্ক। হরিসাধন দাশগুপ্ত '৬৩ সালের প্রথমে আসেন আলাউদ্দিন খাঁ-র ওপর ডকুমেণ্টারি করাবার জন্য। গাড়ী করে মাইহার যাবার পথে সমস্ত রাস্তা ড্রিঙ্ক। গায়ে র‍্যাশ বেরোয়।……সেইবার ছিল আলাউদ্দিন খাঁর শতবর্ষ পূর্তির বছর। মাইহারে সবাই তাঁকে বাবা ডাকে। দিল্লী থেকে অনেকে আসেন বাবাকে সংবর্ধনা জানাবার জন্য। বাবা মাইহার ব্যাণ্ড বাজান। আলী আকবর খাঁ, রবিশংকর, চতুর আলী প্রভৃতি অনেকে এসেছিলেন। রাত্রে সবাই ড্রিঙ্ক করেন। কিন্তু যা রোগ—'কিছু হয়নি আরো চাই' বলায় হরিসাধনবাবু রেগে চলে আসেন। কাজ হবে না মনে হয়। কিন্তু অবশেষে নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ শেষ করেন। বাবার প্রতিটি মুড বুঝে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ভাবের সট নেওয়া হয়।

এর আগে বাহাদুর খাঁর কাছে সরোদ শিখতে আরম্ভ করেছিলেন। ভাত-খণ্ডের রাগরাগিণীর বই গভীরভাবে পড়াশোনা করা ছিল। বাঁশী বাজাবারও শখ ছিল। সঙ্গীত সম্বন্ধে গভীর জ্ঞান থাকায় বাবার জীবন নিয়ে একটি অনবদ্য সৃষ্টি হয়। অপেক্ষা করি কবে বইটি পর্দায় দেখবো। মনে পড়ে অন্নপূর্ণাদিদির কথা। আমাদের সবার অনুরোধে তিনি বীণা বাজান। নিজের ছেলেকে শিক্ষা দেওয়া ছাড়া জনসমক্ষে একেবারেই বাজান না। আসবার আগে বাবা আমাকে বারবার বলেন, 'তোর এবার ছেলে হবে।' মাইহারের স্মৃতি চিরদিন মনে থাকবে।

ফিরে আসার পর হরিসাধনবাবু একটি চিঠি পাঠান, 'আপনার সঙ্গে আমার temperamentএ মিলঁবে না। তাই আর একসঙ্গে কাজ করবো না।' আমরা স্তম্ভিত হই। কিছুদিন পর হরিসাধনবাবু নিজের নামে ছবিটি বের করেন। একটি অনবদ্য সৃষ্টি ও প্রায় সব সট্ ঋত্বিক ঘটকের ব্রেনেই থেকে যায়। কারণ সাউণ্ড ছাড়াই স্যুটিং করতেন। এডিটিং ও ডাবিং-এর সময় সব সঠিক রূপ পেতো।

আর একটি বিরাট সৃষ্টির সুযোগও এই সময় নষ্ট হয়। ছবিটি 'আরণ্যক'। এককালে 'আরণ্যক' পড়তে পডতে প্রায় মুখস্থ হয়ে গিয়েছিল। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে চিঠি লিখতাম। তিনি 'লক্ষ্মীমা।' ও 'আশীর্বাদক তোমার কাকাবাবু' লিখে উত্তর দিতেন।

সেই 'আরণ্যক'-এর সিনোপসিস লেখা হয়। দীর্ঘ সময় লাগবে ছবিটি করতে। কারণ বিভিন্ন ঋতুর সট নেবার জন্য অপেক্ষা করতে হবে। হাজার টাকা জমা দেওয়া হয়। উকীলের টাকাও পাঠানো হয়। মন্ত্রী জগন্নাথ কোলে দাঁড়ান গ্যারাণ্টার, কিন্তু মিনিস্ট্রি বদলে যায়। গ্যারাণ্টারের অভাবে দরখাস্ত মঞ্জুর হয় না।

সালের শেষে আমার ছেলের জন্ম হয়। আমার শরীর ভাল ছিল না। আমার ভাই ছেলের জন্মের আগে আমাকে এসে মাইশোর নিয়ে গিয়েছিল ও পরে বাবার সঙ্গে পাঠিয়েছিল। ভাই ক্ষীরোদ মাইশোর সি. এফ. টি. আর. আই-তে কাজ করে। ও বায়ো-কেমিষ্ট্রিতে রিসার্চ করে ডি. এস. সি. ডিগ্রী পেয়েছে।

ছেলে হবার আগে বারবার একটি কথাই শুনেছি, 'লক্ষ্মী! তোমার

ছেলেই হবে। এবং ছেলে হলেই আমার মাথা ঠিক হয়ে যাবে।' কিন্তু '৬৪ সাল থেকে আরম্ভ হয় অ্যালকোহলিক ইনস্যানিটি। রাত দশটার সময় একদিন মহেন্দ্রকে দিয়ে ভাইকে টেলিগ্রাম করি। ভাই এসে বোঝায় নার্সিং হোমে ভর্তি হওয়াই ভাল। প্রথমে রাজী হলেও, পরে 'কাজ পেলেই আমার মাথা ঠিক হয়ে যাবে' এই এক কথা।

ঐ বছর প্রথমে একটি ভোজপুরী গল্প—ডিস্ট্রিবিউটরের অভাবে এবং পরে নিজের লেখা একটি গল্প 'বগলার বঙ্গদর্শন'ও একটি সেটের স্যুটিং করে ডিস্ট্রি-বিউটরের অভাবে শেষ করা সম্ভব হয়নি। প্রডিউসার ছিলেন রমন মহেশ্বরী। মাঝে মাঝে পুণা গভর্ণমেণ্ট ফিল্ম ইনষ্টিটিউট-এ লেকচার দেবার জন্য ডাকতো।

সালের প্রথমে শুরু হয় চোলাই মদ, স্নানখাওয়া বন্ধ। অস্বাভাবিকতার চূড়ান্ত। একবার করে যাওয়া একবার করে আসা। তিনটি ছেলেমেয়ে ও এই অস্বাভাবিকতার মধ্যে দিশেহারা ও অসুস্থ হয়ে পড়ি।...পুণা ফিল্ম ইনষ্টিটিউট থেকে ভাইস প্রিন্সিপালের চাকরীর খবর আসে। আমি ছেলে-মেয়েদের নিয়ে বাবার কাছে চলে যাই। মনে পড়ে একটি চিঠি ও টেলিগ্রামের কথা। তখনো চাকরী হয়নি। দুটোই পুণা থেকে পেয়েছিলাম। চিঠিটাতে লেখা ছিল: 'আমার valatile character-এর জন্য এইরকম করি।' আর টেলিগ্রামটা ছিল এই:

'It is always darkest before dawn. Mother is blessed when divine son comes. Plus two perfectly lucifer like daughters are there. It is ample compensation. Love—Ritwik.

সাল থেকে আমার জীবন এই ক্ষতিপূরণের দিকেই নিয়ন্ত্রিত হয়েছে। কারণ ঐ অস্বাভাবিকতা আর স্বাভাবিক হয়নি। এ ইতিহাস বড় করুণ, বড় বেদনাদায়ক।

৫.

শিলং আমি ৫।৬ মাস থাকতে বাধ্য হই, কারণ পুণা থেকে প্রায়ই অস্বাভাবিকতম অবস্থায় শিলং আসতেন। ছেলের জন্মের পর থেকেই আমার

শরীর খারাপ চলছিল, এই সময় নার্ভাস শক, মাথা ঘোরানো, প্যালপিটেশন ইত্যাদিতে একটা দুঃস্বপ্ন গেছে। ডাক্তাররা কিছু করতে পারেন নি। শেষে আমার নিজের জ্যেঠামশাই দীর্ঘদিন চিকিৎসা করে আমাকে সুস্থ করে তোলেন। পাঁচ মাস পর পুণার চাকরী ছেড়ে শিলং এসে বাবাকে বলেন, আমাকে নিয়ে যাবেন, হাজার টাকা দিতে। ঐ সময় একটানা ১৭ ঘণ্টা বসে 'পণ্ডিতমশাই' নামক গল্পটি লিখে অজ্ঞান হয়ে পড়েন। হ্যালিউসিনেশন ও ডেলিরিয়ম চলে দুদিন। জ্যাঠামশাই সুস্থ করেন।

কলকাতায় আসার পর স্বাভাবিক হবার কোনো আশা না দেখে ভাইকে চিঠি লিখি। এদিকে শ্বশুরবাড়ীও যাই। ওখানে বলা হয়, 'তুমি চলে যাও, তোমার জন্য কেউ কিছু করবে না।' চলে আসি। ঐ সময় থেকে গত দশ বছর পূর্বের স্নেহভালবাসা একটা স্মৃতি।

ভাই আসে। আবার অজ্ঞান। ডাক্তার বলেন হাসপাতালে ভর্তি করতে। ভাই ভর্তি করায়। হাসপাতালে ড্রিঙ্ক ছাড়া ভালই থাকেন। ঐ সময় কালী ব্যানার্জী এসে বলেন চিকিৎসার খরচ দেবেন। হাসপাতালে দশদিন ছিলেন। বেরিয়ে ভাই চলে যাবার পরই আবার শুরু।

আমার মামামণি লুম্বিনীর সুপারিনটেনডেন্টকে নিয়ে আসেন। ডাক্তার দেখে বলেন ইনফ্যাণ্টাইল এবং ডবল পার্সোনালিটি। চিকিৎসা চলে। হরিসাধন দাশগুপ্ত এসে একটা ডকুমেণ্টারির স্ক্রিপট লেখান। এই সময় থেকে হরিসাধনবাবু ঋত্বিকবাবুর বিশেষ বন্ধু ও শুভানুধ্যায়ী।

অসিত চৌধুরী আসেন। একটি স্ক্রিপট লেখান। উত্তমকুমার 'বনপলাশীর পদাবলী' করাবার জন্য আসেন ও কিছু টাকাও দেন। হেমেন গাঙ্গুলী 'চতুরঙ্গ' এবং তারাচাঁদ বারজাতীয়া অন্য একটি গল্প করাবেন বলেন। কিন্তু কিছুই করেন না। কয়েকটি ডকুমেণ্টারি করবার সুযোগ আসে। তাও না করায় আমি '৬৭ সালে আমার মাসিমার কাছে চলে যাই।

চাকরীর চেষ্টা শুরু করেছিলাম। লাইব্রেরিয়ানশিপ পড়বার জন্য অ্যাডমিশন টেস্ট দিয়ে পাশ করি। কিন্তু ইনটারভিউ কমিটি সিট দেননা। বলেন, 'আপনার চাকরীর কি দরকার ?' কিন্তু চাকরী তো আমাকে করতেই হবে। ছেলেমেয়েদের পড়াশোনা একদিনের জন্যও বন্ধ করিনি।

দু-মাস পর হঠাৎ একদিন সেজদা ও ডলিদিকে নিয়ে হাজির। গিয়ে

শেষ দেখতে। শেষ দেখার কিছু নেই, তবে ডায়সেসান স্কুলের প্রিন্সিপালের সঙ্গে দেখা করায় উনি বলেন মেয়েরা পড়া চালিয়ে যেতে পারবে। সূর্য উঠেছে, সূর্য অস্ত গেছে,—ছেলেমেয়েদের স্কুলে পাঠানো, বাজার-রেশনের ব্যবস্থা করা ও চাকরীর চেষ্টা করা—এছাড়া পৃথিবী সম্বন্ধে কিছু জানতাম না।

একটা ডকুমেণ্টারি করেন 'Scientists of Tomorrow'। আমি দেখিনি। '৬৮ সালে বিহারীলাল কলেজে পি. জি. ডিপ্লোমা-ইন-হোম সায়েন্সে ভর্তি হই। এই সময় 'অভিনয় দর্পণ'-এর সম্পাদক ছিলেন। 'রঙের গোলাম' নামক একটি গল্পের একটি সিকোয়েন্সের সুটিং এর পর আর হয়নি।

'৬৯ সালে ফার্স্ট ক্লাস পেয়ে পাশ করি। এবং ডাক্তারবাবু বলায় মেণ্টাল হসপিটালে ভর্তি করি। জ্যোতি বসুর কাছে দরখাস্ত নিয়ে যাই। চারদিনের মধ্যে হেল্‌থ সার্ভিস থেকে গোবরা মেণ্টাল হসপিটালে সিট হয়। ডাঃ ব্যানার্জীর কথা ভুলবোনা। ইংল্যাণ্ডে দশ বছরের কনসালটেণ্ট সাইকিয়াট্রিস্ট ছিলেন। আমার মাথায় যন্ত্রণার জন্য আমাকেও আউটডোর পেশেণ্ট করে ওষুধ দিতেন। হেমাঙ্গদা ও বৌদি এই সময় রোজ খাবার পাঠাতেন। ভাল হবার পর হাসপাতালে বসে 'সেই মেয়ে' নাটক লেখেন ও 'কুমারসম্ভব'-এর অষ্টম সর্গ অনুবাদ করেন। 'সেই মেয়ে' নাটকটি হাসপাতালে অভিনয় করান, নিজেও অভিনয় করেন।

'কুমারসম্ভব'-এর অষ্টম সর্গ পরে রাজকুমার মৈত্রকে দিয়েছিলেন। '৭০ সালের প্রথমে 'পদ্মশ্রী' পাবার খবর আসে। ডাক্তারবাবু রাইটার্স বিল্ডিং-এ গিয়ে জ্যোতি ভট্টাচার্যের সঙ্গে কথা বলেন ডকুমেণ্টারি করে পেশ করলেই ৪০ হাজার টাকা মঞ্জুর করবেন। দীর্ঘ সাতমাস হাসপাতালে থাকায় সময়ে বাবা ও ভাই টাকা পাঠিয়েছেন। অসিত চৌধুরীও এসেছিলেন।

প্রডিউসার হিসেবে সুশীল করণ আসেন। হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে 'পুরুলিয়ার ছৌনৃত্য' করার পর টাকা মঞ্জুর হয়। সুশীল করণ আমাকে কিছু টাকা দেন। এরপর 'আমার লেনিন' করেন। ছবিটি আমি দেখিনি। আবার ড্রিঙ্ক শুরু। ছবিটা রিলিজ হয়নি। সুশীল করণ কোন টাকাও দেননি।

৬.

আমি সাঁইথিয়ায় একটা গার্লস হাই স্কুলে স্থায়ী চাকরি পেয়ে প্রথমে ছেলেকে নিয়ে এসে কাজে যোগদান করি। বাবা এসে দুই মেয়ে ও জামাইকে দেখাশোনা করেছিলেন। বাবা না আসা পর্যন্ত বাড়ীওয়ালা মাসীমা ও বাপের বাড়ীর আত্মীয়স্বজনরা দেখাশোনা করেছেন। '৭১ সালের ১লা জানুয়ারী দুই মেয়েকেও এসে নিয়ে যাই। আমার বারো বছরের সংসার তুলে ও জীবনের একটি অধ্যায়ে যবনিকা ফেলে আমি চলে আসি। সেদিন ছিল উৎসবমুখর কলকাতা। মনে পড়ছিল মা রোজ 'গীতাঞ্জলি' পড়ে শোনাতেন—

পুরানো আবাস ছেড়ে যাই যবে
মনে ভেবে মরি কী জানি কী হবে,
নূতনের মাঝে তুমি পুরাতন
সেকথা যে ভুলে যাই—
দূরকে করিলে নিকট বন্ধু
পরকে করিলে ভাই।

বাড়ীওয়ালা রায়বাহাদুর রমেশ চন্দ্র দে, মাসীমা ও পরিবারের সকলের কথা চিরদিন মনে থাকবে। মাসীমা বলেছিলেন, 'আমার ঘরের লক্ষ্মী চলে যাচ্ছে। আমার দুঃসময়ে বহরমপুর থেকে বড়দি সর্বদাই আমার খোঁজখবর করেছেন। মহাশ্বেতাও আমার বাসায় সর্বদা আসতো।

মুক্তিযুদ্ধ শুরু হবার পরে বোম্বেতে বিশ্বজিতের সঙ্গে যোগাযোগ করে 'দুর্বার গতি পদ্মা' করেন। আমি দেখিনি।

এরপরে 'যুক্তি তক্কো গপ্পো'র স্ক্রিপট শোনাতে আসেন। আমি চাকরীতে যোগদান করার পর 'Communal Harmony' নামে একটি ডকুমেন্টারি করিয়েছিলেন। দীপঙ্কর বড়ুয়া ও রণেন চৌধুরী। রিলিজ হয়নি। ছবিটি আমি দেখিনি। 'যুক্তি তক্কো গপ্পো'র প্রডিউসার হিসেবে আমার নাম রাখেন। পার্টনার দীপঙ্কর বড়ুয়া।

ইতিমধ্যে বরুণ বক্সী নিজের বাড়ীতে কিছুদিন রেখে সুস্থ করলে বাংলা-দেশে কাজের যোগাযোগটি হয়।

'তিতাস একটি নদীর নাম' আরম্ভ হয়।

দুটি ছবি একসঙ্গে আরম্ভ করায় প্রচণ্ড খাটনী পড়ে। '৭২ সালের শেষে 'যুক্তি তক্কো গপ্পো' গলায় টিউমার নিয়ে স্যুটিং, অভিনয় ইত্যাদি করেন। স্যুটিং-এর ব্যবস্থা ও অনেক সময় অনেক কিছু নিজের করতো হতো।

বোম্বে থেকে এফ. এফ. সি. টাকা পাঠালে দীপঙ্কর বড়ুয়া প্রথমে আমার সই, ও পরে নিজে সই করে সমস্ত টাকা ঘরে তুলতেন। একটি পয়সা আমাকে স্পর্শ করতে দেননি। ওদের ঋত্বিকদাকে কোনদিন গলার টিউমারের জন্য এক গ্লাস দুধ, বা একটি বিছানা বা কোন কিছুর ব্যবস্থা করতে দেখিনি। অনেক সময় ল্যাবরেটারীতে ক্যান মাথায় দিয়ে শুয়ে থাকতেন। ছুটির সময় কলকাতায় এলে আমি মহেন্দ্রর বাসায় থাকতাম ও যতোটুকু সম্ভব দেখাশোনা করতাম। মহেন্দ্রও করতো। ছুটি শেষ হলে চলে আসি। এরপরেই বাংলাদেশে গিয়ে অজ্ঞান। হাসপাতাল থেকে চিঠি পাই। কয়দিন পরেই লাঠি হাতে সাঁইথিয়া। অসুস্থতার জন্য লাঠি নিয়ে হাঁটতেন।

'৭৩ সালের মার্চের প্রথমে আবার সাঁইথিয়া আসেন ১০৩° ডিগ্রী জ্বর নিয়ে। ঔষধপথ্যের ব্যবস্থা করি। প্রডিউসারকে টেলিগ্রাম করবো ভাবি। কিন্তু ভীষণ আপত্তি—'না গেলে ভাববে ঋত্বিক ঘটক কাজ শেষ করে না।'

যাবার পর কোন খবর নেই। চিঠি লিখি, টেলিগ্রাম করি। এপ্রিলের শেষে রাত দুটোর সময় মৃণাল সেনের ট্রাংককল আসে: 'ঢাকা থেকে খবর এসেছে খুবই খারাপ অবস্থা। ভোরের ট্রেনেই যেন ছেলেকে নিয়ে যাই।'

ছেলেকে ও মহেন্দ্রকে নিয়ে ঢাকা যাই। মৃণাল সেন আগেই চলে গিয়েছিলেন। প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী ও মুখ্যমন্ত্রী সিদ্ধার্থশঙ্কর রায় ঢাকা থেকে কলকাতায় হেলিকপটারে করে দুজন ডাক্তার সহ আনবার ব্যবস্থা করেন। ১লা মে মেডিকেল কলেজে ভর্তি করা হয়।

বাংলাদেশের প্রডিউসার লিখিয়ে নিয়েছিলেন 'তিতাস একটি নদীর নাম' এডিটিং নিজেরা শেষ করে ছবিটি রিলিজ করবেন। ১০৩° থেকে ১০৫° ডিগ্রী জ্বর নিয়ে স্যুটিং শেষ করেছিলেন, এডিটিং তখনো শেষ করতে পারেননি। প্রডিউসার হাবিবুর রহমান প্রাপ্য টাকাও সব দেননি।

মেডিকেল কলেজে কেবিন ছিল না। নার্স, অ্যাটেনডেণ্ট রাখতে হয়েছিল, খাবারের ব্যবস্থাও আমাকে করতে হতো। তাই পরে আমি ও মহেন্দ্র টি. আর. এ. চেস্ট হসপিটালে ভর্তি করি।

দীপঙ্কর বড়ুয়া, হাবিবুর রহমান ও সুশীল করণ ('আমার লেনিন' তখন মস্কোতে বিক্রী হয়েছে) কোনো টাকা না দেওয়ায় আমি তখন দিশেহারা হয়ে পড়ি। আমার হাজার টাকা শেষ হবার পর, উত্তমকুমার 'শিল্পী সংসদ' থেকে হাজার টাকা পাঠিয়েছিলেন। সিদ্ধার্থশঙ্কর রায়কে চিঠি লিখি। চারমাস পর হাসপাতালে দুই হাজার টাকা পাঠান।

হাসপাতালে চিকিৎসা ও যত্নে ভয়াবহ অসুস্থতা কমে ক্রমশই সুস্থ হয়ে ওঠেন। আমার ভুলুমাসী (ডাঃ অরুণা ব্যানার্জী) খুবই দেখাশোনা করতেন! তাছাড়া সেক্রেটারী, আর. এম. ও. প্রভৃতি তো ছিলেনই।

ডিসেম্বরের শেষে হঠাৎ হাসপাতালে সাত দিনের জন্য রিস্ক বণ্ড সই করে সিরাজ ও ভোলাবাবুর সঙ্গে বোম্বে যান। বোম্বের কাজ শেষ হলে পুণা গিয়ে অবিরাম ড্রিঙ্ক করে আবার অজ্ঞান! ওখান থেকে মৃণাল সেনের কাছে ট্রাঙ্ককল আসে আমাকে ও মহেন্দ্রকে যাবার জন্য। এরপরই টেলিগ্রাম—একটু ভাল।

সালের জানুয়ারী মাসে পুণা থেকে লাঠি হাতে সাঁইথিয়া। হাসপাতালে আর পাঠানো সম্ভব হয় নি। মহেন্দ্র এরপর ওর কাছে রেখে সুস্থ করে ও 'যুক্তি-তক্কো-গপ্পো'র সুটিং ও কাজ শেষ হয়। দীপঙ্কর বড়ুয়াকে এফ. এফ. সি. ২৮ হাজার টাকা দেওয়ায় পার্টনারশিপ ডিসল্‌ভ্‌ হয়।

আমি ফেব্রুয়ারী মাসে পুড়ে গিয়ে তিনমাস শয্যাশায়ী ছিলাম। আমাকে টাকা পাঠান ও পরে দেখতে আসেন। ছেলেটিকে নিয়ে গিয়ে শান্তি-নিকেতনে ভর্তি করেন। বড়ো মেয়েকেও হায়ার সেকেণ্ডারি পাশ করার পর কলকাতায় নিয়ে গিয়ে কলেজে ভর্তি করেন। দিল্লী, বোম্বেও নিয়ে গিয়েছিলেন। ঐ সময়ই ছেলে, মেয়ে ও মহেন্দ্রকে নিয়ে ঢাকা যান ও 'তিতাস একটি নদীর নাম'-এর এডিটিং করে আসেন। ছবিটি হাসপাতালে থাকার সময়ে ঢাকায় রিলিজ হয়েছিল। পরে ছবিটি ওদেশে প্রথম পুরস্কারও পেয়েছে।

৭

এর পরের ইতিহাস বড়ো বেদনাদায়ক। 'তিতাস একটি নদীর নাম' এদিকে আসেনি। 'যুক্তি তক্কো গপ্পো' এখনো পর্যন্ত রিলিজ হয়নি।

চেষ্টার ত্রুটি করা হয়নি।   সালের মার্চে আমি, সিরাজ ও মহেন্দ্র ওঁকে নিয়ে বোম্বে যাই। চারজনের নামে ডিষ্ট্রিবিউশন সই হয়।

বোম্বে থাকাকালীন CUNIC (Co-operative Union of New Indian Cinema)-এর মিটিং ডেকেছিলেন। এই সংগঠনটির চেয়ারম্যান ছিলেন নিজে। নতুন নতুন ডিরেক্টররা যাতে ছবি করবার সুযোগ পান, সেইজন্যই সৃষ্টি হয়েছিল এই সংস্থা।

'যুক্তি তক্কো গপ্পো'র ডিষ্টিবিউশনের জন্য এক মাসের মধ্যে ৭০ হাজার টাকা জমা দেওয়া সম্ভব হয়নি। আমরা এফ. এফ. সি.-কে জানিয়েছি ছবি নিজেরা রিলিজ করতে, কিন্তু কিছু হয়নি। 'সেই বিষ্ণুপ্রিয়া'র সিনোপসিস লিখে এফ. এফ. সি-কে পেশ করেছিলেন।

এর পরে চিলেড্রেন্স ফিল্ম সোসাইটি থেকে করাবার জন্য লেখেন ঠাকুমার ঝুলির 'Princess Kalavati' নামে 'বুদ্ধুভূতুম' গল্পটির সিনোপসিস।

'সেই বিষ্ণুপ্রিয়া' নাটক আকারে লেখেন 'জ্বলন্ত' নাম দিয়ে। 'ষ্টার'-এ করবার জন্য রিহার্সাল চলছিল। রঞ্জিতমল কাঙ্করিয়া বলেওছিলেন করাবেন। কিন্তু করেননি। এরপরে জরুরি অবস্থা ঘোষিত হয়। পরে 'একাডেমী অব ফাইন আর্টস'-এ একটি শো হয়েছিল। আমার বড়ো মেয়ে বিষ্ণুপ্রিয়ার ভূমিকায় অভিনয় করেছিল।

'রামকিঙ্কর বেজে'র ওপর একটি রঙীন ডকুমেণ্টারি করবার জন্য শান্তিনিকেতনে যান। শরীরটা ভাল ছিল না। থাকাখাওয়ারও ভাল বন্দোবস্ত ছিল না। ডকুমেণ্টারিটার স্যুটিং শেষ করার পর আবার সেপ্টেম্বর মাসে টেলিগ্রাম আসে : Ritwik Ghatak admitted in the Hospital. পি. জি. হাসপাতালে ছিলেন। জণ্ডিস হয়েছিল। পরে প্রচণ্ড কাশি ও জ্বর।

ডিসেম্বর মাসে হাসপাতাল থেকে বেরোবার পর (বড়দিনের ছুটিতে) কলকাতায় কাজকর্ম সম্বন্ধে অনেক কথাবার্তা হয়। এফ. এফ. সি-কে 'যুক্তি তক্কো গপ্পো' রিলিজ করবার জন্য আবার চিঠি লেখা হয়।

'মেঘে ঢাকা তারা' ও 'কোমল গান্ধার' ছবি দুটি পনেরো বছর পর স্বত্ব ফিরে পাবার সময়   সালের জানুয়ারী মাসেই আমার নামে লিখে দিয়েছিলেন। কিন্তু চ্যাটার্জী ও রায়চৌধুরী নামে দুজন ভদ্রলোক অনেক কিছু সই করিয়ে নিয়েছিলেন। ছবি দুটো এখনো রিসেন্সর করিয়ে

রিলিজের ব্যবস্থা করতে পারিনি। কবে পারবো জানি না। কারণ সেন্সর অফিস থেকে চিঠি এসেছে কোর্টে গিয়ে ফয়সালা করতে। উকীল ঠিক করেছি।

এর ১১ই জানুয়ারী ছেলে ও আমাদের সঙ্গে দেখা করবার জন্য সাঁইথিয়া যান। অনেকক্ষণ ছেলের গান শুনে বলেন—'লক্ষ্মী! তোমার ছেলে আমাকে ছাড়িয়ে যাবে। আরো কথাবার্তা হয়। আর বারবার একটা কথা—'যুক্তি তক্কো গপ্পো' ও 'মেঘে ঢাকা তারা' এবং 'কোমল গান্ধার' থেকে যা টাকা পয়সা আসবে সব তোমার, ছেলেমেয়ের জন্য খরচ করো। অত্যধিক ড্রিঙ্ক ও বারবার অসুস্থতার জন্য অনেক সময় রাগারাগি হলেও আমরা সবসময়ই ছিলাম বন্ধুর মতো ও তিনটি ছেলেমেয়ের মা-বাবা।

৬ই ফেব্রুয়ারী আবার ট্রাংকল: Ritwik Ghatak in serious condition. সারারাত ভেবেছি এই খবরটি আমাকে আর কতবার শুনতে হবে। পরদিন মৃণাল সেন খবর পাঠিয়েছেন: Ritwik Ghatak expired. খবরটি এতো আকস্মিক! স্তব্ধ হয়ে গেছি। কিন্তু একটা কঠিন প্রতিজ্ঞা তখনই নিয়েছি—জীবনের শেষ কর্তব্য আমাকে শান্তভাবে করতেই হবে।...

ধীর ও স্থিরভাবে সমস্ত করেছি।...ঋত্বিক ঘটক আমার জীবনে একটা সত্য, সত্য যে কঠিন, কঠিনেরে ভালবাসিলাম, এ কখনো করে না বঞ্চনা। এ আমার জীবনের মন্ত্র।

তাই জীবনের ২১টি বছর একটি চিন্তা ও ধ্যানে কেটে গেছে।...আজ আছে শুধু স্মৃতি, আর আমার জীবনের অ্যাম্পল কম্পেনসেশন তিনটি ছেলেমেয়ে!

জীবনটা 'জীবিতের, যারা বেঁচে আছে তাদের জন্য'—'সাঁকো' নাটকের কথা। এই কঠিন ও গুরু দায়িত্ব আমাকে করে যেতেই হবে। বারো বছর আগে আমার এক দুঃখের দিনে জন্ম হয়েছিল যে নবজাতকের—সেই পুত্রটিকে আমার মানুষ করবার কতোটুকু ক্ষমতা আছে জানি না, আমার একমাত্র প্রার্থনা ছেলেটি যেন তার বাবার চিন্তাধারাকে বহন করে নিয়ে যেতে পারে।

'জ্বালা' থেকে 'জলন্ত', 'নাগরিক' থেকে 'যুক্তি তক্কো গপ্পো' একই চিন্তাধারায় সৃষ্টি। চরম অসুস্থতার মধ্যেও সেই চিন্তাধারা ও সৃষ্টির ব্রেন ও দার্শনিক গভীরতার একটুও নষ্ট হয় নি। পি. জি. হাসপাতালেও গত

পুজোর সময় লিখে গেছেন একটি স্ক্রিপট—'লজ্জা'। 'জ্বলন্ত' নাটকের সমস্ত গান ও সুরও নিজের দেওয়া। 'আকাশ এত নীল কেন? পৃথিবী এত সুন্দর কেন?' 'কোথাও একটা ভাল দেশ আছে, সেখানে মানুষ মানুষকে ভালবাসে। সে দেশ কোথায় জানিনা, কিন্তু তার কথা আগে মনে আসে।' ইত্যাদি।

আমার জীবনের সার্থকতা এইখানেই।

মৃত্যুর পরেও মানুষ বেঁচে থাকে সৃষ্টি ও মানুষকে প্রচণ্ড ভালবাসার মধ্যে, এই সৃষ্টি ও ভালবাসার মধ্যেই 'ঋত্বিক ঘটক' নামটি অমর হযে থাকবে।

পরিশিষ্ট
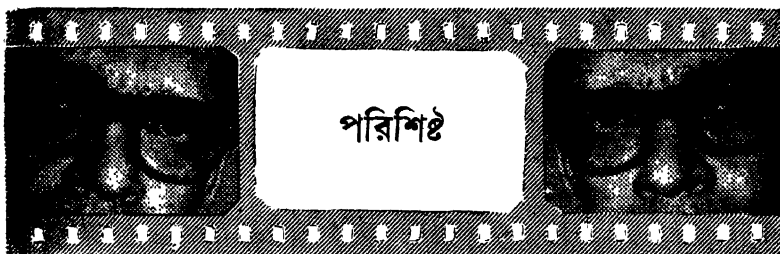
বিভিন্ন অস্ত্র : (৩) সম্পাদনা *

গ্রীফিথের close up ব্যবহার। কুলেশভের পরীক্ষা-নিরীক্ষা, পুডোভকিনের ইঁটের পর ইঁটের থাকে যেমন বাড়ী গড়ে ওঠে, তেমনই ছবিও তৈরী হয়না, গড়া হয়—এই তত্ত্ব, বা আইসেনষ্টীনের দ্বন্দ্ববাদমূলক তত্ত্ব,—এসব আজ সুপ্রাচীন হয়ে গেছে, কিন্তু দৃঢ়ভিত্তি আজও এগুলোই ছবির সম্পাদনার ব্যাপার।

আর, আসলে, ছবিকরাটা সম্পাদনাই। বাকী সব কাঁচামাল, নক্সা, খসড়া। ঠিকঠাক করে, ছোট বা বড় করে সাজিগুজি করে ছবি দাঁড় করিয়ে তোলে এই সম্পাদনা। এর আগের প্রত্যেকটি ধাপ সম্পাদনার শেষ পরিণতির কথা ভেবে তৈরী করা হয়ে থাকে।

সম্পাদনাই সম্রাট।

এই বিশাল বিষয় নিয়ে ক্ষুদ্র নিবন্ধে আর কী বলব? সামান্য কিছু আভাস দিতে পারি।

সম্পাদনা শুরু হয় চিত্রনাট্য লেখার সময় থেকে। যখন চিত্রনাট্যের খসড়া তৈরী হতে থাকে, তখনই সম্পাদনায় কী চেহারা আসবে, তার দিক-নির্দেশ গ্রথিত হতে থাকে।

ছবি তোলার সময়ও তাই। একটি বিশেষ সম্পাদনার পদ্ধতির কথা মনে করেই লোকে স্যুটিং করে থাকে। সেখানে অভিনয়, পরিচালনা, চিত্রগ্রহণ, শব্দগ্রহণ, গানের ব্যবহার,—সবকিছুই এই সর্বব্যাপ্ত পরিকল্পনার অনুপন্থী।

তারপর আসে কাটার কথা। চিত্রনাট্য যায় বহুলাংশে বদলে, অভিনয় প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে, প্রতিটি জিনিষ খাপে খাপে মিলে যায়,—এমন অনেক কিছুই জন্মগ্রহণ করে সম্পাদকের টেবিলে, যা অচিন্ত্য ছিল আগে।

কিন্তু এইখানেই শেষ নয়। এর পরে আসে শব্দের ব্যবহার, বিভিন্ন শব্দের সংমিশ্রণ। এই শব্দের নানা প্রকার ব্যবহার (যার কিছু আমি নীচে উল্লেখ করব) এবং তাদের একত্রীভূত করে ফেলার পরমুহূর্তেই ছবিটি জীবন্ত হয়ে লাফিয়ে ওঠে।

যেটা ছিল খালি শিল্পীর মনের মধ্যেকার খানিকটা স্পষ্ট, খানিকটা ধোঁয়াটে, খানেক ইচ্ছে, খানিক স্বপ্ন—সেটা এখন বাস্তবে জলজ্যান্ত একটি ধরা-ছোঁয়ার মধ্যে এসে পড়া একটি সামগ্রী। হয়তো প্রথম চিন্তা নানাভাবে বদল হয়েছে ছবি-করার বাঁকে বাঁকে, আর সম্পাদকের টেবিলে নানারকম নতুন উদ্ভাবনী চিন্তার জন্ম দিয়েছে—কিন্তু মোটামুটি স্বপ্নটাকে বাস্তবে টেনে এনে লাগিয়েছে।

তাই, সম্পাদনাই হচ্ছে ছবি-করা।

এই যে চিত্রনাট্যের সময়ে ছক তৈরী করে নেওয়া, এর কিন্তু ব্যক্তিবিশেষে কর্মপ্রণালীরও বদল হয়। কিছু কিছু ছবি-করিয়ে আছেন, যাঁরা আগে থেকে মাপজোক করে একেবারে ঠিক কটি সট্ কতক্ষণ থাকবে, তারও হিসেব কষে ফেলেন। শুধু তাই নয়, প্রতিটি সটের চেহারা কী হবে, তার আঁক-টুকুও পর্যন্ত কষা হয়ে যায় এঁদের মনে।

এ পদ্ধতিতে বহু মহত্তম শিল্পী কাজ করেছেন এবং সফল হয়েছেন। এঁরা প্রাথমিক স্বপ্নকে পরিপূর্ণ আঁকড়ে ধরে রাখতে চান, এবং বিভিন্ন ঘটনা-দুর্ঘটনার মধ্যে দিয়ে যেটুকু বদল না করলেই নয়, তাই করে ছবি বানিয়ে চলেন।

আর এক ধরণের ছবি-করিয়ে আছেন, যাঁরা মোটামুটি গল্পের ছক, তার দার্শনিক ভিত্তি, এবং মূল রসকে পাথেয় করে পাড়ী জমান। ছবিকরার বাঁকে বাঁকে তাঁদের নব-নব উদ্ভাবনী প্রতিভা নতুন সব আনন্দের সন্ধান দেয়। খোলা মনে (যতটুকু আর্থিক এবং শিল্পীর নিজস্ব মানসিক পরিস্থিতিতে করা সম্ভব) ছবি করতে নেমে ফিরে আসেন সেই মূল সুরটিতে, কিন্তু মীড়গমক-মূর্ছনায় নানা অলঙ্কারে অলঙ্কৃত করেন। Flaherty সায়েব এমনই একজন কর্মী ছিলেন।

এখন কথা হচ্ছে এই প্রধান দুই চিন্তাশীল পদ্ধতিতে ছবি করার ভাল এবং খারাপ কী কী, এবং সম্পাদনা এ দুটিকে কিভাবে ঠেলে নিয়ে চলে, সেটা ওজন করে দেখা উচিত।

যাঁদের কাছে ছবিটা একটুও না তুলে অত্যন্ত স্পষ্ট (এখানে আপেক্ষিক ভাবে বলা হচ্ছে, কারণ অঘটন ঘটনার অবকাশ সর্বত্রই থেকে যায়) হয়ে প্রতিভাত, তাঁদের সম্পাদনার নব্বই ভাগ চিত্রনাট্যতেই করা হয়ে গেছে, খালি কাঁচামালগুলোকে ঘরে তোলার ওয়াস্তা। এতে করে প্রায় নিখুঁত ভাবে ছবি তোলার কর্মসূচী, খরচের এবং সময়ের হিসেবের মধ্যে ব্যয়, মানসপুত্রকে জন্ম দেবার পরম পরিতৃপ্তি—এসবই মেলে।

মেলে না আবার অনেক কিছু। ছবিটা ভীষণভাবেই একটা গতিশীল ব্যাপার। এই যে চলমান জগৎ, যেখানে প্রতিমুহূর্তে নতুন কিছু জন্মাচ্ছে এবং মারা যাচ্ছে, প্রতিপদে এমন সব ঘটনা বা দৃশ্যপরম্পরারা এসে মিলিয়ে যাচ্ছে যারা এর আগেও কখনও আসেনি, এবং এমনটি করেই আবারো আসবে না, কিছুতেই না। এই যে বহত জীবনধারা, এই যে সতত সঞ্চরমান সংসার-স্রোত, বাড়ীতে বাস করে এর রূপরসগন্ধ প্রায় কিছুই নিজের কল্পনায় বা চিত্রনাট্যে আঁটিয়ে তোলা যায় না। কাজেই ঘরে বসে ভাবা জিনিষের খাতিরে বাইরের উচ্ছল জীবন কলুর ঠুলি পরা বলদের মত দুমড়িয়ে মুচড়িয়ে এনে দাঁড় করাতে হয়। অর্থাৎ, ইংরেজীতে যাকে বলে,—বাস্তবকে shirt jacket পরিয়ে হাজির করতে হয়। স্বতঃস্ফূর্ততার অভাব এসব ক্ষেত্রে প্রকট হওয়াই স্বাভাবিক,—এবং সর্বোত্তম শিল্পী তাঁর সর্বগভীর প্রেরণার মুহূর্ত-গুলোতেই মাত্র মহৎ শিল্পের পর্যায়ে পৌঁছে যান এই দৃষ্টিভঙ্গীর ওপর ভর করে। বাকী মাঝামাঝির দল কোনদিনই প্রাণের আনন্দে ভরপুর হতে পারে না।

এবার অন্য ধরণের ছবি-করিয়েদের সম্বন্ধে বলব। এঁরা একেবারে বিপরীত। এঁরা ছবির চিত্রনাট্যকে একটি Guide to Action হিসেবে গ্রহণ করেন এবং তার সট্ভাগকরা, সম্পাদনার ঢংকে বদলানো, এমনকি নতুন নতুন যোজনা করা পর্যন্ত সব কিছুই করার জন্যে মনকে খোলা রেখে এগোন। হয়তো একটি Location-এ গিয়ে একটি মেঘখণ্ডকে বিচিত্র আকার ধারণ করাত দেখলেন, সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত ছবিতোলা ও সম্পাদনার pattern বদলে গেল ঐ মেঘটিকে কেন্দ্র করে। কোথাও কোন গাছের গুঁড়ী অদ্ভুত ব্যাঁকানো ঢং-এ খাড়া, ব্যস,—শুরু হয়ে গেল তার মধ্যে তাঁর নিজস্বচিত্রের বক্তব্যের দ্যোতনার আরোপ।

আমার 'সুবর্ণরেখা'-তে যে ভাঙ্গা এরোড্রোমটি এক প্রধান স্থান অধিকার

করে আছে, যার উপস্থিতির ফলে সমস্ত ছবিটির গল্প, চিত্রনাট্য, সম্পাদনা একেবারে ভোল পালটেছে, সেটা যে সেই locationএ আছে, সে খবর পর্যন্ত আমার জানা ছিল না। হঠাৎ মাঠেঘাটে ঘুরতে গিয়ে আবিষ্কার করলাম। সঙ্গে সঙ্গে সেটি আমার মাথায় নতুন নক্সা বুনতে আরম্ভ করল ছবি তোলার সঙ্গে সঙ্গে। ওটি ওতঃপ্রোত হয়ে জড়িয়ে গেল 'সুবর্ণরেখা'-য়, ওকে ছাড়া ছবিটিকে ভাবা যায়না। 'বহুরূপী'র ব্যাপারটাও তাই। তাৎক্ষণিক। কিন্তু পেছনে আমার মূল বক্তব্যকে সহায়তা করেছে বলেই এদের আঁকড়ে ধরেছিলাম। এমন আমার এবং আরো অনেকের বহু ছবিতেই হয়েছে।

এর মারাত্মক কতকগুলো খারাপ দিক আছে। প্রথমতঃ লোভ। লোভ সংবরণ করতে না পারলে বল্গাছেঁড়া কল্পনা এক জগাখিচুড়ীর সৃষ্টি করবে। এজন্য আত্মশাসনের কড়া নিগড়ে মনকে বাঁধতে হবে। যাই দেখব ভাল, তাই তুলে এনে সাজাব, —এ মনোভাব সর্বনাশের সৃষ্টি করে। সংযমের বিন্দুমাত্র অভাব হলেই এ পদ্ধতি সর্বনাশ ডেকে আনে। প্রবহমান জীবনস্রোতধারা যেমন পবিত্রতম একটা ব্যাপার, তেমনি সমস্ত ধারাটা যেন নিজের এবং সকলের অভিমুখিন হয়, এটাও পাহারা দিতে হবে। এটা পারেনি বলেই অনেক সম্ভাবনাপূর্ণ ছবি হারিয়ে গেছে,—আমারো গেছে।

দ্বিতীয় সমস্যা,—টাকা। এই পদ্ধতিতে উদ্দাম হয়ে গেলে সময়ের হিসেব থাকে না, জিনিষপত্র খরচের দিক থেকে মন দূরে সরে যায়, ফলে টাকা খরচ অকারণ বেড়ে চলে। লাখ-লাখ ফুট ছবি তুলে তার থেকে দশ হাজার ফুটের ছবিতে দাঁড় করানোর সময় সম্পাদনাগৃহে বসে মনে হয়, ছেড়ে দে মা কেঁদে বাঁচি। এ রকম উচ্ছৃঙ্খলতা ব্যবসাদারদেরকেও নারাজ করে তোলে।

কাজেই 'আর্ট করছি' বলে এই বেআইনী অপচয়, এর কোন যুক্তি নেই। ক্ষমাও নেই। কথাগুলো আমরা নিজেরাই অনেক সময় ভুলে যাই।

কিন্তু মহৎ শিল্পীর হাতে পড়ে এই পদ্ধতিও অতি স্বর্গীয় সুখের সন্ধান দিয়েছে। এ পদ্ধতির সচেতন শিল্পীরা তাই অনেক হিসেবী, অনেক সতর্ক। দুপাশ দিয়ে বয়ে চলেছে মানুষের সুখ-দুঃখ-হাসি-কান্না। তার মধ্যে দিয়ে পথ কেটে কেটে, তাদেরই একজন হয়ে চলেছে আমার কাহিনী, ঐ পরিপ্রেক্ষিতে উপস্থাপিত না হয়ে, ঐ গোটা নক্সাটার অংশ হয়েই চলছে

আমার ছবি,—এ যদি সত্যি সফলভাবে আনা যায়, তবে অতি অপরূপ মানসিক তৃপ্তির কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

আগের কথাগুলোর মানে এই নয় যে, এই দুই বিভিন্ন পদ্ধতি (আবার বলেছি, আপেক্ষিকভাবে, কারণ দুটো ধারাই একেবারে খাঁটি বিপরীত নয়, দুজনেরই একে অপরের পদ্ধতি কিছু না কিছু অবলম্বন করতে হয়, মাত্রার তফাৎ মাত্র), এদের মধ্যে কেউ ভালো, কেউ খারাপ। বলতে চাচ্ছি, ব্যক্তিভেদে রুচিভেদে মানসিক গঠনভেদ—ফলে পদ্ধতির ভেদ এবং দুই পদ্ধতি থেকেই অপূর্ব সব চিত্রশিল্প জগতের লোককে সান্ত্বনা দিয়েছে, প্রগাঢ় শান্তি দিয়েছে, তৃপ্তি দিয়েছে।

Manipulation of filmic time and space, tempo, juxtaposition, permutation and combination of shots and sounds, overlapping, এবং এদেশে কমার্সিয়াল ছবি-করিয়ে যাকে বলে Montage—এসব সম্বন্ধে অনেক কিছুই বলার ছিল, স্বল্প পরিসরে কথাগুলো আর তুললাম না।

কারণ, তাহলে তো একটা গোটা বই-ই লিখতে হয়। আশা রইল।

* মূল পাণ্ডুলিপিতে লেখা আছে : Sound is অস্ত্র (৩)। এ থেকে অনুমান করা যায়, এটি এই সিরিজের তৃতীয় অংশ। কিন্তু আগের দুটি অংশের এখনও সন্ধান পাওয়া যায় নি।

DRAFT LINE-UP FOR A PROPOSED DOCUMENTARY SERIES ON URAONS OF CHHOTANAGPUR

(points that can be incorporated in commentary and images)

1. Probably, Uraons are the only tribes still remaining in Middle India who have retained their power to express their mental life and its ecstasy through the primal medium of dancing. Thousands of years of oppression, involving waves of migration again and again, swindling and torture by the more cultured brethren of the land and of other lands, dire poverty, lack of health and that easy way of living, nothing could wipe out compeletely that trace of irrepressible joy which bursts forth in rhythm. They have been told again and again, and that flow of advice is by no means abated even to-day, that it is just not proper to break into dancing at the slightest excuse. It is a thing which is not cultured. It is aboriginal. It reminds one of one's own sins in another narrow and criminal society.

All these are successful to a large extent. The Uraons today are not what they were even twenty-five years ago. And, after a decade, they will not be what they are today. This is the most sad fact concerning the tribals at the present moment. But more of it later.

2. Uraons are essentially an agricultural people. True, they still retain customs and memory of a past in which hunting

was vigourously persued. Among Indian tribes, they only know how to make and use that highly developed weapon, boomerang (which they call *Dabsu Lebdu*). But hunting is a subsidiary occupation to their agrarian economy. And history furnished proof that this peace-loving and extremely friendly people won the land wherever they went, not by prowess but by plough. When they came down to the jungles of Chhotanagpur after being driven out of Rohtas Fort (they call it *Ruidasgarh*) in more recent historical times, their present habitat was already occupied mainly by the great tribe of Mundas. Uraons became the dominant people, not by giving battle, but by being friendly to others and clearing the jungle and by making the earth bountious with their better implements of agriculture. Abundant evidence of this harmony with nature and man around him is found in the folk-tales, songs and places of historic interest lying around villages both of Uraons and Mundas.

And hence, key to the Uraon culture is to be found in his vocation of life, agriculture.

3. This does not mean that they donot have a martial heritage. They have. This peaceful people have found it impossible to go on tolerating the oppression throughout their history. In the past 300 years, they have risen in revolt again and again,—first against the Moguls and then against the British rulers. These civilised overlords have always sent their jagirdars, money-lenders and unscrupulous traders into their territory. And the Army was always just a step behind them. Uraons came to virgin soil (being driven away), fell the trees, cleared the dense, tropical forests, furrowed and fertilised the earth and received yields. Then followed the landlords and claimed taxes. The uncivilised ones withstood so long as they could—then moved onto

further regions only to be persued by the ravens. This cycle of torture went on endlessly. But times come when men's blood set on fire. The yoke at such moments becomes unbearable. At such glorious times Uraons rose in one grand gesture to resist. They were mowed down invariably superior killing machines. This process has gone on for a long time, probably from the time of the Vedas. The last rising was under Birsa Bhagwan (Munda).

4. The impact of propagation of religious missionaries,—not only western but indegenous as well come into our perview as far as fragments of alien culture is found among Uraons. Their all art is at a mixed stage now. But, like sun's rays breaking through clouds,—we can perceive a healthy, ever-young, primeval pattern of culture which takes us back thousands and thousands of years into the dim twilight region of pre-history.

The study of their past from the standpoint of scientific historiography within the framework of Indian history as a whole has not been taken up seriously as yet. But interesting indica tions are there, indications of far-reaching significance. Indications pointing to a link with the proto-historic civilisation of Indus Valley (Harappa culture) of 3000 B. C. and through it with the Pre-historic cultures of West Baluchistan and perhaps the Son Valley culture. The famous Inverted Leaf motif found profusely on pottery and seals of Indus valley cities is still a living tradition (or was 25 years ago) in the art-works of the Uraons. There are so many pointers of this type waiting to be evaluated.

5. Let us try to shift and pick out those aspects of their culture which take us directly back to the day when this ancient people was young,—let us seek out the remnants of original culture which may throw a shaft of light, although a very

diffused one, into that prehistoric past,—let the curtain of millenia uncover a little to show a piece of life in its pristine glory.

Echoes of it can be found in the system of dormitories for boys and girls, in the curious custom of Totems, in the allied custom of *Parha* flags, in the seasonal mighty *Jatras* and above all—in the Dances. Everything begins with dances here, continues interwoven with it, and ends where tired feet end.

6. So the dances. It is here that we will find the reflection of life, of the dawn and probably of the evening glow.

A point to remember. Analysis, even today, of their songs and dances will show their origin clearly. It is probably something like this. ...Emotions surge in the primitive mind with a strong unhindered impact. Expression becomes equally strong. And, in the primitive society, where collective is the be-all and end-all of all activity,—this expression has a spontaneous tendency to develop rhythmically, harmoniously. It is so, because many are involved always,—unit is collective and not an individual.

But a stage comes when this spontaneity, this state of not being aware, gives place to awareness, to organisation. Again, the reason is the collective.

And soon this expression under strong emotion becomes directed towards a definite end.

To delve deeper in search of these definite ends will carry us into the study of the psychology of primitive people. Suffice it to say here—the complex spiral has many factors to contend with from now on. Sometimes, it is pantomimic representation of such incidents of their own lives as excite intense feeling of pleasure. Sometimes, it develops magical significance, this

stylised pantomime. The theory invariably is of sympathetic magic, such as rainmaking,—which sets off the cycle of existence in an agrarian society,—let the earth drink deep, let her be fruitful, let her nourish her children.

But all this apart, we witness in a symbolic way this birth of a dance even today. When the drums start beating, the young lady standing shyly in a corner, goes into a trance slowly. The rhythm intoxicates the very blood in her veins,—it is irresistible,—waves of rhythm start rippling on her swaying body and imperceptibly she is in the midst of a high tempo. This birth of a dance among Uraons is a sight to see, once seen it is never forgotten.

7. A few words about certain points. The village dormitory for the boys is the centre of collective activity in the village. This dormitory, which is called *Dhumkuria* or *Jonkherpa* is highly interesting and details of it can be found at the end of this paper. Our dances are generally performed on the *Akhra* or yard before Dhumkuria. In the dormitory are kept the *Nagara Madal*, *Runj*, *Bhenr*, *Narsimha*, *Guguchu* or *Tortoro*, all musical instruments. Life in the Dhumkuria is highly interesting from the point of view of Anthropology and Sociology. But almost all important things are celebrated by dancing. So, the Akhra can hold the centre of our stage and yet can show the working of Dormitory. The girls also have a dormitory, which is called *Pel-erpa*, and whose location is supposed to be secret. Its workings are different from the boys', excepting the erotic side of it.

Now about totems. The distinguishing feature of Uraon usage is that they have anthropomorphic or zoomorphic representations of their totems which are kept in the dormitories. This representing the totem is not found among any other Indian

Austro-Asiatic groups, or any other tribal group in the country for that matter. But curiously enough, this custom is frozen at a certain stage of its development, they have the totem image, but they do not idolize or worship it in any way. There is not much magical significance attached with it. It is no doubt a sacred ornamentation which they bring out and carry at the head of thc processions during the magnificent seasonal hunting Jatras. It is the *Parha* flag that is the sacred symbol of the village. It has relaced the totem according to a curious transferred sanctity process. Every village has a separate design for its flag. The greatest show of brotherhood that the Uraon community is capable of, is presentation of the *Parha-Bairakhi* (flag) to a neighbouring village. This is a glorious custom which calls for a well-advertised Jatra where many gather and dance continues for whole night.

Jatras, specially the Inter-Parha ones such as Magh Jatra, are notable features of Uraon life. It serves two apparent purposes : one, it is an attempt at tribal union where thoughts are exchanged and intermingling is such as to develop oneness of feeling ;—two, it is the place to throw together marriageable couples. Here boys and girls and their parents of a Village are able to come across others of other villages. Marriage being exogamous —this greatly facilitates matchmaking.

Now, something about Religion. Other religions, specially Hinduism, though it was no means an one-way traffic, have mixed up very much the original pantheistic-ancestor-worshipping-magico-religious system with extraneous elements. *Dharmas* is their supreme god (probably Bengali rural Dharmathakur has a kinship with it). Ancestors are pervading their religious thought, as an instance, *Harborijatra* can be cited.

And of course their main vocation, agriculture is almost the sole concern of all their rites along with fertility among humanity.

Earth is worshipped. *Bangari*, *Bheloapuja*, *Karam*, *Kalikhani-puja*, *Nawakhani*, all are connected with earth and cultivation.

Koha Benja is the marriage of village priest, *Mahato*, with *Dharti*, earth. Mahato stands for sun-god, and this marriage ensures fertility of earth. This precedes the human marriages of the season. *Sarhul* is the festival which is celebrated in this connection.

8. We come to the Dances now. As we have observed, dances keep the rhythm of Uraon life. It is extremely difficult to enumerate all the dances, we will have to be content with more important ones. These dances are meant to be continued for hours, if not for nights and days. Each dance takes some time to hold the the mood of the dancers. But when it holds, the hold is total. That is the moment when tribal dance is at its best. Individuals submerge in the collective, rhythm and dust kicked up by the tripping feet intoxicate you, reason is numbed,—only feeling remains. This is what these dances are meant for. They cannot be enacted, least of all in an urban atmosphere.

From December to March is the time of wedding in the society. Harbori Jatra and Koha Benja are held at this period.

This is the time for *Jadur* dances.

Jadur is the dance of courtship. The amorous youthful play of love, that mysterious urge is expressed through the rhythm going forward and coming back.

Phagu festival, the invocation of spring falls almost at the end of this period.

All marriages are stopped for about a month upto the *Sarhul* festival in April when the Sun-god is married to the earth, the supreme marriage.

Sarhul dance starts at this time. It expresses joy at the divine marriage, probably human ones are also remembered through that one marriage. In summer comes the time for Kharia dances. It is, on the one hand, a dance of quiet joy and satisfaction—now that the mad quest for a mate is over and the ceremony being done with, time has come for quiet enjoyment of life and mind strays towards the avocations of daily life.

On the other hand, this dance has the vigour and thrust of hunters and warriors —this is hunting and war dance as well. The dancers carry sticks and other weapons as if to go out for hunting or to war.

After summer's heat comes rain, the most anxiously awaited season. Dance of the season is the magnificent *Karam*. You see young girls enacting rainmaking, sowing seeds and reaping. They pacify the earth with caressing motions,—mother has given her yield, probably the child has snatched, let the mother earth not be angry.

In September-November is the autumn dance, *Churdi-Kharia* or Aghan. This is a more warlike variation of martial Kharia of summer. The granaries are full, this is the traditional time for going out for warlike deeds.

In this way all the seasons are ushered in their presence celebrated. But apart from these main seasonal dances, there are various occasions. The more important ones are as follows :

There are more or less four important ceremonial hunting expeditions or Jatras round the year. They are :—*Bisu*

Sendra or *Koha Shikar*, *Phagu Sendra*, *Jeth Sendra* and *Sondhi Sendra* or the new moon hunt in Magh. Among them *Bisu Sendra* is the most important one.

During these expeditions, the totem is brought out and carried at the head of the procession, and different activities of shikar are enacted through the motions of dancers.

There is a curious custom during *Sondhi Sendra* when all males go out of village and womenfolk take over the workings while wearing men's dresses and generally making a nuisance of themselves.

There are the wonderful dances connected with a marriage. All the ceremonies of marriage are woven in dances. The coming of the maidens of the groom's party with a young lady carrying decorated ears of paddy on a painted pitcher on her head,—all dancing merrily, and then the bride's party receiving them through dancing and raising the tempo to the highest pitch is unparallelled in its expression of playful joy. This is *Benju Nalna*.

Then the menfolk of bride's party do a dance called *Paiki*, which is a mock war-dance. The motions of it indicate to an old custom of groom's snatching the bride away after giving fight.

After the marriage, old women of the village dance with ploughshare, hay and sickle in hand. This is supposed to be a satirical fertility dance. The old hags are by no means sober when they perform it, and the meaning that they very palpably convey thru' it is by no means acceptable to any censor board.

Every Puja has some dance connected with it.

Then there are the social dances which have no magical significance attached to them. Only the girls, that also when they go out of village, perform a dance which they call *Ohali Beohna*

or *Angan*. It is a beautiful dance, but probably a bit sophisticated.

Then there is the famous *Jhumer* and *Lujhri*, which are secular in spirit and amorous in mood. *Matha* is a form rarely met with nowadays.

This is by no means an exhaustive list of all their dances or variations thereof. And Uraons are very adept at improvising newer forms for newer occasions. I have been present at a remote village where they have mingled Karam with Benja Nalna and Lujhri to fit the occassion of receiving a very much honoured guest at their village. At every few steps they washed his feet and wiped them ceremonially and in rhythm. In the songs, there are very old compositions as well as of very recent origin. These songs are keys, so to say, to the secret of their tribal thinking. This subject is to be tackled later on, being a vast one.

—These dances create that atmosphere which suddenly make you aware that you are witnessing a scene as old as the history of man in India. The tunes, the drums, the spectacle make you realise what is Vigour and Joy of Life in reaiity. They are precious because they invoke in you the primary emotions.

And they make you realise another point,—the innate harmony of tribal form of society. Work and relaxation, worship and pleasure,—these are so intermixed and so well-balanced, that the emotional disbalance, the greatest malady of civilised society, has very few chances to appear in an intensely tribal form of existence. Moreover, all age-groups have well-defined and proper scope to have a place in the community. The feeling of neglect, which gathers round us at a certain age, is totally absent in such a society. This vigorous

pleasure of living checks the craving 'to go places', to have egoistic ambitions of restless nature,—directing the individual's attention to what nature and man's harmonious surrounding offers.

Therein lies the one lesson, the message of these societies. Contentment, simplicity—passionate love of life,—these are ingrained in them from very birth.

9. But to give only this picture of the Uraons, or for that matter any other tribals, is to help develop another myth, the Noble Savage. Unfortunately, this balance and harmony is a most evanescent thing. Like a delicate flower it withers away at the slightest rude touch. And touch they are bound to get.

That is why the Uraons are today a most impoverished and haggard people. This is not the place to go into details, but the fact is,—even the dances and customs enumerated here are probably forgotten and fallen into oblivion at many of the Uraon villages. Some do not remember them, many have only names in their memories, few are who practise and live in them. The more years are passing, the more the process is getting into stride.

10. This sense of decay, this feeling of a tribe being extinct, is a very painful experience. One of the most colourful people have become or are becoming most drab, colourless and fourth-rate copies of ourselves. They have lost their fragrance to a large extent.

We are at a loss to know what is to be done. But we see that this process of decay is being allowed to go on unhindered. Cartloads of them are being sent to the tea-gardens even today, all the shirks are still taking advantage of their faithful nature,

the different foreign and Indian missionaries are still drilling into their heads that whatever they possess have no value and offering instead, not the best but the most soulless of our civilised dogmas.

The attitude of powers that be is extremely superficial and smugly complacent. Some say, they are no better or worse than our common peasantry and deserve no better treatment. (Prof. Nirmal Bose).

The obvious fact that the question is of not being better or worse, but of being a different and distinct cultural trend which should find its place in and contribute to the mainstream of Indian culture as a whole,—somehow elludes these gentlemen. They are probably cross with the 'ballyhoo' that is made about them.

Some others think exclusively in terms of new roads being built, bridges being spanned. Community Development Project and National Extension Scheme and Social Welfare Project and what not doing this and doing that and paid volunteers going and lecturing, and society ladies going in cars on Sundays to distribute milk with an eye cocked at the photographer accompanying the party. In a word, nauseating and foolish and devoid of imagination to a limit. Mentality of caste superiority and of having powers in hand is rampant among the gentlemen who order these aboriginals and untouchables about.

I have seen what repurcussions this is bringing. Apart from political moves or Jharkhand Party and Ganatantra Parishad, in social life these gentlemen are literally afraid to go into any village.

The enlightened attitude is almost absent. Among Uraons themselves also there is no stir of consciousness as yet. But

something is happening deep down in the minds of young boys and girls, faint murmurings are heard. Some indications are also coming to the surface at unexpected places. A definite attachment shown towards all their glorious traditions as opposed to the teachings of different churches and the state power and country-made philanthropists is the platform on which organisations like Adibasi Dhumkuria are built. Whether these will not turn into something narrowly backward-minded, is more than what I can predict. But decidedly, if such a development occurs, gurdian-angels will be ourselves and our propagandists.

If ever the Uraons are allowed to realise and value their own tradition, when the force will emerge from themselves, when they will carry forward their best heritage along with incorporating the good things of modern society,—then their culture will again burst forth, and new dances and songs and art-forms will come into being.

In the meanwhile, all that we can do, is to stop pitying them !

For attention of Mr. Principal.

Memorandom connecting integrated course of Direction

Some notes :—

(1) I have carefully gone through again the entire Direction Course of all the years (1st, 2nd and 3rd year). I have come to certain conclusions and I had to qualify certain of my views after deep thinking which I would like to record below :

(2) The course of Direction which includes the Film Appreciation (and for first 2 years Screenplay Writing also) will have to be integrated in such a way that an all-round training can be imparted. Apart from the theoretical trainings that we have worked out in fullest possible detail, I would like to put stress on practicals very much and also on keeping contact with the industry so that in future the students may get fruitful employment in the Industry.

(3) The film on National Integration could not be made within this vaction which I propose to take up as the 20 minutes Staff film to be made in collaboration with 2nd year students during the first term of this year.

(Incidentally 'Fear' can be completed within this vacation and can be made ready for the next press show as also during convocation showing.)

(4) For the practicals of Ist and 2nd years, certain equipments and staff units will be necessary as I have pointed out in my earlier memo Since 3rd year students are not making their diploma films this term and completing their theoretical papers only, appearing in the examination for those papers at the end of this term and being free to take up their diploma films in the last semester of this session, 3rd year boys are not coming in the way for working out the practicals of the Ist and 2nd years.

The equipments which I will require for conducting the 1st and 2nd year practicals are as follows. These will be required for all through the weeks teaching in this term :

(1) A camera with an Instructor of camera with necessary attendant gadgets.

(2) One sound unit with an Instructor.

(3) One editng table with all other facilities for editing along with one Instructor.

(4) Projection facility as and when required.

(5) Floor space and necessary set materials as and when required for making those films. In this connection it can be pointed out that maximum use will be made of the permanent sets on the Stage no. I and the outdoor lot.

(6) Raw film stock as worked out with A. P P. and as indented for

5. It may be pointed out that though I have asked for Instructors for every equipment, if the professors concerned desire so, students of their departments can participate according to their convenience. It may further be pointed out that as I have made up the time-table now, these units will be required for 4

days in a week. But over and above that, if we make that 20 minute staff film, we will need a permanent unit who will do both the work.

6. I deeply feel that guests from the industry are necessary. Previously I was of the opinion that guests disturb the smooth running of the time-table. But if we can somehow arrange a smooth time schedule for different guests, I think it is not only worth trying, but also it is vital, because I feel that if the guests stop coming, the students and the Institute itself will be completely out of touch with the industry, thereby losing its own very base. At the same time if they have to come, they must come in the first semester because in the second semester all the students will be busy for preparation of their examination and at that time these casual lectures may create confusion.

Guests' coming will also broaden the taste and outlook of the students who, as you know, come with all kinds of wrong notions in their brains, being particularly glamour struck. As I understand this Institute's role to be in the context of Indian cinema,—we are here to foster and promote purposeful, healthy, entertaining and artistic films. To put too much stress upon commercialism to the detriment of others, what happens normally with the students should not be encouraged. So for both the reasons of guiding them towards the proper line and at the same time keeping them in touch with the industry, we must have guests.

The following genlemen from the industry I propose to invite. Please remember that this is strictly for Direction course of 2nd and 3rd year. Also I have tried to select people who may be prospective future employers of the boys.

From Bombay :

1) Shri Hiten Choudhury.
2) Shri Hrishikesh Mukherjee
3) Shri Rajendra Singh Bedi.
4) Shri K. A. Abbas.
5) Shri Salil Chaudhury.
6) Shri Viswamitra Adil.

From Calcutta :

1) Shri Satyajit Ray.
2) Shri Mrinal Sen.
3) Shri Chidananda Dasgupta.
4) Shri Barin Saha.
5) Shri Hari S. Dasgupta.
6) Shri Ashit Chaudhury.

I propose to call them one by one according to following time-table in my schedule between 15th of July to 15th of September.

(1) Every Tuesday and Wednesday—I have kept provisions for such lectures. Both the days between 10 to 1 the guests will meet 2nd year students and between 2 to 5 they will meet 3rd year students.

(2) If you want to have general lectures by any of the guests, that also can be arranged for.

(3) The dates available in my hand are :

— July : 20, 21, 27, 28.
— August : 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24, 25, 31,
— September : 7, 8, 14, 15.

To organise the whole programme properly and to ensure that the gentlemen concerned come on the specific dates, I

feel that personal contact and discussion are of highest importance over and above our official correspondence with them. As the Principal knows very well, all the gentlemen mentioned in the memorandum are intimately known by me. I propose that I shall be allowed to proceed on tour to Bombay on 24th next, after completion of the Viva Voce here on 23rd and after a day or two proceed on tour to Calcutta returning by 30th to attend the inaugural classes on 1st of July 1965.

7. I propose that all the new entrants who come in this time, should be given a general orientation lecture on the very first day and that should clearly point out to them what is expected of them here and after they pass out from this Institute. Principal may kindly discuss with me and prepare a lecture on the issue.

I request the Principal to go through the whole thing carefully, if necessary have discussions with me and take immediate action so that things can be organised from now on.

Thanking you,

Sd./- Ritwik Ghatak
Vice Principal

Enclosed :

(1) Detailed Practicals of 1st & 2nd years.

(2) Revised Theoreticals of 3rd year.

Third year theory :

As it is proposed that there will be no practical work, for the 3rd year students in first term, it will be advisable to finish all the theory work for these students in first term itself and if possible their examinations on these papers should be completed either before or just after the next vacation so that they are relieved of their burden of theoretical papers and can concentrate on their diploma films completely free.

I have pursued the text prescribed in the tentative syllabus already cyclostyled, and I propose certain changes. As it is there are only Eisenstein books prescribed. I consider Eisenstein to be a must, but he is also dated. Film form has gone much forward and students must be acquainted with the most recent developments and trends in cinema

So I suggest one book that has recently come out in the market which to me is one of the most comprehensive books on cinema, i.e., 'Cinema' by Ivor Montagu. At the same time to keep them abreast of day to day happenings in the cinema, I suggest as text the following periodicals :

(1) Sight and Sound.

(2) Films and Filming.

(3) Film Culture.

(4) Film Quarterly. (all brought out within last 2 years).

Of course I do not mean that all the articles coming out in these magazines should be included in the text. A selection of them will have to be made.

In so far as film music is concerned, I think this is very much neglected in our syllabus. I suggest 'Film Music' by Kurt London should be included in the text. They must have a basic grounding for use of music in cinema.

In so far as 'recommended books' are concerned, I would like to add certain books in the list. There is a very excellent series of biographies of different directors that is coming out. Already 3 of them have come out. Those on Antonioni, Bunuel and Bergman. Another book of this series is being planned to come out soon, i.e., 'Satyajit Ray' by Miss Marie Seaton. This series should be recommended.

Since there is no good book on Indian Cinema and at the same time some knowledge of Asiatic Cinema should be there, I propose a very excellent book : 'Japanese Cinema' written by Ritchi.

This will not help by itself. So I propose to prepare a paper, collecting data about Indian Cinema mostly on Bombay and Calcutta activities and I would like to use it as a text. It is unfortunate that nothing can be done by me about South. A competent person has to be found out who can write such a text for South India. These texts can be cyclostyled and used in consecutive years. About the general basic theory and approach, I propose to use a reference book : 'Theory of Film : Redemption of Physical Reality' by Dr. Kracauer.

The programme for practicals of 1st, 2nd and 3rd years.

1st term—1st year

There will be a 5 minutes film sequence planned by the

teacher which will as a demonstration sequence be observed by the students of 1st year in which the following method will be pursued :

(1) How to plan out a sequence on paper from writing point of view, production planning point of view, and development of character point of view.

(2) Diagrams to be made to indicate pan, track and other camera movements on paper for that particular sequence. Every student will be asked to work out on paper the whole thing.

(3) Choice of location and/or set. How to select, what point to keep in mind and how to organise a particular spot for a proposed sequence of film. This will be done by every individual student and discussed by the teacher.

(4) How to use a director's view-finder. How to select lenses ; what are the guiding principles in choosing a particular lens and set up.

(5) Doing mock shooting by moving an empty camera by which will be shown the effect of camera movement, object movement, camera and object both movements and static camera. These will be explained to the students in fullest possible details.

(6) Use of camera angles to enhance the telling of the story and distortions and its place in creating mood.

(7) Elements of lighting conditions High-key and Low-key sharp contrast, soft contrast, etc. How they help telling the story.

(8) Continuity of shots ; how to go from shot to shot for a smooth flow of telling the story. Camera's use as a subjective factor. Camera's movement is always along the psychological growth of the sequence. These will be exercises done by every student and corrected by teacher.

(9) After all these things are done, then this very sequence will be shot by the teacher in collaboration with the students in which maximum scope for discussion will be given to the students and their errors to be pointed out. By shooting and showing it on the screen, teacher will be able to explain whether different effects, as desired, have come or not. The difference between imagination and realisation. What are the factors governing this big difference. This film will be silent.

2nd year—1st term :

In the 1st week of July, the teacher will start picturising a song and dance sequence using back projection and other special effects like models, and tricks (SHUFFTAN). In this one sequence students will be taught how to picturise a song, how to utilise all kinds of elements. This will be the practical exercise for the second year students for all these above subjects.

(2) The teacher will start making a 20 minute documentary or television film probably on a subject which can be sold outside, i.e., subjects like National Integration or Family Planing, or some such thing. In this the students will collaborate collectively at every stage.

(3) At the same time, the students will submit their ideas for 5 minute talkie films and write the scenario for it ; make all the production planning and get generally prepared for shooting their own 5 minute films in the 2nd term.

3rd year :

There will be no practical in the first term for 3rd year students excepting all the pre-shooting preparations of their 10 minutes diploma films to be made in 2nd term. I propose that they should be given subjects of our own choice on which they will write their scenario and make other arrangements.

CONFIDENTIAL

CONDITIONS OF THE DIRECTION DEPTT.

1. Condition of the Direction Department is impossible. If such conditions prevail, it will be extremely difficult for me to conduct any classes. If the tentative time-table drawn up by me is persued, it will be seen that I have taken up myself 36 hours of lecture work load quite apart from other duties that I have to perform.

I have only one temporary hand Mr. Mital. He is an ex-student newly come out from this very institute. I can entrust him the work of First Year classes, but beyond that I do not think him competent to hold any serious classes. I myself, therefore, have taken up the Second and Third year leaving aside the First year to him.

2. This is one of the reasons why I have come out with the scheme of having Guest-lecturers for the first term this year. These Guest-lecturers will take away some load from me in Second and Third year classes.

3. I personally think that this need not mean that I should be relieved of guiding other departments under me, because they are also vitally connected with the Direction Coaching. In

fact, I would like to think more so on the departments of Acting and Music that hitherto giving any work to the Head of the Department of Direction I think so because I consider these two departments are vitally interconnected with the work of Direction.

4. I propose that the Principal kindly take up the matter with the Ministry for some ad-hoc appointment for the Prof. and Asstt. Prof. of Direction. In my opinion, there are only two candidates whom we can give ad-hoc appointments immediately. One is Mr. Barin Saha and another is Mr. N. Banerjee. This is one of the reasons why I have included Mr. Saha's name in my list of Guest lecturers.

Principal may be acquainted with him personally and form his own opinion.

In any case Principal may kindly press the matter and exert his powers to fill up the posts as soon possible.

Ritwik Ghatak
Vice-Principal.